রাষ্ট্রচিন্তা

রাষ্ট্রচিন্তা

একটি রাষ্ট্রনৈতিক জার্নাল

বর্ষ ৭ সংখ্যা ১ আষাঢ় ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

সম্পাদক

হাবিবুর রহমান

সম্পাদনা পর্ষদ

হারুন রশীদ
মাজহার জীবন
জাভেদ হুসেন
আর রাজী
সন্থল আহমদ
চারু হক
সারোয়ার তুষার

কক্ষ নং ২০৩০, কলাভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রাষ্ট্রচিন্তা
একটি রাষ্ট্রনৈতিক জার্নাল
বর্ষ ৭ সংখ্যা ১ আষাঢ় ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

সম্পাদক

হাবিবুর রহমান

বিদেশ প্রতিনিধি

অস্ট্রেলিয়া
মোয়াজ্জেম আজিম
moazzamhazim@hotmail.com, moazzam.azim@cardno.com

নেদারল্যাণ্ডস
ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব
faiz.taiyeb@gmail.com

মূল্য : ১৫০ টাকা (দেশে)
৩ ডলার (দেশের বাইরে)
প্রচ্ছদ : আনওয়ার ফারুক

Email : rashtrochinta@gmail.com
Website : www.rashtrochinta.net

২০৩০, কলাভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা থেকে সম্পাদনা পর্ষদের পক্ষে
অধ্যাপক হারুন রশীদ কর্তৃক প্রকাশিত। যোগাযোগ : +88 01816 011 214

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় *vii*

রাষ্ট্র সংস্কারের রাজনীতি: একটি খসড়া প্রস্তাব ১৩
হাসনাত কাইয়ুম

হাসান আজিজুল হকের কথাসাহিত্যের কয়েকটি নন্দনসূত্র:
সাংস্কৃতিক ও জাতীয়তাবাদী পটভূমি ৪৩
মোহাম্মদ আজম

সভ্যতার সংকট ও শিক্ষার দায় ৫৭
রাখাল রাহা

জুলফিকার আলী ভুট্টো ও পিপলস্ পার্টি:
দক্ষিণ এশিয়ায় রাজনৈতিক সংস্কার চেষ্টার এক খণ্ডাংশ ৬৭
আলতাফ পারভেজ

'দেশের সম্পদ দেশেই রাখুন' : বিজ্ঞাপনে অসহযোগ আন্দোলন ১০১
সহুল আহমেদ

মদিনার সঙ্কট: মদিনার রহমত ১২৩
আবীর আহমেদ

নির্ভরশীলতা তত্ত্ব, রুশদেশের অবস্থান এবং ইউক্রেন যুদ্ধ ১৪১
মুহাম্মদ তানিম নওশাদ

আদিত্য নিগমের সাক্ষাৎকার: পুঁজিবাদ কোনো অখণ্ড বা
স্বয়ংসম্পূর্ণ উৎপাদন-ব্যবস্থা নয় ১৫৯
সারোয়ার তুষার

ঔপনিবেশিকতা ও আধুনিকতা/যৌক্তিকতা ২০৫
মূল: আনিবাল কিহানো
অনুবাদ: মনিরুল ইসলাম

ঔপনিবেশিক ভারতের ইতিহাস-রচনার কতিপয়
দিক প্রসঙ্গে ২৩০
মূল: রণজিৎ গুহ
অনুবাদ: ইয়ামিন রহমান

সম্পাদকীয়

প্রতিশ্রুত সময়ের মধ্যে *রাষ্ট্রচিন্তা* জার্নালের নতুন সংখ্যা প্রকাশিত হলো, এটা সন্তুষ্টির এক দিক। এ উপলক্ষে *রাষ্ট্রচিন্তা* জার্নালের লেখক-পাঠক-শুভানুধ্যায়ী ও সমালোচক সকলকে জানাই আন্তরিক অভিবাদন ও কৃতজ্ঞতা। দেশব্যাপী এই জার্নালকে কেন্দ্র করে চিন্তা-ভাবনা ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার ক্রমবর্ধমান যে পরিসর গড়ে উঠছে, সেই পরিসরকে আরও সুসংহত ও বেগবান করাই আমাদের অঙ্গীকার। এছাড়া বাংলাদেশে বর্তমানে চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার আরও বেশকিছু গোষ্ঠী, পত্রিকার আবির্ভাব ঘটেছে; তাদের সাথে যোগাযোগ, লেনদেন, সংলাপ ও নির্মোহ-নৈর্ব্যক্তিক পর্যালোচনার সংস্কৃতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও আমরা যথাসাধ্য ভূমিকা রাখতে চাই।

'চিন্তা করা'র মানে জ্ঞানের বড়াই কিংবা শৌখিনতা নয়; বরং অস্তিত্ব ও যাপনের বিচিত্র বিপরীতমুখী দিকগুলোর সাথে স্বীয় সমাজের ঐক্যসূত্র সন্ধান করা। এক্ষেত্রে নিজ জনগোষ্ঠী ও বর্তমান সময়ের সাথে – গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের ভাষা ধার করে বলা যায় – এক ধরনের ক্রিটিক্যাল অন্তরঙ্গতা (critical intimacy) তৈরি করা ছাড়া এ কাজ জুতমতো করা যায় না। নিজের সময় ও সমাজের সাথে আনক্রিটিক্যাল ঘনিষ্ঠতা আপেক্ষিকতায় রূপ নিতে পারে; অর্থাৎ, তা সংকীর্ণ ঐতিহ্যপ্রেম, উগ্র স্বদেশিয়ানা, গোষ্ঠী-জাতীয়তাবাদের জন্ম দিতে পারে। অন্যদিকে, নিজের সময় ও সমাজের সাথে ঘনিষ্ঠতাহীন 'ক্রিটিক্যাল' মনোভাব আদতে কোনো ক্রিটিক্যালিটিই নয়; এক ধরনের বিশুদ্ধ বর্ণবাদ। আধুনিক জমানায় সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তা আসলে স্বীয় অবস্থা ও অবস্থানের আত্মবিশ্লেষণ ছাড়া অন্য কিছু নয়। *রাষ্ট্রচিন্তা* জার্নাল মুখ্যত নিজেকে এই কাজে নিবেদিত মনে করে।

সারা বিশ্বে একটা অভাবিত অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়েছে। কোভিড মহামারির সময়ে পুরো দুনিয়া যেন থমকে ছিল। মহামারি মোকাবিলায় দেশে দেশে সরকারের নেওয়া পদক্ষেপে সাধারণ মানুষের জীবিকা ও জীবনযাত্রা কার্যত হয়ে পড়েছিল অচল। মহামারির দাপট কমতে না কমতেই পৃথিবী যেন আড়মোড়া ভেঙে ছুটতে শুরু

করেছে। কিন্তু দেশে দেশে অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে গতি আসার আগেই পৃথিবী আগ্রাসী যুদ্ধের প্রবল প্রতাপের দেখা পেল। গোটা দুনিয়াকে হতবাক করে দিয়ে রাশিয়া হামলা করে বসল ইউক্রেনে। ইউক্রেনে রাশিয়ার এই সামরিক অভিযানের কোনো আশু সমাপ্তির লক্ষণ অন্তত এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে না।

কিন্তু এই যুদ্ধ কোনো অনন্ত যুদ্ধ নয়; একে আসলে থামতেই হবে। এই যুদ্ধের প্রাপ্তি কী? মানুষ ও সার্বিক প্রতিবেশের বিপুল ক্ষতিসাধন করে এই যুদ্ধের বিবদমান পক্ষসমূহ আসলে কী অর্জন করতে চায়? এ পর্যায়ে উল্লেখ করাটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, যুদ্ধটা আপাতত রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে ঘটছে বলে মনে হলেও, এটা আসলে ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক-রাজনৈতিক শক্তির সাথে এর বিরোধী পক্ষের যুদ্ধ। আর এতে বলি করা হয়েছে ইউক্রেনের জনগণ ও ভূমিকে। আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে ইউক্রেনের সাধারণ মানুষের জানমাল, জীবিকা ও নিরাপত্তার পক্ষে। মানুষের পতনের মধ্য দিয়ে কোনো 'সত্য' অর্জনের পক্ষে আমাদের রায় নাই– তা সে যত মহার্ঘ্য সত্যই হোক না কেন। সুতরাং রাশিয়ার এই আগ্রাসী নীতি ও বর্বরতার পক্ষে যে আমাদের সায় নাই সে কথা বলাই বাহুল্য।

তথাপি, সংক্ষেপে কিছু কথা বলে রাখা জরুরি। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে এই যুদ্ধ রাশিয়া ও ইউক্রেনের যুদ্ধ নয়; এটি মূলত রাশিয়া বনাম ইউরো-মার্কিন যুদ্ধ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পাশ্চাত্য শক্তির দ্বিচারিতা, শঠতা ও মারণাস্ত্র বিক্রির উদগ্র বাসনা এই যুদ্ধের গভীর কারণ (deep reason)। মূলত ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক জোট ন্যাটোর ক্রমান্বয়ে পূর্বদিকে অগ্রসর হওয়ার ফলে রাশিয়া ইউক্রেনে এই সামরিক হামলা চালাচ্ছে। কারণ মস্কো ইউক্রেনকে চেয়েছে নিরপেক্ষ বাফার রাষ্ট্র হিসেবে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্ররোচনায় ইউক্রেন ন্যাটোতে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে এবং ন্যাটো এটি গ্রহণ করার আশ্বাস দিলে রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করে দ্রুততার সঙ্গে কিয়েভ অভিমুখে সামরিক অভিযান শুরু করে। তবে যতটা দ্রুত কিয়েভের পতন হবে বলে পুতিন মনে করেছিলেন, বাস্তবে দেখা যাচ্ছে খুব অনায়াসে কিয়েভ দখল করা সম্ভব হচ্ছে না– পুতিনকে কৌশল বদলাতে হচ্ছে। অন্যদিকে, পশ্চিমা শক্তিগুলো মনে করেছিল, ব্যাপক অর্থনৈতিক অবরোধের দরুন রাশিয়া পিছু হটতে বাধ্য হবে। যুদ্ধের শুরুতে রুশ মুদ্রা রুবলের মূল্য পতনের মধ্য দিয়ে এর বাস্তবতাও অনুভূত হয়েছিল। কিন্তু রাশিয়া তার জ্বালানি কূটনীতি এবং আমদানি-রপ্তানি নীতি পরিবর্তনের মাধ্যমে দ্রুত রুবলের মূল্যমান বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। ইউক্রেন যুদ্ধের শুরুতে রুবলের সর্বোচ্চ দরপতন ঘটেছিল; ডলারের সঙ্গে বিনিময় হার দাঁড়িয়েছিল ১৫৮ রুবল। অথচ মে মাসের শেষ সপ্তাহে এসে বিনিময় মূল্য দাঁড়ায় ডলারপ্রতি ৫৫ রুবল। আবার রাশিয়াকে একঘরে করার প্রশ্নেও বিশ্বে কোনো ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি; বরং দেখা যাচ্ছে, ছোট-বড় বিভিন্ন

রাষ্ট্র রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতেই বেশি উৎসাহী। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিজাত সম্প্রদায়ের সুরও অনেকটাই বদলে গেছে। *নিউইয়র্ক টাইমস* -এর মতো প্রভাবশালী পত্রিকার সর্বশেষ সম্পাদকীয় অবস্থান হচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ইজ্জত' বাঁচানোর স্বার্থে ইউক্রেনকে 'বাস্তবসম্মত সমাধান'-এর কথা ভাবতে হবে।

গত শতাব্দীর নব্বই দশকেই সমাজতান্ত্রিক বলয়ের অধীনে থাকা দেশসমূহের জোট 'ওয়ারশ জোট' বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এই জোট থাকাকালীন ইঙ্গ-মার্কিন বলয় ন্যাটো জোটের পক্ষে অন্তত কিছু যুক্তি পেশ করতে পারত। কিন্তু 'ওয়ারশ জোট' বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার তিন দশক পরও ন্যাটো জোট বিলুপ্ত তো হয়ইনি; বরং, বহুগুণে শক্তিশালী হয়েছে এবং ক্রমাগত নিজের সম্প্রসারণ ঘটাচ্ছে।

ইউক্রেনে মানবিক বিপর্যয়ের বাস্তবতায় আরও একবার অত্যন্ত খুল্লামখুল্লা কায়দায় পাশ্চাত্য তার বর্ণবাদী চেহারা হাজির করেছে। পশ্চিমের মূলধারার মিডিয়া, পলিসি মেকার ও বুদ্ধিজীবীগণ যেন মানবেতিহাসের জঘন্যতম যুদ্ধ সংঘটিত হতে দেখছে! ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়া, প্যালেস্টানের মতো বিপর্যয়ে এই 'বৈশ্বিক বিবেক'-কে চোখে ঠুলি এঁটে বসে থাকতে দেখা গেছে। কোনো রাখঢাক না রেখেই তারা বলছে, "এরা তো আফ্রিকা বা মধ্যপ্রাচ্যের মানুষ নয়, ইউক্রেনের মানুষেরা তো আমাদেরই মতো!" এহেন বর্ণবাদী মানসিকতা নিয়েই পশ্চিমা শক্তি বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার ফেরি করতে চায়! গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের ভেক ধরে মূলত তারা তাদের সাম্রাজ্যবাদী অভিলাষ পূরণ করতে চায়। সর্বজনীন ধারণা হিসেবে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের যৌক্তিকতা যেমন ঊর্ধ্বে তুলে ধরা দরকার, ঠিক তেমনি যে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের পেছন পেছন সাম্রাজ্যবাদী জাহাজ ধাবমান— তাকেও সনাক্ত করতে পারা দরকার।

আমাদের অবস্থান পরিস্কার। ইউক্রেনের জনগণের জীবনের বিনিময়ে কোনো বড় সত্যের কদর আমরা করি না। যুদ্ধ এড়িয়ে কূটনৈতিক কায়দায় ন্যাটোর পূর্বমুখী সম্প্রসারণ আটকানোর সুযোগ রাশিয়ার ছিল। পাশাপাশি ইউক্রেনের জনগণের জীবন নিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট জেলেন্সকি যে জুয়া খেলেছেন, তার যৌক্তিক ব্যাখ্যাও খুঁজে পাওয়া মুশকিল। ন্যাটো ও রাশিয়ার মধ্যে নিজ দেশের নিরপেক্ষ অবস্থান বা মিনস্ক চুক্তি বাস্তবায়নে সম্মত হয়ে পুতিনের যুদ্ধবাজ মনোভাবকে বুমেরাং করে দেয়ার সুযোগ ছিল জেলেন্সকির। আগ্রাসনের আগে এটাই চেয়েছিল রাশিয়া। কিন্তু তিনি তা না করে যুদ্ধের মুখোমুখি হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে একদিকে ইউক্রেনের মানুষের জীবনে এক ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে এনেছেন; অন্যদিকে রাশিয়ার জনগণের কাছে যুদ্ধবাজ পুতিনকে নিজের জনপ্রিয়তা বাড়ানোর মওকা করে দিয়েছেন।

ভ্লাদিমির পুতিনকে অবশ্যই ইউক্রেনে আগ্রাসন বন্ধ করতে হবে। কিন্তু পশ্চিমাদের সাম্রাজ্যবাদী খাসলতও ছাড়তে হবে। ডলার দিয়ে বিশ্বের অর্থনীতিকে কুক্ষিগত করে রাখা; আর ন্যাটো দিয়ে যুদ্ধনীতি জারি রাখা থেকে সরে আসতে হবে। না হলে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের দোহাই 'কেবলই ফক্কিকার'— ফাঁকা বুলি মাত্র। এমনকি খোদ ইউরোপকে আটলান্টিক মহাসাগরের আরেক পার উত্তর আমেরিকার অদম্য মোড়লিপনা চরিতার্থ করার সহায়ক শক্তি হয়ে থাকার অহেতুক বোঝা কাঁধ থেকে নামিয়ে ফেলার কথা ভাবতে হবে। গোটা দুনিয়া সম্পর্কে পাশ্চাত্যের দাম্ভিক অজ্ঞতা যে ব্যাকফায়ার করতে শুরু করেছে বুদ্ধিমান ইউরোপের তা বুঝতে দেরি হওয়া উচিত নয়। আমরা ভৌগলিক ইউরোপ কিংবা উত্তর আমেরিকার অহেতুক বিরোধী নই; কিন্তু আমরা একক ও কেন্দ্রীভূত সাংস্কৃতিক-ভাবাদর্শিক দাদাগিরি জারি রাখতে চাওয়া 'পাশ্চাত্য' ধারণার ঘোরতর বিরোধী। পাশ্চাত্যের সমস্যা মানে গোটা দুনিয়ার সমস্যা; আর অন্যদিকে 'অ-পাশ্চাত্য' দুনিয়ার সমস্যা কেবল তাদেরই আঞ্চলিক সমস্যা, পাশ্চাত্যের সমস্যা নয়— পাশ্চাত্যকে এই মনোভাব থেকে সরে আসতে হবে। আমরা মনে করি, অনাগত বিশ্বব্যবস্থা হবে গণতান্ত্রিক; সমান মর্যাদা ও অস্তিত্বের শক্তভিতের ওপর গড়া— যেখানে 'কেহ কারে নাহি জিনে সমানে সমান'। এমন একটা বিন্যাসে 'বিশ্বব্যবস্থা' কথাটার অর্থ হবে পারস্পরিক স্বার্থ ও ঐক্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা আঞ্চলিক নেটওয়ার্কসমূহের শিথিল ফেডারেশন। আমরা একটা বহুকেন্দ্রিক 'গণতান্ত্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থার কথা বলছি; ইঙ্গ-মার্কিন পাশ্চাত্য শক্তির বদলে রুশ-চীনের নেতৃত্বাধীন পাল্টা কোনো এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার কথা বলছি না

আমাদের উপমহাদেশের দেশ শ্রীলঙ্কা মুখ থুবড়ে পড়েছে। শ্রীলঙ্কার জনগণ অভূতপূর্ব এক সঙ্কটের মুখে প্রায় দিশেহারা হয়ে গেছে। সরকারবিরোধী ব্যাপক বিক্ষোভ সেখানে অব্যাহত রয়েছে। যুদ্ধ আর অর্থনৈতিক অস্থিরতার এই ডামাডোলের মধ্যে পড়ে ইতিমধ্যে রাষ্ট্রক্ষমতার হাত বদল হয়ে গেছে পাকিস্তানে।

শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক পতনে বাংলাদেশে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। অসংখ্য মানুষের মনে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে— বাংলাদেশেও শ্রীলঙ্কার মতো পরিস্থিতি হবে না তো? এরই মধ্যে বিশ্ববাসী জেনে গেছে, একটি নির্ভেজাল পারিবারিক শাসনের খপ্পরে পড়েছে শ্রীলঙ্কা। সংখ্যালঘু-ভজনালয়ে হামলা ও কোভিডজনিত কারণে পর্যটন থেকে আয়ে ধ্বস, জৈবকৃষিতে যাওয়ার অপরিকল্পিত সিদ্ধান্ত তাদের ভোগান্তির মাত্রাকে বাড়িয়েছে বটে কিন্তু মূল আঘাত হেনেছে ঋণ-বন্ড ইত্যাদির মাধ্যমে উচ্চ সুদের টাকা জোগার করে সরকারের নেওয়া উচ্চাভিলাষী ও অলাভজনক সব উন্নয়ন প্রকল্প।

আমরা জানি, সরকার বড় বড় প্রকল্পগুলো নেয় কারণ এতে এক দিকে যেমন সাধারণ মানুষকে ভড়কে দেওয়ার মতো কিছু একটা দেখানো যায়; আবার

অন্যদিকে সেখান থেকে বড় অঙ্কের টাকা সরানোর সুযোগ থাকে বেশি। প্রকল্প যদি সময় মতো বাস্তবায়ন না-ও হয়, যদি প্রকল্পগুলো অর্থনৈতিকভাবে কার্যকর না-ও হয়, তাতে জনবিচ্ছিন্ন সরকারগুলোর কিছু যায় আসে না। কারণ, তারা ইতিমধ্যে বিপুল সম্পদ বিদেশে পাচার করে ফেলে। বিপদে পড়লে ডুবতে বসা জাহাজ থেকে লাফিয়ে চলে যায় নিরাপদ গন্তব্যে। এমনটিই ঘটেছে শ্রীলঙ্কায়।

দেশের মানুষকে উন্নয়নের চমক দেখাতে নানান রকম চটকদার সব প্রকল্প নিয়েছিল শ্রীলঙ্কা। যখন সেই সব প্রকল্পের ঋণের কিস্তি সুদসহ পরিশোধের সময় এসেছে তখন রাষ্ট্রের ভাণ্ডার গেছে শূন্য হয়ে। সঞ্চয়ে কোনো বৈদেশিক মুদ্রা না থাকায় জ্বালানী তেল ও খাদ্য কেনার সামর্থ্যও হারিয়ে ফেলে দেশটি। পরিস্থিতি এত ভয়াবহ হয়ে ওঠে যে, কাগজের অভাবে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা নেওয়াও বন্ধ করে দিতে হয়, বিদ্যুতের অভাবে হাসপাতালে চিকিৎসা বন্ধ হয়ে যায়, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ কেনার সক্ষমতাও চলে যায় শ্রীলঙ্কার।

শ্রীলঙ্কার এই পরিস্থিতি বাংলাদেশের মানুষের মনে ভয় ধরিয়ে দেওয়ার কারণ এই যে, বাংলাদেশের জনবিচ্ছিন্ন সরকারও বেশ কিছু মেগাপ্রকল্প বাস্তবায়ন করছে বিদেশি ঋণ নিয়ে। অনেকগুলো প্রকল্পেরই অর্থনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের অনেকেই বলছেন, অপ্রয়োজনীয় এই সব মেগাপ্রকল্প বাংলাদেশকে ভোগাতে পারে। কারণ ইতিমধ্যে একদিকে বিপুল অর্থপাচার হয়েছে বাংলাদেশ থেকে। অন্যদিক বাংলাদেশেরও ঋণের কিস্তি পরিশোধের সময় ঘনিয়ে আসছে। তার আগেই টান পড়েছে বৈদেশিক মুদ্রার ভাঁড়ারে। প্রবাসী আয় কমতে শুরু করেছে। তৈরি পোশাক রফতানিতে যদি কোনো কারণে ঋণাত্মক ধারা শুরু হয় তবে বাংলাদেশেরও শ্রীলঙ্কার মতো পথে বসতে সময় লাগবে না।

বৈশ্বিক পরিস্থিতির উত্তাপ লেগেছে বাংলাদেশেও। অতিদ্রুত বেড়ে চলেছে নিত্যপণ্যের দাম। টাকার মান ধরে রাখতে সরকারের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে বারবার। এমনিতেই মারাত্মক পাচারপ্রবণ এই দেশ। স্বাভাবিক অবস্থাতেই কোটি কোটি টাকা পাচার করে এই দেশের লুটেরা শ্রেণি। আর বিশ্বজুড়ে ডলারের এই আকালে টাকার মান কৃত্রিমভাবে ধরে রাখার চেষ্টা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে টাকাকে ডলারে বদলে বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়াটা পাচারকারীদের কাছে যে আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে তাতে আর সন্দেহ কী? পাশাপাশি ব্যাংকের মাধ্যমে প্রবাসীদের টাকা পাঠানোও নিরুৎসাহিত হতে থাকবে, কারণ হুন্ডি অধিকতর লাভজনক বলে বিবেচিত হবে।

অর্থনীতি যেহেতু অনুরোধ-উপরোধ বা দেশপ্রেম ইত্যাদির দোহাই দিয়ে চলে না, সুতরাং টাকার মান কৃত্রিমভাবে ধরে রাখতে গেলে এমনকি রপ্তানিবাণিজ্য থেকে

পাওয়া আয়ও দেশি টাকায় নগদায়ন বিলম্বিত করতে থাকবে রপ্তানিকারকরা। আর সরকার যদি টাকার মানকে বাজারের ওপরে ছেড়ে দেয় তাহলে ডলারের সাপেক্ষে টাকার মান আরও পড়ে যাওয়া অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবে। তার মানে মুদ্রাস্ফীতির একটা সুনামি বাংলাদেশে আঘাত হানার শঙ্কাও প্রবল হয়ে উঠবে। এই জলে কুমির ডাঙ্গায় বাঘ পরিস্থিতি বাংলাদেশের জন্য বিশেষভাবে বিপজ্জনক। দীর্ঘদিনের জমিয়ে রাখা মিথ্যা ও অব্যবস্থাপনার খেসারত, উন্নয়নের গান শোনা বাংলাদেশের বিধিলিপির মতো অখণ্ডনীয় হয়ে উঠেছে বলা যায়।

এরই মধ্যে সরকারি কর্মচারীরা বেতনবৃদ্ধির দাবিতে নানান কর্মসূচি দিতে শুরু করেছে। নিত্যপণ্যের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে অসন্তোষকে ধূমায়িত করে তুলছে। সীমিত আয়ের মানুষ সংসার টেনে নিতে হিমশিম খাচ্ছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ মারাত্মকভাবে সংকুচিত হয়ে পড়ায় তীব্র হতাশা ছড়িয়ে পড়ছে কর্মহীন মানুষের মনে। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্র মানুষের মনোযোগ ভিন্ন দিকে আকৃষ্ট করতে বরাবরের মতো নানান পদক্ষেপ জারি রেখেছে। অভাবিত সব ইস্যুকে সামনে নিয়ে এসে মানুষকে আরও বিভাজিত আর বিভ্রান্ত করার বিচিত্র সব পাঁয়তারা চলছে।

বাস্তবতা হচ্ছে, বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি এতটাই জটিল ও ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে যে, এমনতর লোকভুলানো কার্যক্রম ক্ষমতাসীনদের গদি রক্ষায় কোনো ভূমিকা যে রাখতে পারবে না তা দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে উঠছে। সীমাহীন দুর্নীতি, ছলচাতুরি, চালাকি, অব্যবস্থাপনা, অবিচার, অত্যাচারের যুগব্যাপী দুঃশাসনে নাভিশ্বাস ওঠা জনমানসে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা এখন তীব্রতর। স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে নিম্নচাপ ঘনীভূত হতে শুরু করেছে। দুঃশাসন বিরোধী রাজনৈতিক জোট যেমন গড়ে উঠতে শুরু করেছে তেমনি জোরালো হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক সংস্কারের আলাপ। আশার কথা এই যে, বিদ্যমান ক্ষমতাকাঠামো অক্ষুণ্ন রেখে কেবল এক দল থেকে আরেক দলের হাতে, এক প্রধানমন্ত্রী থেকে আরেক প্রধানমন্ত্রীর হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর যে ইতিবাচক কোনো পরিবর্তনই সূচিত করে না; মানবিক মর্যাদা, সাম্য ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় বিদ্যমান কাঠামো-বিধি-ব্যবস্থা-আইনকানুন যে মারাত্মক এক প্রতিবন্ধক তা অনুধাবন করতে শুরু করেছে মানুষ। সরকার বদলের সাথে সাথে সাংবিধানিক তথা শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের দাবিও ক্রমশ দানা বাঁধতে শুরু করেছে।

সম্পাদনা পর্ষদের পক্ষে
আর রাজী

রাষ্ট্র সংস্কারের রাজনীতি: একটি খসড়া প্রস্তাব

হাসনাত কাইয়ূম

ভূমিকা : বিগত প্রায় আড়াইশ বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এদেশ অর্থনৈতিক ভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর মতো একটি অবস্থায় আসতে শুরু করেছে বিগত ২০-২৫ বছর আগে থেকে। ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট (জনসংখ্যায় তরুণদের প্রাধান্যের সুবিধা), বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এশিয়ার উঠে আসা, আমাদের তরুণদের বেপরোয়া মাইগ্রেশন এবং তাদের প্রায় সাকুল্য আয় দেশে পাঠানোর কারণে তুলনামূলক বেশি রেমিট্যান্স প্রাপ্তি, কিশোরীদের আমানবিক পরিশ্রম এবং পরিবেশের অপরিমেয় ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে গার্মেন্টস সেক্টরের দ্বিতীয় স্থান ধরে রাখা, আমাদের কৃষকদের অকল্পনীয় অর্জন এবং নানাক্ষেত্রে আমাদের সৃজনশীল মানুষদের অবদান ; সব মিলিয়ে দেশকে স্বনির্ভর অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করার মতো পুঁজির সংকুলান সম্ভব করে তুলেছিল। কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যেমন বেপরোয়া লুণ্ঠন করে সোনার বাংলাকে মন্বন্তরে ঠেলে দিয়েছিল বর্তমান শাসকগোষ্ঠীও তেমনি লুটপাট, অপচয় ও পাচারের মাধ্যমে দেশের সেই সম্ভাবনাকে ধ্বংস করে, দেশকে আবার দেউলিয়া পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এ আশংকাজনক অবস্থা থেকে দেশ, দেশের মানুষ, সম্পদ, প্রকৃতি, পরিবেশ এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে রক্ষা করতে হলে বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তে একটি বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানবান্ধব, উন্নততর আধুনিক, কল্যাণকামী, মানবিক, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-সরকার এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারতে হবে।

বাংলাদেশে, বর্তমানে যেসব রাজনৈতিক দল আছে সেগুলিকে মোটাদাগে তিনভাগে ভাগ করা যায়

১) বিদ্যমান ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার পক্ষের ধারা। মিডিয়া এ ধারার

দলগুলিকে 'মূলধারা' বলে অভিহিত করে থাকে। গত ৫০ বছর এদেরই কোনো না কোনো দল একক বা মিলিতভাবে দেশ শাসন করেছে। আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয়পার্টি এই ধারার প্রধান প্রধান দল।

২) বাম, কমিউনিস্ট ধারা ; এই ধারার অনেকগুলি দল, উপদল, গ্রুপ বাংলাদেশে ক্রিয়াশীল। এদের নিজেদের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য থাকলেও মোটাদাগে এরা বামপন্থী ধারা হিসেবে চিহ্নিত। তারা দাবি করে বর্তমান ধারা বজায় রেখে দেশের শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি মানুষের মুক্তি আসবে না। মুক্তির জন্য শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে সমাজ বিপ্লব করতে হবে।

৩) এ ধারার বাইরে অরেকটি ধারা এদেশে ক্রিয়াশীল যাদেরকে মোটাদাগে মানুষ ধর্মীয় রাজনীতির ধারা বলে চিহ্নিত করে। এই ধারার দলগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে ইসলামী ধারার দলগুলিই প্রধান। এরাও বামদের মতো নানা মত, পথ ও গ্রুপে বিভক্ত হলেও মোটাদাগে এদের সবাই ইসলামী বিপ্লবের মাধ্যমেই পরিবর্তন এবং মুক্তিতে বিশ্বাস করে। রাজনীতিতে এরা বর্তমানে বেশ সক্রিয় এবং ক্রমশ প্রভাবশালী শক্তি হয়ে উঠছে ।

এই তিন ধারা সেই কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশ গড়ে তোলার রাজনীতি দাঁড় করাতে ক্রমাগত ব্যর্থ হচ্ছে।

এই তিন ধারার বাইরে অতি সম্প্রতি আরেকটি রাজনৈতিক ধারা বাংলাদেশের রাজনীতিতে ক্রমশ দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। এরা রাষ্ট্রকে গণক্ষমতান্ত্রিক, মানবিক, কল্যাণকামী এবং জবাবাদিহিতামূলক করার জন্য রাষ্ট্র পরিচালনার বিদ্যমান আইন-কানুন, সাংবিধানিক ক্ষমতাকাঠামোর পরিবর্তন প্রয়োজন বলে দাবি করে। বর্তমানে তারা নিজেদেরকে রাষ্ট্রসংস্কারের রাজনৈতিক ধারা হিসেবে পরিচয় দিতে পছন্দ করে। এরা প্রচলিত মূল ধারার বিপরীতে, বাম এবং ইসলামী ধারার বাইরে একটি রাজনৈতিক বক্তব্যকে জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা করছে।

প্রথমে *রাষ্ট্রচিন্তা* নামক একটি গ্রুপ বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা হিসেবে বিদ্যমান সংবিধানের অগণতান্ত্রিক ও ঔপনিবেশিক ক্ষমতা কাঠামোকে চিহ্নিত করে এই সাংবিধানিক ক্ষমতাকাঠামো, রাষ্ট্র পরিচালনার আইন-কানুন এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর একব্যক্তিকেন্দ্রিক, জবাবদিহিহীন ঔপনেবেশিক

চরিত্র বদলানোর জন্য ৭ দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেছে। [আর একটু বিস্তারিত দেখতে আগ্রহীরা দেখুন; 'বাংলাদেশের সংবিধান পর্যালোচনা' এবং রাষ্ট্রচিন্তার ঘোষণা, প্রস্তাবনা ও গঠনতন্ত্র]। তাদের ধারাবাহিক প্রচারণা ইতিমধ্যে সমাজের সচেতন ও সংবেদনশীলদের একটি অংশের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। তাদের ঘোষিত ৭ দফা প্রস্তাবনাটি বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রচিন্তায় ক্রিয়াশীলদের একটি অংশ বর্তমানে 'রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন' নামে সরাসরি রাজনীতিতে অংশ নেওয়া শুরু করেছে। তারা তাদের ৭ দফা প্রস্তাব, বাস্তবায়ন পদ্ধতি এবং সংগঠন কৌশলকে একত্রে রাষ্ট্র সংস্কারের রাজনীতি হিসেবে অভিহিত করে থাকে। [দেখুন, রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের ঘোষণা ও গঠনতন্ত্র]। বর্তমান বাংলাদেশের রাজনীতিতে সংবিধান সংস্কার তথা রাষ্ট্র সংস্কারের রাজনীতি কিছুটা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তবে এ বিষয়ে যথেষ্ট অস্পষ্টতাও রয়েছে, সেটাকে আর একটু স্পষ্ট করার প্রয়োজন থেকেই এ নিবন্ধ, ফলে কিছুটা পুনরাবৃত্তির আশংকাও আছে ।

সংস্কার বলতে সাধারণভাবে এখানে কী বোঝানো হয়?

আমাদের অঞ্চলে 'সংস্কার' শব্দটি সাধারণভাবে ইতিবাচক কিছুরই ইঙ্গিত বহন করে। আমাদের ইতিহাসে সমাজ সংস্কার, ধর্ম সংস্কার, আইন সংস্কার এমন কিছু বিষয়ে অতীত অভিজ্ঞতার সাথে মিলিয়ে, মানুষ সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডকে বিদ্যমান অবস্থার চাইতে কিছুটা অগ্রগতি হিসেবেই বিবেচনা করে। আমাদের সাধারণ মানুষদের বাইরে, যারা মার্কসবাদী বা কমিউনিষ্ট ঘরানার রাজনীতির সাথে পরিচিত তারা 'সংস্কার','সংস্কারবাদ' এই প্রত্যয়গুলির সাথে অন্যভাবে পরিচিত, যেটা তাদের কাছে অনেকটা নেতিবাচক তৎপরতারই নামান্তর।

বিষয়ের গভীরে যাওয়ার আগে আমাদের অঞ্চলে এই শব্দগুলো দিয়ে এখানকার মানুষেরা কী বোঝেন তার একটি ধারণা নেয়ার চেষ্টা করা যাক।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় *বঙ্গীয় শব্দকোষ*-এ 'সংস্কার'-এর যে ২৬ টি অর্থ এবং ব্যবহারের নমুনা দিয়েছেন, তার একটিতে বলা হয়েছে; জীর্ণসন্ধান, মেরামত।

সংস্কারের স্বীকৃত ইংরেজি পরিভাষা হলো 'রিফর্ম'। অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারীতে 'রিফর্ম'-এর অর্থ করা হয়েছে এইভাবে 'টু ইমপ্রুভ এ সিস্টেম,

এন অর্গনাইজেশন, এ ল, এস্ট্রো বাই মেকিং চেঞ্জ টু ইট' অর্থাৎ জরাজীর্ণ কোনো একটা ব্যবস্থাকে কিছুটা পরিবর্তন করে খানিকটা উন্নত করা ।

সংস্কার, সংস্কারবাদ ও বিপ্লব; মার্কসীয় ধারণা

মার্কসবাদীরা এ বিষয়ে একমত যে, 'সংস্কার' ও 'সংস্কারবাদ' এক নয়। সংস্কার এক প্রকার (একশন) কর্ম, সংস্কারবাদ একটি দার্শনিক অবস্থান। মার্কসবাদী রাজনীতিক-চিন্তকরা সংস্কারের বিরুদ্ধে নয়, কিন্তু তাদের বিপ্লববাদী অংশ অবশ্যই সংস্কারবাদের বিপক্ষে। মার্কসবাদী ঘরানার রাজনীতিক-চিন্তকদের মধ্যে 'সংস্কার' ও 'সংস্কারবাদ' বিষয়টি আলোচনায় আসে যখন মার্কসবাদী হিসেবে পরিচিতদের কেউ কেউ মার্কসবাদ ও সংস্কারবাদের মধ্যে কোনো দুর্লঙ্ঘনীয় পার্থক্য নাই বলে তত্ত্ব নির্মাণ করার চেষ্টা শুরু করেন। কার্ল মার্কসকে তারা একজন রিফর্মিষ্ট বা সংস্কারবাদী হিসেবেই চিহ্নিত করার চেষ্টা করেন এবং বিপ্লবের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে বলেও তারা দাবি করেন। এক্ষেত্রে বার্নস্টাইন এবং তার *কার্ল মার্কস এন্ড সোস্যাল রিফর্ম* বইয়ের কথা উল্লেখ করা যায়। বার্নস্টাইনের যুক্তির বিপরীতে রোজা লুক্সেমবার্গের তাত্ত্বিক প্রস্তাবনা *রিফর্ম অর রেভিলিউশন* বইটিও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এইসব বিতর্কে রোজা এবং পরবর্তীতে অন্যান্য বিপ্লবী মার্কসবাদীরা সংস্কারবাদের বিপক্ষে এবং বিপ্লবের পক্ষে অবস্থান নিলেও, স্বাভাবিকভাবেই সংস্কারের বিপক্ষে কোনো অবস্থান নেন নাই। এক্ষেত্রে সবচেয়ে সহজ উদাহারণ হতে পারে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়নিজম। মার্কসবাদীরা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিপক্ষে নয়, কিন্তু ট্রেড ইউনিয়নবাদ বিরোধী অবশ্যই।

কেন আমরা রাষ্ট্র সংস্কারের কথা বলি ?

আমাদের নিজেদের অর্থনৈতিক ইতিহাস, সাংস্কৃতিক ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, জনমনস্তত্ত্ব এবং রাষ্ট্রনৈতিক তৎপরতার ইতিহাস এবং পৃথিবীর অপরাপর দেশ ও জনগোষ্ঠীর অনুরূপ ইতিহাস নিবিড় এবং নির্মোহ পর্যালোচনার পর,এদেশের জনগণের এই মুহূর্তের সংকট থেকে উদ্ধারের পথ হিসেবে আমরা রাষ্ট্র সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হয়েছি।

এই পরিসরে এ পর্যালোচনার প্রত্যেকটির পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব

নয়। তবে বিষয়ের পারম্পর্য অনুধাবনের জন্য ন্যূনতম যতটুকু প্রয়োজন, তার অতি সামান্য একটি অংশ নিচে তুলে ধরা হলো :

বাংলাদেশের ইতিহাসকে মোটাদাগে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়; ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে আসার আগের ইতিহাস এবং কোম্পানি আসার পরের ইতিহাস। বলাই বাহুল্য আমরা বর্তমানে পরের পর্বেই বসবাস করছি।

ব্রিটিশদের কোম্পানি থেকে শাসক হওয়া এবং সবশেষে ভারত ছেড়ে যাওয়া পর্যন্ত সময়কালকে মোটাদাগে তিনপর্বে ভাগ করা যায়:

এক) ১৬১২ থেকে ১৭৫৭ পর্যন্ত কোম্পানির বাণিজ্যিক পর্ব।

দুই) ১৭৫৭-র পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে ১৮৫৭-এর সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত কোম্পানির দখল এবং শাসন পর্ব।

তিন) ১৮৫৮ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত, কোম্পানি শাসনের অবসান এবং ব্রিটিশ সরকারের অধীনে ঔপনিবেশিক শাসনের পর্ব। তিনটি পর্ব জুড়ে আসলে একটাই ভ্রমণ। এই তিনটি পর্বের প্রথম দিকে কিছুটা কৌশলে এবং কিছুটা শক্তির মিশেলে এরা নিজেদের অবস্থানকে সংহত ও নিরংকুশ করেছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ধাপে ধাপে তারা রাষ্ট্র ক্ষমতা কব্জা ও দখল করে অবাধ লুটপাট এবং চরম দমন-পীড়নের মাধ্যমে এমন ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি করেছে যা তাদেরকে অনেক বিদ্রোহের পথ বেয়ে ১৮৫৭ এর স্বাধীনতা যুদ্ধের মুখোমুখি হতে বাধ্য করেছে। তৃতীয় পর্বে ব্রিটিশ সরকার নিজে মঞ্চে প্রবেশ করেছে। শাসনতান্ত্রিক ও আইনি পথে শাসন, শোষণ, দমন, পীড়নকে বৈধ করে নিয়েছে এবং এখানকার বংশবদদের আনুকূল্যে শাসনকে দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা করেছে।

বলাবাহূল্য দীর্ঘ শাসন প্রক্রিয়ার শেষ পর্বের এই আইনি রূপটাই তাদের চূড়ান্ত এবং পরিণত রূপ এবং এ ব্যবস্থাটাই তারা এখানে রেখে গেছে, যার মধ্যে আমরা আছি এবং যার দ্বারা আমরা শাসিত হচ্ছি।

এই শাসনপ্রণালীর কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য অতিসংক্ষেপে দেখা যায়:

১. রাষ্ট্রের প্রত্যেকটা অঙ্গ ; যেমন আইন বিভাগ (সংসদ), বিচার বিভাগ (কোর্ট-কাচারি) এবং প্রশাসনিক বিভাগ (সামরিক-বেসামরিক আমলা-অফিসার, কর্মকর্তা-কর্মচারী, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী, পুলিশ

ইত্যাদি) এই তিনটি প্রধান বিভাগই তাদের ঊর্ধ্বতন প্রশাসকের কাছে এবং প্রত্যেক বিভাগের প্রধানগণ আবার বড়লাট কিংবা গভর্নর জেনারেলের কাছে দায়বদ্ধ ছিল। অর্থাৎ এটি এমন একটি রাষ্ট্র কাঠামো যেখানে শীর্ষ পর্যায়ের কয়েকজন বিশ্বস্ত কর্মকর্তা থাকলেই রাষ্ট্রটি পরিচালনা সম্ভব এবং যেখানে রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা একপদে কিংবা একজনের কাছে কেন্দ্রীভূত।

২. এই দেশের আয়তন এবং জনসংখ্যার তুলনায় তারা ছিল সংখ্যায় অতি অল্প। অল্প মানুষ দিয়ে একটি বৃহৎ অঞ্চলকে শাসন করার জন্য যে ধরনের পিরামিড আকৃতির অর্থাৎ কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা কাঠামোর রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হয়, তারা তাই গড়ে তুলেছিল।

৩. খাজনা আদায়, প্রশাসন পরিচালনা এবং নিরাপত্তা বিধানের জন্য তাদের প্রশিক্ষিত এবং অনুগত লোকবল দরকার ছিল। সেই লক্ষ্যে তারা খাজনা আদায়ের জন্য জমিদার শ্রেণি তৈরি করে এবং প্রশাসনিক কর্মচারী তৈরির জন্য শিক্ষার বিস্তার ঘটায় ।

৪. এদেশে সবশেষে তারা চালু করে রাজনীতি। ফলে এখানকার জনপ্রতিনিধিরা আমলা তৈরি করেনি; বরং আমলারা জনপ্রতিনিধিদের তৈরি করেছে এবং তাদের ক্ষমতা, কার্যকাল নির্ধারণ করেছে।

৫. এখানে শাসনতন্ত্র তৈরির আগে (১৮৫৭) আইন-আদালত, কোর্ট-কাচারি, উকিল-মোক্তার তৈরি করা হয়েছে। ফলে শাসনতন্ত্র অনেকাংশে আইনের মুখাপেক্ষী হয়ে গেছে, আইন সবসময় শাসনতন্ত্রের সাপেক্ষে হয় নাই।

৬. রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর দুই ধরনের আইন ছিল। এক ধরনের আইন দ্বারা এই প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেরা কীভাবে পরিচালিত হবে এবং ঊর্ধ্বতন কতৃপক্ষের কাছে তাদের জবাবদিহিতা কীভাবে নিশ্চিত হবে, সেই অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা নির্ধারিত হতো। এবং আরেক ধরনের আইন দ্বারা প্রজাদের সাথে রাষ্ট্র-সরকারের সম্পর্ক নির্ধারিত হতো। রাষ্ট্র-সরকার চালানোর এই আইনগুলোর মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানগুলো প্রধানত ব্যবহৃত হতো জনগণের কাছ থেকে অর্থ-সম্পদ সংগ্রহ এবং সংগৃহীত সম্পদের প্রধান অংশটি তাদের নিজ দেশে নিরাপদে প্রেরণ করার শাসন ব্যবস্থা জারি রাখার জন্য।

এই ধরনের আইনগুলোকে অন্যভাবে রাষ্ট্রের ক) অর্থনৈতিক আইন খ) প্রশাসনিক আইন গ) রাজনৈতিক আইন এবং ঘ) শাসনতান্ত্রিক আইন হিসেবে ভাগ করা যায়।

ক) অর্থনৈতিক আইন: সাধারণভাবে অর্থনৈতিক আইনগুলোর মাধ্যমে খাজনা-ট্যাক্স নির্ধারণ, আদায়, রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়, উন্নয়ন-সেবা, দেশি-বিদেশি ব্যবসা-বাণিজ্য,ব্যাংক-বীমা তথা রাষ্ট্রের যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলো পরিচালিত হয় এবং এইসব আইনকে ব্যবহার করেই দেশের জনগণের কাছ থেকে সরকার, রাষ্ট্র পরিচালনার অর্থ আদায়ের জন্য বাজেট করে, খরচ করে, অপচয় করে, আত্মসাৎ করে।

খ) প্রশাসনিক আইন: প্রধানত রাষ্ট্র-সরকারের অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায় এবং এইসব কর্মকাণ্ডে বাধা সৃষ্টি করতে যাতে কেউ সাহস না পায় এবং কেউ দুঃসাহসী হয়ে বাধা সৃষ্টি করলে যাতে তাদের দমন-পীড়নের মাধ্যমে বিরত করা যায়, প্রশাসন মূলত সেই কাজটাই করে। যদিও দৃশ্যত মনে হয় প্রশাসনকে জনগণের সেবা করার জন্য গড়ে তোলা হয়েছে। মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য তারা হাজার হাজার আইনের ভেতরে ২-৪ টা আইন লুকিয়ে রাখে, যেটা তাদের দমনের প্রকৃত হাতিয়ার।

গ) রাজনৈতিক আইন: নির্বাচনের আইন, ভোটার হওয়ার আইন, দল হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার আইন ইত্যাদি। এই আইনগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে সাধারণ মানুষ তাদের নিজেদের স্বার্থের দল গড়ে তুলতে না পারে, দল গড়ে তুললেও সত্য কথা বলতে না পারে, নির্বাচনে অংশ না নিতে পারে, নিতে পারলেও যাতে বিজয়ী না হতে পারে অর্থাৎ এক কথায় জনগণের পক্ষের রাজনৈতিক শক্তি যাতে সংগঠিত হয়ে লুটপাটে বাধা সৃষ্টি করতে না পারে এবং রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে না পারে, সেই জন্যেই এইসব আইন তৈরি করা হয়।

ঘ) শাসনতান্ত্রিক বা সাংবিধানিক আইন: শাসনতন্ত্র যখন থাকে তখন, শাসনতান্ত্রিক আইন, মূলত উপরে যে তিন ধরনের আইনের কথা বলা হয়েছে সেই সমস্ত আইনকে বৈধতা প্রধান করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয়, জনগণ যে কায়দায় শাসিত হওয়ার সম্মতি দিয়েছে, সংবিধানে বা শাসনতন্ত্রে সেইসব সম্মতিগুলোই লিখিত আছে ।

৭. অল্প কিছু মানুষের দ্বারা একটি বিশাল জনগোষ্ঠী এবং বিস্তৃত এলাকায় ক্ষমতা, শাসন-শোষণ অব্যাহত রাখা এবং উপনিবেশ স্থাপনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার ছিল বিভাজন; তাদের 'ডিভাইড এন্ড রুল পলিসি' (ভাগ করো এবং শাসন করো নীতি)। [বিস্তারিত দেখুন : 'বিভাজনের রাজনীতি', হাসনাত কাইয়ূম, *রাষ্ট্রচিন্তা* জার্নাল, ৫ম সংখ্যা (বর্ষ ৪, সংখ্যা ২)]

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের যেসব বৈশিষ্ট্যের কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, তার সব কিছুই এখনো বহাল আছে এবং অনেক ক্ষেত্রে শোষণ, লুণ্ঠন, পাচারের পরিমাণ আরও বেড়েছে এবং সেই বাড়তি চাপ মেনে নিতে মানুষকে যাতে বাধ্য রাখা যায়, সেইজন্য দমন-পীড়নের নতুন নতুন আইন কানুন বানাতে হচ্ছে, যা আগের জেল-জুলুম, হুলিয়ার মাত্রাকে অতিক্রম করে সরাসরি হত্যা, গুম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। এই সকল অপরাধমূলক এবং অন্যায্য কর্মকাণ্ডের সবই করা হচ্ছে 'বৈধ' আইনের মাধ্যমে এবং এইসব 'বৈধ' আইন-কানুন তৈরি হচ্ছে (অ)'বৈধ' সংসদ এবং জবাবদিহিহীন ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রক্ষমতাকে ব্যবহার করে। সে কারণেই আমরা মনে করি এ ব্যবস্থার সামান্য পরিবর্তন করতে হলেও এই রাষ্ট্র কাঠামোর পরিবর্তন দিয়েই শুরু করতে হবে, যে কাজটিকে আমরা বলছি 'রাষ্ট্রসংস্কার'।

উপনিবেশ আর দখল কিন্তু এক নয়

উপনিবেশ স্থাপন আর দখল করার মধ্যে অনেক মিল থাকলেও দুটি এক বিষয় নয়। উপনিবেশ স্থাপন করার ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে বলপ্রয়োগ লাগলেও পরে সেটা আর দখলের মতো থাকে না। সাধারণভাবে দখলদারদের দখলীকৃতরা মেনে নেয় না। তারা দখলদারদের প্রতিরোধ করতে চায়, ঘৃণা করে, দেশ থেকে বিতাড়িত করার জন্য লড়াই করে এবং এই লড়াই করতে যেয়ে নিজের দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে, বিকশিত করে। কিন্তু উপনিবেশের বেলায় উল্টো। সেক্ষেত্রে উপনিবেশের মানুষ, উপনিবেশ স্থাপনকারীদেরকে নিজেদের চাইতে উন্নততর, শিক্ষিত, সংস্কৃত, সভ্য, রুচিবান এবং জ্ঞানী হিসেবে মেনে নেয়। বিনা পর্যালোচনায় নিজেদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, রুচি, জ্ঞান-বিজ্ঞানকে পশ্চাৎপদ ও বর্জনীয় বলে মনে করে এবং উপনিবেশ স্থাপনকারীদের শিক্ষা-সংস্কৃতিকে অন্ধভাবে অনুসরণ এবং অনুকরণের চেষ্টা করে। মনে রাখা দরকার ব্রিটিশরা এখানে প্রথমে দখলদার

হলেও কালক্রমে ঔপনিবেশিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। এখানকার আদি শিক্ষা-যে পশ্চাৎপদ এবং ইউরোপীয় আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার মধ্যেই যে আমাদের মুক্তি ও প্রগতি, এ কথা কোম্পানি আমলেই এখানকার প্রভাবশালী ধনীরা মেনে নিয়েছিল এবং বাকিদেরকে মেনে নিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর ১৭৬৫ সালেই কোম্পানি এখানকার খাজনা তোলার অধিকার নিজেদের হাতে নিয়ে নেয়। ১৭৭৩ সালে তারা এখানে হাইকোর্ট স্থাপন করে এবং অল্পদিনের মধ্যেই উকালতির সনদ দেয়ার আইন করে। ১৭৯৩ সালে তারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নামে জমিদারি (প্রকৃতপক্ষে খাজনা আদায়কারী ব্রিটিশ দালাল) সৃষ্টি করে। এখানকার আদি ও বুনিয়াদি টেক্সটাইল শিল্পকে ধ্বংস করার জন্য ১৮০৫ সালে তারা কোলকাতায় প্রথম টেক্সটাইল মিল স্থাপন করে । ১৮৩৫ সালে তারা এখানে শিক্ষানীতি চালু করে। এই সময়কালের মধ্যে তাদের ওপর নির্ভরশীল এবং অনুসারী একটা জমিদার শ্রেণি, তাদের সহায়ক উকিল-মোক্তার-কর্মচারী, শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী মিলে এমন একটি চক্র তারা গড়ে তুলতে সক্ষম হয় যারা দেশবাসীকে বোঝানোর দায়িত্ব নেয় যে, ভারতের জনগণ নিজেরা নিজের দেশ চালানোর জন্য যোগ্য নয়। সেইজন্য কারও না কারও প্রজা হিসেবেই আরও অনেকদিন থাকতে হবে এবং যেহেতু অন্যের অধীনেই থাকতে হবে, সেক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো বৃটিশের অধীনে থাকাই।

১৮৫৭ এর সিপাহী বিদ্রোহ যাকে কার্ল মার্কস বলেছিলেন ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম, সেটা অত্যন্ত বর্বর কায়দায় ব্রিটিশরা দমন করতে সক্ষম হলেও কোম্পানিকে আড়াল করার জন্য, তাদের হাত থেকে দেশের শাসনভার সরকার নিজের হাতে নিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ভারতের শাসনক্ষমতা নিজেদের হাতে নেওয়ার পর ১৮৫৮ সালে তারা প্রথম ভারতের শাসনতন্ত্র বা সংবিধান 'ভারত শাসন আইন' নামে প্রবর্তন করে। ১৮৬১তে তারা প্রণয়ন করে 'ভারতীয় কাউন্সিল আইন'। মূলত এই ২টি আইনই ভারতের ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। ভারত শাসন আইনে ভারত কীভাবে শাসিত হবে আর ভারতীয় কাউন্সিল আইনে ভারতের কাউন্সিলর তথা আইন প্রণেতারা কি পথে নির্বাচিত হবে সেই বিষয়গুলো নির্ধারিত হয়েছে। ভারত শাসন আইন অনেকবার সংশোধিত হয়েছে এবং

এর সর্বশেষ সংশোধনী এসেছে ১৯৩৫ সালে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্টও সংশোধিত হয়েছে অনেকবার।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আমরা রাজনীতি বলতে যা বুঝি– নির্বাচন, পার্লামেন্ট, সরকার, বাজেট, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার, কর-খাজনা তার সবকিছুর ভিত্তিই গড়ে তুলেছে তারা, তাদের বানানো আইন দ্বারা এবং এখন পর্যন্ত সেই কাঠামোই অক্ষত আছে। এখানে রাষ্ট্রপরিচালনার আইন-কানুনই রাজনীতি। রাষ্ট্র পরিচালনার আইন-কানুন ছাড়া রাজনীতি বোঝার বা রাজনীতিতে ভূমিকা রাখার অন্য কোনো পথ নাই। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক বৈশিষ্ট্যের রাষ্ট্রে রাজনীতি হলো রাষ্ট্র পরিচালনার আইন-কানুন সম্পর্কে অবস্থান নেওয়া, সেটা পক্ষে-বিপক্ষে যাই হোক। রাষ্ট্র পরিচালনার আইন সম্পর্কে অবস্থান নেওয়া ছাড়া এইসব রাষ্ট্রে এমনকি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও অর্থবহ ভূমিকা নেওয়া প্রায় অসম্ভব ।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র আর ব্রিটিশ মডেলের রাষ্ট্র দুটি ভিন্ন বিষয়

ব্রিটিশ যতদিন শাসন করেছে এমনকি তারা ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাওয়ার পরেও ব্রিটিশ শিক্ষায় শিক্ষিতদের একটি বড় অংশ এখানকার জনগণকে এই বিভ্রমে আটকে রাখতে চেয়েছে যে, আমাদের শাসন কাঠামো এবং আইন-কানুন সব ব্রিটিশ মডেলের মানে পৃথিবীর সেরা গণতান্ত্রিক মডেলে বানানো। আমাদের দেশের যে দুর্ভোগ, তার মূল কারণ এখানকার জনগণ অসভ্য, তারা উন্নত গণতন্ত্রের উপযুক্ত নয়, এখানে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি কাজ করে না, গড়েই ওঠে নাই। তাছাড়া এখানকার শাসকগোষ্ঠীও লোভী ও নিপীড়ক।

কিন্তু তারা এটা কখনোই স্পষ্ট করে বলেনি যে, এইসব আইন-কানুন এবং ক্ষমতা কাঠামো ব্রিটিশরা বানিয়েছে তাদের উপনিবেশকে লুণ্ঠন এবং শাসন করার জন্য এবং আমাদের রাষ্ট্রকাঠামো হলো ব্রিটিশদের বানানো ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কাঠামো। তারা এটা বলেনি যে, ব্রিটিশ মডেলের রাষ্ট্র কাঠামোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো জবাবদিহিতা এবং জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা। কিন্তু ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক মডেলে জনগণ হলো প্রজা এবং প্রজার কাছে জবাবদিহিতার কিছু থাকতে পারে না, তাই আমাদের রাষ্ট্র কাঠামোতে জনগণের কাছে সরকারের জবাবাদিহিতার কিছু নাই।

মার্কসবাদীদের রাষ্ট্রচিন্তা

গত শতাব্দীতে রাষ্ট্র প্রশ্নকে রাজনৈতিক এবং দার্শনিকভাবে বিশ্লেষণ করে রাজনীতি নির্ধারণ করেছে এমন উল্লেখযোগ্য ধারা ছিল ২টি ; একটি এনার্কিষ্ট ধারা আর একটি কমিউনিস্ট ধারা। এনার্কিষ্ট ও কমিউনিস্ট, ২টি ধারাই বিশ্বাস করত যে 'রাষ্ট্র' গড়ে ওঠে এক শ্রেণি কর্তৃক আর এক শ্রেণিকে দমনের জন্য। তাই মানুষকে মুক্ত করতে হলে রাষ্ট্রকে বিলোপ বা ধ্বংস করতে হবে। এনার্কিষ্টরা মনে করে বিপ্লবীদের প্রথম কাজই হলো রাষ্ট্রকে ধ্বংস করা এবং এ নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব বা কালক্ষেপণের কোনো কারণ নাই। কমিউনিস্টদের এ বিষয়ে চিন্তা একটু ভিন্ন। তারা মনে করে রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে সমাজের একটি ঐতিহাসিক অনিবার্যতা থেকে। সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশের একটি নির্দিষ্ট পর্বে যখন সমাজ প্রবেশ করেছে এবং সমাজে যখন শ্রেণি বিভাজন তৈরি হয়েছে, তখনই কেবল রাষ্ট্র গড়ে ওঠার শর্ত তৈরি হয়েছে এবং রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে। তেমনি রাষ্ট্র বিলোপ করার জন্যও সমাজ বিকাশের এমন একটি স্তরে পৌঁছাতে হবে যখন রাষ্ট্রের আর প্রয়োজন থাকবে না। তখন রাষ্ট্র শুকিয়ে মরবে। রাষ্ট্রকে শুকিয়ে মারার পর্বে (সাম্যবাদ) পৌঁছানোর আগে উৎক্রমনশীল অবস্থাতেও রাষ্ট্র থাকবে (সমাজতন্ত্র)। এটিকে তখন শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্রে পরিণত করতে হবে। যারা শ্রেণি হিসেবে নিজেদের বিলোপের মধ্য দিয়ে শ্রেণিহীন একটি সমাজের দিকে অগ্রসর হবে এবং এক পর্যায়ে রাষ্ট্রহীন একটি সমাজে উপনীত হবে; অর্থাৎ কমিউনিস্টদের বিশ্লেষণ এবং প্রকল্প অনুযায়ী রাষ্ট্রকে দখল করা যায়, দখলীকৃত রাষ্ট্রের চরিত্র বদলানো যায় এবং একে শুকিয়ে মারার দিকে এগিয়ে নেওয়া যায় এবং এই নিয়ে যাওয়াটা একটি বিপ্লবী কাজ।

কমিউনিস্টদের রাষ্ট্র সম্পর্কিত বিশ্লেষণ এবং অভিজ্ঞতা দিনে দিনে গভীর ও বিস্তৃত হয়েছে। মার্কসবাদী সাহিত্যের পাঠক মাত্রই জানেন, এ বিষয়ে এদের প্রথম কাজ ছিল এঙ্গেলসের *পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা এবং রাষ্ট্রের উৎপত্তি*। এ বইয়েই তারা মানবজাতির আগ্রগতির ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখান যে মানব সমাজ শ্রেণিতে বিভাজিত হওয়ার পর এবং শ্রেণি বিভাজন অমীমাংসিত একটি সম্পর্ক হওয়ার কারণে, এক শ্রেণির আরেক শ্রেণিকে দমন করার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং এই দমনের কাজটি করার জন্য অধিপতি শ্রেণি রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলে।

ফ্রান্সে শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্রক্ষমতা দখল এবং রাষ্ট্র ক্ষমতা হাত ছাড়া হওয়ার পর কমিউনিস্টরা এই ঘটনার শিক্ষার সার সংকলন করে দেখে যে, বুর্জোয়ারা বা শাসকশ্রেণি যে রাষ্ট্রযন্ত্র দিয়ে তাদের শাসন কার্য পরিচালনা করে সেই শাসনযন্ত্রটি দখল করলেই চলে না, শাসকশ্রেণির একই শাসনযন্ত্র বহাল রেখে শোষিত শ্রমিক শ্রেণি তার স্বার্থে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারে না। প্রয়োজন হয় পুরনো ব্যবস্থাটি চূর্ণ করে নিজেদের শ্রেণির শাসনের উপযোগী রাষ্ট্র গঠন করার।

রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতা দখলের পর প্রশ্নটাকে নতুন করে পর্যালোচনা করে লেনিন তার *রাষ্ট্র ও বিপ্লব* বইতে। লেনিনের এই লেখায় 'রাষ্ট্র' যে বল প্রয়োগের হাতিয়ার এই দিকটার বিস্তারিত আলোচনাই তিনি করেছিলেন।

কিন্তু বলপ্রয়োগের সবটা সবসময় যে শুধু মাত্র শারীরিক বলপ্রয়োগ নয়, বল প্রয়োগের জন্য শাসকেরা বলপ্রয়োগের পক্ষে যে মতাদর্শ বা হেজিমনি তৈয়ার করে এবং সেই মতাদর্শের পাল্টা মতাদর্শ তৈরি না করা গেলে যে শারীরিক বলপ্রয়োগকেও ঠিকমতো প্রতিরোধ করা যায় না সেই দিকটার ওপর প্রথম আলোকপাত করেন আন্তনিও গ্রামসী।

পরবর্তীতে রাষ্ট্রের এই দিকটার আরও বিস্তারিত এবং পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ করেন আলথুসার। তিনি রাষ্ট্রের দুই ধরনের অ্যাপারেটাসকে ভাগ করে আলোচনা করেছেন। তিনি বলপ্রয়োগের পাশাপাশি বলপ্রয়োগের মতাদর্শ কীভাবে বলপ্রয়োগের সহায়ক হিসেবে কাজ করে সে দিকটাও আলোচনা করেছেন।

মার্কসবাদীদের রাষ্ট্রচিন্তার যে সংক্ষিপ্তচিত্র ওপরে দেয়ার চেষ্টা করা হলো, এর সবগুলো আলোচনাই হয়েছে এমন এক ধরনের রাষ্ট্রকে বিবেচনায় রেখে যেগুলি স্বাধীন রাষ্ট্র। অর্থাৎ ধরে নেয়া হয়েছে জনগণ কিংবা জনগণের একটি ক্ষমতাবান অংশ, এই রাষ্ট্রগুলি গড়ে তুলেছে তাদের নিজেদের প্রয়োজন থেকে, তাদের নিজেদের বোঝাপড়া অনুসারে। এদেরও আগে হেগেল কিংবা রুশো যারা রাষ্ট্রের গড়ে ওঠাকে বিশ্লেষণ করেছেন অন্য কতগুলি দৃষ্টিকোণ থেকে, যারা কাজ করেছেন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, সার্বভৌমত্বের উৎস কিংবা রাষ্ট্র নিজে সার্বভৌম হয়ে উঠলে তা জনগণের সাপেক্ষে থাকে কি থাকে না

সেইসব তাত্ত্বিক বিষয়ে কিংবা রাষ্ট্র গড়ে ওঠার ভিত্তি যে 'সামাজিক চুক্তি' সেইসব দিক নিয়েও তারা আলাপ করেছেন। তারা এসব আলোচনা করছেন স্বাধীন রাষ্ট্রের কথা মাথায় রেখে।

কিন্তু রাষ্ট্র যখন পরাধীন হয়, যখন সে পুনর্নির্মিত হয় কোনো সাম্রাজ্যের অধীনে কিংবা আরও জটিল অবস্থা হয়, রাষ্ট্র যখন গড়ে ওঠে ঔপনিবেশিক শক্তির হাতে, তখন তাদের মধ্যে এইসব বৈশিষ্ট্যের অতিরিক্ত আর কি কি শর্ত তৈরি হয় কিংবা কিসের ঘাটতি পড়ে, তাঁদের আলাপ কিংবা চিন্তার মধ্যে তা ছিল না।

গত শতাব্দীতে সমাজ ও রাষ্ট্র নিয়ে সবচেয়ে বেশি ভেবেছে, তৎপরতা দেখিয়েছে মার্কসবাদীরা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে অনেক ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ভৌগলিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে। কিন্তু এইসব ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য, স্বাধীনতা উত্তর কালে যে রূপ নিয়েছে,তা নিয়েও উল্লেখ করার মতো কোনো কাজ মার্কসবাদীরা করে নাই। আর এটা তো সবারই জানা যে, ব্রিটিশরাই সবচেয়ে বেশি দেশকে উপনিবেশিত করেছিল এবং ভারত ছিল তার মধ্যে বেশ পুরনো এবং বলা যায় সারা দুনিয়ায় উপনিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভারতীয় মডেলটাকেই তারা সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছে, ব্যবহার করেছে কিন্তু ভারতের কমিউনিস্টরা এই উপনিবেশিত রাষ্ট্র নিয়ে তেমন কোনো কাজই করেনি। এর ফল হয়েছে মারাত্মক, সারা দুনিয়ায় ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল এমন কোনো দেশেই মার্কসবাদীরা ক্ষমতা দখল করতে পারেনি।

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে শ্রেণি ও শ্রেণি সংগ্রাম

ব্রিটিশ উপনিবেশের উল্লেখযোগ্য দিক হলো এরা সম্পদ সংগ্রহ এবং সেই সম্পদ নিজেদের দেশে নিরাপদে প্রেরণ করাকে সমর্থন করার মতো একটি শ্রেণি আগেই গড়ে তুলেছে এবং এই শ্রেণির ক্ষমতা অনেকাংশে নিরংকুশ হওয়ার পরেই কেবল ব্রিটিশরা প্রথমে অনানুষ্ঠানিক এবং পরে আনুষ্ঠানিকভাবে উপনিবেশের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর যে আলোচনা আমরা দেখতে পাই, তা হলো, স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোতে শোষণ-নিপীড়নের কাজটি করে অধিপতি শ্রেণি। প্রতিষ্ঠান হিসেবে,'রাষ্ট্র' সেই শোষণের কাজটাকে পরোক্ষভাবে সহায়তা করে এবং দৃশ্যত রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানটি সেখানে একটি আপাত নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনের ভান করে।

কিন্তু ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে পুঁজিপতি বা ব্যবসায়ী বা জমিদার শ্রেণিটি গড়েই তোলা হয়েছে দখলদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় তাদের বানানো আইন কানুন ব্যবহার করে। ফলে এখানে এরা শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি শ্রেণিকে যতটা শোষণ করে, তার চাইতে অনেক অনেক বেশি শোষণ করে দখলদার সরকার, রাষ্ট্রের পরিচালক বা মালিক হিসেবে। এইসব দেশের ক্ষমতাশালীরা খোদ রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানটিকেই শোষণ এবং নিপীড়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। এইসব দেশে, রাষ্ট্রের নিজের নিরপেক্ষতার ভান করার সুযোগ অনেক কম, নাই বললেই চলে। এইসব রাষ্ট্রে, রাষ্ট্রের মালিকগোষ্ঠীর অনুগত একটি দালাল গোষ্ঠী গড়ে ওঠে, যারা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক গোষ্ঠীর অনুগ্রহ এবং রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনকে ব্যবহার করে শোষণ এবং লুটপাট করার সুযোগ পায়, তার একটি অংশ মালিকপক্ষকে পরিশোধ করা সাপেক্ষে। এমনকি এইসব দেশে উৎপাদক কিংবা ব্যবসায়ী হিসেবে যারা একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে পৌঁছে বা পৌঁছাতে চায়, তাদেরকেও কোনো না কোনোভাবে রাষ্ট্র-সরকারের অনুগ্রহ পেতে হয়। কলোনিয়াল রাষ্ট্রের শোষণের ধরনের সাথে, শোষক শ্রেণির সাথে, স্বাধীন রাষ্ট্রের শ্রেণি শোষণের পার্থক্য আছে। স্বাধীন দেশে মালিক শ্রেণি শোষণ করার কাজে রাষ্ট্রকে নিপীড়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে আর উপনিবেশে রাষ্ট্র নিজেই শোষণের যন্ত্র হিসাবে কাজ করে, নিপীড়ন তো করেই। ফলে কলোনিয়াল রাষ্ট্রের শ্রেণিদ্বন্দ্বের সাথে, শ্রেণি সংগ্রামের সাথে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের শ্রেণি সংগ্রামের ধরনেরও পার্থক্য থাকার কথা এবং আছে।

শ্রেণি সংগ্রাম সম্পর্কে আমাদের এখানে একটা বড় বিভ্রম হলো, অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তির লড়াইকে বা ট্রেড ইউনিয়ন ধরনের আন্দোলনগুলোকে শ্রেণি সংগ্রামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা প্রধান রূপ হিসেবে দেখা। শ্রেণি সংগ্রামেরও সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবং উচ্চতর দিক যে রাজনৈতিক সংগ্রাম, সে রাজনৈতিক সংগ্রামের দিকটাকে ঠিকমতো উপলব্ধি না করতে পারাও এখানকার একটি বড় বিভ্রান্তি।

জীবন দিয়েছে কমিউনিস্টরা, ফল গিয়েছে হত্যাকারী শোষকশ্রেণির দলগুলোর পকেটে

ব্রিটিশদের উপনিবেশ স্থাপনের যেমন তিনটি পর্ব ছিল, ব্রিটিশ বিরোধী লড়াইয়েরও তেমনি তিনটি আলাদা আলাদা পর্ব আছে। প্রথম পর্বে ব্রিটিশ

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে লড়াই সীমাবদ্ধ ছিল নবাব এবং তার নিয়মিত সৈন্য বাহিনীর মধ্যে। পলাশীর পর সে পর্বের এক ধরনের সমাপ্তি ঘটে। ১৭৬৫ তে কোম্পানির হাতে খাজনা আদায়ের ক্ষমতা যাওয়ার পরে সে লড়াই এদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমেই রুখে দাঁড়ায় ফকির-সন্ন্যাসীরা। তার পরে একে একে অজস্র কৃষক বিদ্রোহ, প্রজা বিদ্রোহ, আদিবাসী বিদ্রোহ হয়েছে এবং সিপাহী বিদ্রোহের হাত ধরে কোম্পানির শাসনের এক ধরনের অবসান হয়েছে।

১৮৫৮তে ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে ভারতে শাসনতান্ত্রিক শাসন শুরু করার পর ব্রিটিশ সরকার গণনেতা ও গণবিদ্রোহের হাত থেকে বাঁচার জন্য, নিজেদের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজনৈতিক দল গঠন করায়। এ পর্যায়ে নেতৃত্ব চলে আসে সাধারণ মানুষদের পরিবর্তে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত প্রভাবশালী অংশের হাতে।

প্রভাবশালী জমিদার, উকিল মোক্তার, ব্যবসায়ী শ্রেণি থেকে উঠে আসা ব্রিটিশ শিক্ষায় শিক্ষিত নেতাদেরকে নিয়ে প্রথমে কংগ্রেস এবং পরবর্তীতে মুসলমানদের নিয়ে আলাদা দল মুসলিম লীগ গঠন করানো হয়। এইসব দল এবং নেতৃত্বের প্রতি আস্থাহীনদের একটি অংশ স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র লড়াইয়ের পথ বেছে নেয়। এ রকম সময়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে ১৯১৭তে রাশিয়ায় কমিউনিষ্টদের বিপ্লব এখানকার শিক্ষিত কিন্তু সংবেদনশীল, মানবিক, যুক্তিবাদী, আধুনিক ও প্রগতিশীলদের একটি অংশকে কমিউনিষ্ট মতাদর্শের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। এরা নিজেদের শ্রেণি, বংশ মর্যাদা, ব্যাক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-অহং বিসর্জন দিয়ে শ্রমিক কৃষক মেহনতি গরিব মানুষদের মুক্তির জন্য সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদের স্বপ্নে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে এগিয়ে আসতে থাকে। পরবর্তীতে সশস্ত্র ধারার স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত ছিল, এমন অনেকেও কারাগার কিংবা আন্দামান থেকে ফেরত আসার পরে কমিউনিষ্ট ধারায় যুক্ত হওয়ায় অল্প সময়ের মধ্যেই কমিউনিষ্টরা একটি শক্তিশালী ধারা হিসেবে গড়ে ওঠে ।

কমিউনিষ্ট পার্টি গঠনের পর থেকে আজ পর্যন্ত যত বিপ্লবী যত নিষ্ঠার সাথে যত ত্যাগ করেছে, মানুষের ওপর মানুষের শোষণ লুণ্ঠন নিপীড়নের বিরুদ্ধে যত লড়াই করেছে, যত জেল-জুলুম-হুলিয়া-গুম-খুন-নির্যাতন হজম করেছে, যত সুযোগ-সুবিধা ও আপোস-প্রলোভন ঘৃণাভরে উপেক্ষা করেছে, তার

দ্বিতীয় কোনো নজির আমাদের ইতিহাসে নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তাদের এইসব ত্যাগ-তিতিক্ষা যাদের মুক্তির জন্য, সেই নিপীড়িত শোষিত বঞ্চিত মানুষদের কাছে কমিউনিস্টরা তাদের রাজনৈতিক বন্ধু ও নেতা হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারেনি। জনগণের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক নানাবিধ নির্যাতন, নিপীড়নের বিরুদ্ধে বাম কমিউনিস্টরা লড়াকু ভূমিকা নিতে পারলেও রাজনৈতিক লড়াইয়ের সময় তারা কোনো গ্রহণযোগ্য কর্মসূচি নিয়ে মানুষের সামনে উপস্থিত হতে পারেনি। ফলে বছরের পর বছর যাদের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রাম করেছে, ক্ষমতার পালা বদলের সময়, হোক তা নির্বাচনের পথে বা অন্য কোনো কায়দায় শোষকদেরই কোনো না কোনো অংশকে নির্বাচিত করতে বাধ্য হয়েছে– যাদেরকে শ্রেণিগতভাবে উৎখাতের জন্য তারা রাজনীতি করে। ভারতবর্ষের কমিউনিস্টদের এ পরিণতির দায় কোনো একক ব্যক্তি কিংবা কোনো একক দল বা কোনো গ্রুপের ওপর চাপানোর কোনো সুযোগ নাই। নেতৃবৃন্দের ব্যক্তিগত ভুল ত্রুটির কোনো প্রভাব রাজনীতিতে পড়ে না সেটা বলার সুযোগ নাই। কিন্তু একটি সঠিক ধারার রাজনীতি এক বা একাধিক ব্যক্তির ব্যর্থতা কিংবা ত্রুটির জন্যই শেষ হয়ে যেতে পারে না। এ বিষয়ে অনেক গভীর এবং বিস্তারিত পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে। এদেশের বাম-কমিউনিষ্টরা নিশ্চয়ই তা করবেন। কিন্তু এ নিবন্ধে অতি সংক্ষেপে আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক কয়েকটা দিক তুলে ধরছি:

ক) আগেই আলোচনা করা হয়েছে কমিউনিস্টরা ব্রিটিশ কলোনিকে ততটা গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করতে পারেনি। এমনকি, কার্ল মার্কস নিজে ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে শেষ পর্যন্ত ইতিবাচকই মনে করতেন। তিনি ভারতে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে লিখতে যেয়ে এই শাসনকে 'ইতিহাসের অন্ধ চালিকা শক্তি' বলে মন্তব্য করেছিলেন। তিনি ব্রিটিশ শাসনের নিষ্ঠুরতা-নির্মমতা এবং তীব্র শোষণ লুণ্ঠন সম্পর্কে সমালোচনামুখর থাকার পরেও ব্রিটিশ শাসন কথিত 'নিশ্চল ভারতীয় সমাজকে' গতিশীল করছে বলেই বিশ্বাস করতেন। তার এ বিশ্বাস, শুধু ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টি নয়, ব্রিটিশ কলোনি ছিল এমন সব দেশের কমিউনিস্টদেরকেই প্রভাবিত করেছিল।

ভারতে উপনিবেশ স্থাপনের জন্যে ব্রিটিশরা এখানকার প্রভাবশালী একটি অংশের সম্মতি আদায় করতে পেরেছিল। আর সম্মতি আদায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছিল তাদের প্রণীত অর্থনৈতিক কাঠামো

বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং শিক্ষানীতি। আয়-ব্যয়ের পথ-পদ্ধতি আর শিক্ষা মিলে এখানকার উঠতি ধনীদের যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, সেটার সুবিধাভোগীদের মধ্যে দৃশ্যত অনেক সময় বিরোধ আছে মনে হলেও, তারা প্রায় সবাই ব্রিটিশদেরকে আধুনিক বলে মেনে নিয়েছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, শাসনের সম্মতি একটা সাংস্কৃতিক বিষয় হলেও এবং এর প্রধান ভিত্তি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হলেও, এর 'অপারেটিং পার্ট' বা 'টুল' যে শাসনতন্ত্র এবং শাসনের আইন-কানুন, মার্কসবাদীরা সেই দিকটায় কখনো নজর দেয়নি। ফলে ভারতে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে কথা বললেও, এই শাসনের রাজনৈতিক রূপ যে, ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো এবং শাসনের আইনি কাঠামো সে দিকটাতে তারা গুরুত্ব দেয়নি।

মার্কসবাদীদের কাছে শাসনের আইন বা রাষ্ট্র পরিচালনার আইন গুরুত্ব পায়নি। কারণ তাদের বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুযায়ী সমাজের, ভিত্তিকাঠামো এবং উপরি কাঠামো বলে দুটি দিক আছে। এই দুটি দিকের মধ্যে, প্রধান দিক হলো ভিত্তিকাঠামো, এর ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে উপরি কাঠামো। সমাজের ভিত্তিকাঠামোটা হলো অর্থনীতি, একেকটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার (মোড অব প্রডাকশন) ওপরই নির্ভর করে সেই সমাজের উপরিকাঠামো কেমন হবে। জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রেও তারা কোনোটাকে মুখ্য এবং কোনোটাকে গৌণ বিষয় মনে করতেন। মার্কস মনে করতেন বিষয় হিসেবে অর্থনীতি, ইতিহাস ও দর্শন হলো প্রথম শ্রেণির। আইন হলো দ্বিতীয় শ্রেণির বা দ্বিতীয় স্তরের সাবজেক্ট। মার্কসের এই ধারণার বিষয়ে তিনি *এ কনট্রিবিউশন টু দি ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল ইকোনমির* মুখবন্ধে স্পষ্ট করেই লিখেছিলেন। মার্কসবাদীদের ওপর এর প্রভাবও হয়েছিল মারাত্মক। সারা দুনিয়ার মার্কসবাদীদের মধ্যে বহু বিষয়ে বহুরকম গবেষক এবং পণ্ডিত ব্যক্তি আছেন কিন্তু আইনের চরিত্র, সমাজে আইনের প্রভাব ইত্যাদি নিয়ে লেখালেখি করেছেন এমন লেখক-গবেষক খুবই অল্প, নাই বললেই চলে। ভারতীয় রাজনীতিতে এবং ব্রিটিশ কলোনির অর্ন্তভুক্ত ছিল, এমন দেশগুলিতে আইনের প্রতি মার্কসবাদী পার্টিগুলোর উন্নাসিকতার প্রভাব ছিল আরও ভয়াবহ। অ-মার্কসবাদীরা চলেছে কাণ্ডজ্ঞান দিয়ে, আইন নিয়ে তাদের কোনো বাড়তি উচ্ছ্বাস বা উন্নাসিকতা কোনোটাই ছিল না, কিন্তু দমনের হাতিয়ার হিসেবে যে এটি চমৎকার কাজ করে তা তারা অভিজ্ঞতা থেকেই জানতেন এবং এর দুর্দান্ত ব্যবহারও করেছেন কিন্তু মার্কসবাদীরা এ দিকে মনোযোগ দেওয়ার

কোনো প্রয়োজন বোধ করেননি ফলে শোষণ ও শাসন দুইটাই নির্বিঘ্নে চলেছে আইনের মাধ্যমে, বৈধতার দোহাই দিয়ে।

খ) কলোনি এবং কলোনিয়াল রাষ্ট্র পরিচালনার আইন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকায়, ভারতের রাষ্ট্র, ভারতের উৎপাদন পদ্ধতির (মোড অব প্রডাকশন) ওপর রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনের প্রভাব বুঝতে সমস্যায় পড়েছিলেন এখানকার মার্কসবাদীরা। ১৭৫৭তে বিজয়ের পর, কোম্পানি প্রথমেই হাতে নিয়েছিল দেওয়ানি কিংবা খাজনা আদয়ের অধিকার, যার পরিণতি ছিল ৭৬-এর মন্বন্তর। পরে তারা খাজনা আদায়ের জন্য একটা স্থায়ী পদ্ধতি হিসেবে ১৭৯৩ সালে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন'-এর মাধ্যমে এখানে জমিদার নামে একটা 'রেন্ট কালেক্টর' বা খাজনা আদায়কারী গোষ্ঠী গড়ে তোলে। মার্কসবাদীরা যেহেতু ইউরোপীয় সমাজ ও ইতিহাস বিশ্লেষণ দ্বারা অতিমাত্রায় প্রভাবিত ছিলেন, তাই তারা এই জমিদারি ব্যবস্থাকে ইউরোপের সামন্তবাদের সাথে তুলনা করে একে 'ভারতীয় সামন্তবাদ' হিসেবে চিহ্নিত করে এবং কোম্পানির খাজনা আদায়কারী গোষ্ঠীটিকে 'সামন্ত' বলে ধরে নেয়। কার্ল মার্কস নিজে অবশ্য এই অঞ্চলের উৎপাদন পদ্ধতি আর ইউরোপের উৎপাদন পদ্ধতিকে একইভাবে বিশ্লেষণ করা যায় বলে মনে করতেন না। তিনি এই অঞ্চলের উৎপাদন পদ্ধতিকে ইউরোপীয় সমাজের 'মোড অব প্রডাকশন' দিয়ে চিহ্নিত না করে 'এশিয়াটিক মোড অব প্রডাকশনের' স্বরূপ সন্ধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। ভারতীয় সমাজের উৎপাদন পদ্ধতি বিশ্লেষণের এই বিভ্রম তাদেরকে তেভাগা আন্দোলন এবং সর্বশেষ নকশালবাড়ি আন্দোলনের মতো আন্দোলনের পথে ঠেলে দেয়। যার জের ৮০-র দশক পর্যন্ত এখানকার মার্কসবাদী বিপ্লবীদের একটি অংশ বহন করে গেছে। অথচ এইখানে রেন্ট কালেকটর এবং কৃষক প্রজাদের দ্বন্দ্ব এবং অধিকার নিয়ে আন্দোলন করে "কৃষক প্রজা পার্টি" সরকার গঠন করেছে, মুসলিম লীগের মতো অ-বিপ্লবী শক্তিও জমিদারি উচ্ছেদের দাবি উত্থাপনের মাধ্যমে 'পকিস্তান' নামে আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দিয়েছে।

গ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়া এবং ব্রিটিশ সরকারের জার্মান বিরোধী ঐক্য এখানকার বাম-কমিউনিস্টদের জন্য বিপদজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। একদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে রক্ষার আন্তর্জাতিক দায়িত্ব এবং অন্যদিকে নিজ দেশের স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালনের

ঐতিহাসিক ভূমিকার মধ্যে টানাপোড়েন তৈরি হলে স্থানীয় কমিউনিস্টরা বেকায়দায় পড়ে। দেশের জনগণের এমন রাজনৈতিক মোড় ফেরানো পরিস্থিতিতে কমিউনিস্টদের ভূমিকা তাদেরকে অনেকাংশে জনবিচ্ছিন্ন করে ফেলে।

ঘ) জ্ঞানতত্ত্বের একটি বড় ভিত্তি হচ্ছে যুক্তিবিদ্যা। ইউরোপীয় যুক্তিবিদ্যা অ্যারিস্টটলের আমল থেকেই দুই মাত্রিক ; 'হা অথবা না', কিংবা 'সত্য অথবা মিথ্যা' ধরনের। এই ধরনের যুক্তিবিদ্যার সাথে সাধারণ গণিতের নৈকট্য বেশি। সাধারণ গণিতেও 'সঠিক অথবা ভুল' ধারণা অনেক বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ। আধুনিক ইউরোপের জ্ঞান চর্চার একটি প্রত্যয় ছিল গণিত হলো সত্য এবং সর্বজনীন। বিংশ শতাব্দীতে এসে 'যুক্তিবিদ্যা এবং গণিতের' সর্বজনীনতাকে সামজিক বিজ্ঞানেরও ভিত্তি হিসেবে মেনে নেওয়া হয়েছে এবং চিন্তার জগতে "বিজ্ঞান" এমন এক মারাত্মক শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে যে, যেসব চিন্তাকে বিজ্ঞানভিত্তিক বলে প্রতিষ্ঠা করা গেছে, সেইসব চিন্তার নিজের আর সঠিকতার প্রমাণ দিতে হয় নাই। (তবে গত শতকের পঞ্চাশের দশক থেকে খোদ ইউরোপেই সামাজিক বিজ্ঞানের 'সত্য' এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের 'সত্য'-যে একই ধরনের বা প্রকৃতির নয়; এই সচেতনতা তৈরি হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের অঞ্চলের মার্কসবাদী ও অপরাপর আধুনিকতাবাদীরা ইউরোপের এই সজীব ধারাকে অনুসরণ করেনি। ফলে ইউরোপকে অনুকরণ করতে গিয়ে তারা ইউরোপের ক্যারিকেচারে পরিণত হয়েছে।)

মার্কসবাদ সমসাময়িক ইউরোপীয় দর্শন বিশেষত জার্মান দর্শনের নানা দিককে সমালোচনা করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। এ ছাড়া পুঁজিবাদ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও তারা একই ধারার যুক্তি দিয়ে পুঁজিবাদের বিনাশ এবং শ্রমিকশ্রেণির মুক্তির স্বপ্নকে একটা বৈজ্ঞানিক চেহারা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কিন্তু এখানকার মানুষের দর্শন, ইউরোপীয় দর্শন থেকে আলাদা ও ভিন্ন। এখানে চতুস্কোটির মতো যুক্তিবিদ্যা ছিল। এখানকার জ্ঞানতত্ত্বের সাথে, এখানকার সমাজ মনস্তত্ত্বের সাথে ইউরোপীয় জ্ঞানতত্ত্ব ও সমাজমনস্কতার উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ছিল। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য ছিল দর্শনের সংজ্ঞার মধ্যেই। এখানে দর্শন ছিল বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্কিত দেখা, বোঝার বিষয়। তাই এখানকার অধিকাংশ মানুষ তার জীবন যাপনের মধ্যেই চতুস্কোটি যুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ করে অভ্যস্থ ছিল। যুক্তিবিদ্যার এই স্কুলটি

অত্যন্ত প্রাচীন এবং এখন বিলুপ্তপ্রায় (আমাদের কিছু অসম্ভব পরিশ্রমী গবেষক শিক্ষক একে আবার উদ্ধার করছেন)। কিন্তু একাডেমিক পরিসর থেকে বিলুপ্ত হলেও এই বিদ্যার প্রভাব জনমানস থেকে সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। আমাদের যে বিপুল পরিমাণ মানুষ ইউরোপীয় জ্ঞানতত্ত্বের বাইরে এখনো রয়ে গেছেন তারা তাদের প্রাত্যহিক জীবনের সমস্যার পাশাপাশি আধ্যাত্মিক সমস্যা সমাধানে এই পদ্ধতিকে বংশ পরম্পরায় চর্চা করে আসছেন। এই যুক্তিবিদ্যা দুই মাত্রার না, তিন মাত্রার। দুই মাত্রার যুক্তিবিজ্ঞানে 'আমি সঠিক হলে, তুমি ভুল'; বা 'তুমি সঠিক, আমি ভুল' এই সিদ্ধান্তে আসা ছাড়া বিকল্প নাই। কিন্তু চতুস্কোটি, এই দুই মাত্রার সাথে সাথে 'তুমি-আমি দুজনেই সঠিক', অথবা 'তুমি-আমি দুজনেই ভুল'— এটাও ভাবতে পারে। এই ধরনের চিন্তাপদ্ধতির কারণেই এখানকার মানুষেরা একরৈখিক-সংকীর্ণ হয় না, জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবেই উদার হয়। এজন্যেই এখানে কোনো চরমপন্থী আদর্শ বা রাজনীতি তুমুল আত্মত্যাগের পরও, জনগণের নিজেদের জীবনের অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের পরেও ব্যাপকভাবে গ্রহণীয় হয় না।

আমাদের এখানে যারা মেধাবী ছাত্র হিসেবে স্বীকৃত, যারা ইউরোপীয় ধাচের শিল্প সাহিত্যের সাথে অধিকতর পরিচিত, যারা ইউরোপীয় নন্দনতত্ত্ব এবং ইউরোপীয় সভ্যতা এবং রুচির কাছাকাছি ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং যারা মানবিক এবং সংবেদনশীল, তারাই ইউরোপের সর্বোচ্চ বিকশিত মার্কসীয় সমাজতত্ত্বটিকে নিজেদের আদর্শ হিসেবে আত্মস্থ করতে পেরেছে। যারা যত ভালোভাবে এই তত্ত্বকে আত্মস্থ করে জীবনে এর কঠোর চর্চা করতে চেয়েছে, তারা এদেশের জনমনস্তত্ত্ব থেকে তত দূরে সরে গেছে। যারা যত বেশি ত্যাগ করেছে তারা তত বেশি অসফল হিসেবে চিত্রিত হয়েছে। আত্মত্যাগের এত অপচয় ইতিহাসের আর কোনো পর্বে হয়ত নাই। এখানে মার্কসবাদী ধারার রাজনীতি যারা করেছে এমনকি তাদের মধ্যেও তুলনামূলকভাবে, যারা কম মার্কসবাদী অবস্থান নিয়েছে (সংশোধনবাদী-সুবিধাবাদী) তারা যতটা জনসম্পৃক্ততা পেয়েছে, যারা দৃঢ়ভাবে মার্কসবাদকে (কট্টর) আঁকড়ে থাকতে চেয়েছে তারা তা পায়নি, নিঃসঙ্গ হয়ে গেছে ।

এ ধরনের চিন্তা পদ্ধতির ফল হয়েছে মারাত্মক

মার্কসবাদীরা কখনো তাদের আশু রাজনেতিক করণীয় কি, রাষ্ট্রের প্রধান সংকট কি, প্রধান সংকটের প্রধান দিকই বা কোনটি, কখনো সঠিকভাবে তা

নির্ধারণ করতে পারেনি। তারা প্রায় প্রত্যেকটি নিপীড়নের বিরুদ্ধে, অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে, সাংস্কৃতিক বিকৃতি এবং আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে যখন সমাজকে রাজনৈতিক মোড় পরিবর্তনের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছে, তখন প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বিনা ব্যতিক্রমে 'নিকটতম সমস্যার দূরতম সমাধানের' কথা বলে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তাদের লড়াইয়ের রাজনৈতিক ফসল চলে গেছে তাদের কাছে, যাদেরকে তাদের রাজনৈতিক ভাবে উচ্ছেদ করার কথা। আর এইসব ক্ষেত্রে তারা কথিত শ্রেণিশত্রুদের অসহায় অনুগামী হতে বাধ্য হয়েছে ।

দুর্ভাগ্য হলো এদেশে সমাজের পরিবর্তনের কথা মার্কসবাদীরাই বলেছে। অপরের স্বার্থে নিজের জীবন বিসর্জন দেওয়ার যে দৃষ্টান্ত তারা তৈরি করেছে তা সমাজে অজস্র অনুগামী তৈরি করেছে। তাদের বাইরে আর যারা রাজনীতি করেছে তাদের কোনো দলই ব্যবস্থার মধ্যে কোনো সমস্যা আছে, ব্যবস্থা পরিবর্তন করতে হবে এমনটা বলেনি। মূলধারার নেতারা জনগণকে সবসময় বোঝাতে চেয়েছে সমস্যা হলো প্রতিপক্ষ দলের, নেতৃত্বের। প্রতিপক্ষকে সরায়ে তাদেরকে সরকারে বসালেই দেশের মানুষের মুক্তি। ফলে সমাজের বৈষম্য, দুর্নীতি, লুটপাট, অধিকারহীনতা নিয়ে যারা কাজ করতে চেয়েছে, করতে চায়, যাদের ন্যূনতম এইটুকু কাণ্ডজ্ঞান আছে যে, শুধু মাত্র একদলের বদলে আরেক দলকে ক্ষমতায় বসালে, এক নেতার বদলে আরেক নেতার হাতে ক্ষমতা দিলেই সমস্যার সমাধান হবে না; সমস্যার সমাধান করতে হলে সরকার বা রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হবে, তারা সকলেই কোনো না কোনো একটি মার্কসবাদী দল বা গ্রুপের সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করেছে। কিন্তু মার্কসবাদীদের চিন্তাপদ্ধতির যেইসব ত্রুটির কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে সে কারণে দেখা যাবে ব্রিটিশ কলোনি ছিল এমন কোনো দেশেই তারা বিপ্লব করতে পারেনি। তার চাইতেও দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, ব্রিটিশ কলোনিয়াল রাষ্ট্রগুলোতে যে তারা বিপ্লব করতে পারেনি, এটা তারা লক্ষও করেনি অর্থাৎ এ দিকটা নিয়ে কখনো তারা ভাবেইনি।

কী করিতে হইবে?

আমরা আগে এটা স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি যে আমাদের বিদ্যমান রাষ্ট্র কাঠামো প্রধানত একটা আইনি কাঠামোর ওপর দাঁড়ানো, এখানে রাজনীতি করার অর্থ হলো রাষ্ট্র পরিচালনার আইন-কানুন সম্পর্কে অবস্থান নেওয়া।

এখানকার আইনের সবই প্রায় লিখিত এবং লিখিত আইনের অধিকাংশই আমাদের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের পরিপন্থী। আমাদের সংস্কৃতির সবই ভালো কিংবা সবই মন্দ এমন নয়। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে অনেক কিছুর পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়, হতো এবং একটা স্বাধীন দেশ তার নিজস্ব বোধ-বিবেচনা অনুযায়ী এর প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটিয়েই এগোয়। কিন্তু আমরা যেহেতু ব্রিটিশদের কলোনিতে পরিণত হয়েছিলাম সেজন্যে আমরা আমাদের ঐতিহ্যের গ্রহণীয় এবং বর্জনীয় অংশ তুলনা করে ঠিক করতে পারিনি। সবই হয়েছে তাদের নির্দেশে এবং এদেশে তাদের অনুগত বংশবদদের সুবিধার্থে। যারা আমাদের দেশে এরকম লিখিত আইন চালু করেছে তাদের নিজেদের দেশে কিন্তু তারা তেমনটা করেনি। সেখানে তাদের দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি দ্বারা যতটা পরিচালিত হয়েছে ততটা লিখিত আইন দ্বারা হয়নি। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা আইন ছাড়াই চলেছে এবং পরবর্তীতে আইন তৈরি করলেও সেটা করেছে তাদের ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে। তাদের দেশের সংবিধান বা শাসনতন্ত্র এখনো অলিখিত, কিন্তু ১৮৫৮ সালে তারা 'ভারত শাসন আইন' দিয়ে শুধু করার পর থেকে কয়েক ধাপে এর সংশোধন করতে করতে ক্রমশ একে বিস্তৃত করেছে। ১৯৩৫ সালে ছিল তাদের সর্বশেষ সংশোধন, যার এক অংশ বাস্তবায়ন করলেও আরেক অংশ বাস্তবায়নের বাকিই ছিল। প্রায় একই ঘটনা ছিল ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্টের বেলায়। মূলত শাসনতন্ত্রের নির্ধারিত হয়েছে জনগণকে কি পথে শাসন করা হবে। আর 'কাউন্সিল অ্যাক্ট' ঠিক করা হয়েছে কারা পাবে সেই শাসন করার অধিকার এবং কোন পথে। আগেই বলা হয়েছে ব্রিটিশদের হাতে বানানো এই শাসনতন্ত্রের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হয়নি তাদের হাতে, এর ফেডারেল অংশটা ভারত এবং পাকিস্তানে প্রায় অবিকৃতভাবে কার্যকর করা হয়েছে তারা চলে যাওয়ার পর। অর্থাৎ মেকলে যে তার পার্লামেন্টারি বক্তৃতায় সগর্বে বলেছিলেন যে 'এদেরকে এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে যাতে আমরা চলে যাওয়ার পরেও তারা এই পথ ধরেই চলে', সেটা সবচাইতে বেশি কার্যকর হয়েছিল শাসনতন্ত্রের বেলায় ।

পাকিস্তানের এই ভাঙন অর্থাৎ পূর্ববাংলার বেলায় একটা খুব ইতিবাচক বিষয় ছিল যে স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকেই এখানকার রাজনীতির মূল প্রশ্ন হিসেবে, শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নটা সামনে চলে আসে। ৫০ সালেই পাকিস্তানের সংবিধানের মূলনীতি প্রশ্নে পূর্ববাংলা ভিন্নমত এবং বিকল্প প্রস্তাব নিয়ে হাজির

হয়। ৫০-এর নভেম্বরেই সংবিধানের প্রস্তাবিত মূলনীতির বিরুদ্ধে এখানে হরতাল হয়। ৫৪-এর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ২১ দফার অন্যতম মূলদাবি হয়ে আসে স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন। ৬২তে আইয়ুব খানের সংবিধান পুড়িয়ে দেয় ছাত্ররা। ৬৬ সালে ৬ দফা প্রস্তাবের মূল কথাই ছিল স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে সংবিধান। তার জন্যেই ৬৯-এর অভ্যুত্থানের পরে ৭০ এর নির্বাচন ছিল 'সংবিধান সভা' বা কনষ্টিট্যুয়েন্ট অ্যাসেম্বলির নির্বাচন। ৭১-এর স্বাধীনতার যুদ্ধ মানুষকে করতে হয়েছিল কনষ্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলিকে বসতে না দিয়ে গণহত্যা শুরু করায়।

স্বাধীন দেশে ৭২-এ যে সংবিধান তৈরি করা হয় সেই সংবিধান আর স্বায়ত্তশাসনের দাবি মেটানোর সংবিধান ছিল না। একটা জনযুদ্ধের ভেতর দিয়ে দ্বিতীয়বার স্বাধীন হওয়া একটা দেশের জনগণের জন্য যে ধরনের সংবিধান প্রণয়ন করা দরকার ছিল, সংবিধানের প্রস্তাবনায়, রাষ্ট্র পরিচালনার মুলনীতি অংশে সেইসব কথা কিছুটা বলা হলেও, ক্ষমতাকাঠামো অংশে ব্রিটিশ-পাকিস্তানের শাসন কাঠামো বা ক্ষমতা কাঠামোর চাইতেও কর্তৃত্ববাদী, এক ব্যক্তিতান্ত্রিক, জবাবদিহিহীন ক্ষমতাকাঠামোই বহাল করা হয়, গণতন্ত্রের নামে। তাই ৭২ সাল থেকেই এখানকার রাজনৈতিক লড়াই হওয়ার কথা ছিল সংবিধান কিংবা শাসনতন্ত্রকে স্বাধীন দেশের নাগরিকদের মর্যাদার উপযোগী করার লড়াই। পাকিস্তান আমলে আমাদের পূর্বসূরীরা যে রাজনৈতিক পরিপক্কতা দেখিয়েছিলেন, তারা তাদের লড়াইয়ের একটা পর্ব পর্যন্ত যে সফলতা দেখিয়েছিলেন আমরা তা অব্যাহত রাখতে পারিনি ।

৭২-এর পর পর না হলেও ৮২-এর পর থেকে একটা শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন এখানে শুরু হয়, ভোটাধিকারের দাবিতে। তখন ৭২ সালের সংবিধানের একপদকেন্দ্রিক জবাবদিহিহীন ক্ষমতা কাঠামোই যে এখানকার জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছিল এটা স্পষ্ট করে না বুঝলেও নির্বাচনের সময়ের জন্য অন্তত ৭২-এর সংবিধানের নির্বাচনী আয়োজন থেকে বেরিয়ে এসে অন্যভাবে নির্বাচন পরিচালনার জন্য 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা' নামে একটি সাময়িক ব্যবস্থা জনগণ দীর্ঘ আন্দোলনের মাধ্যমে গড়ে তুলেছিল, এটি করেছিল সংবিধানের ক্ষমতা কাঠামো বজায় রেখেই। ফলে ১৫ বছর পরে এসে উচ্চ আদালতের কয়েকজন বিচারককে ব্যবহার করে আবার এই ব্যবস্থাটিকে বাতিল করে দেওয়া হয়। বলাবাহুল্য তার পরবর্তী ১৫ বছর ধরে

সেনা শাসকদের চাইতেও জঘন্যভাবে এদেশকে শাসন করছে বিনা ভোটে নির্বাচিত 'গণতান্ত্রিক' বলে দাবিদার সরকার।

দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের মাধ্যমে ৭২-এর সংবিধানের নির্বাচনী আয়োজন থেকে বের হয়ে এসে, সংবিধান সংশোধন করে, নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা সকল রাজনৈতিক দলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দীর্ঘ সময় পরে এসে আবার একটি সরকার সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারল কেন? এই প্রশ্নের উত্তরের মাঝেই আমরা কেন 'সংবিধান সংস্কার' করতে চাই তার কারণ নিহিত আছে। কেন আমরা কিছু সংসদ সদস্যের ভোটে সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধান পরিবর্তন চাই না, কেন আমরা ৭০ সালের নির্বাচনের মতো সংবিধান (সংস্কার) সভার নির্বাচন চাই, তার কারণও এর মধ্যেই নিহিত।

'সংবিধান সংশোধন' এবং 'সংবিধান সংস্কার': মিল ও পার্থক্য

'সংবিধান সংশোধন' একটি আইনি পরিভাষা। আদালতে, বিশেষত উচ্চ আদালতে অনেক সময়ই সংশোধনের বৈধতা-অবৈধতা বিচারের জন্য নিয়ে আসা হয় এবং উচ্চ আদালত এসব ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মতামত দিয়ে থাকে। সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রটি খুবই ছোট বা সংক্ষিপ্ত। সংবিধানের কোনো কোনো অংশকে অধিকতর স্পষ্ট বা অধিকতর কার্যকর করার একটি পদ্ধতি হলো সংশোধন এবং এই ধরনের সংশোধন বরাবরই আদালতের বিচারের আওতাভুক্ত।

কিন্তু সংস্কার তা নয়। 'সংবিধান সংস্কার' একটি রাজনৈতিক পরিভাষা, এর সীমা আদালত দ্বারা নির্ধারিত নয়; রাজনৈতিকভাবে, জনগণ দ্বারা নির্ধারিত। জনগণই ঠিক করবে তারা সংবিধানের কোন অংশ, কী দিয়ে পরিবর্তিত করবে। এই পরিবর্তন করার জন্য তারা 'সংবিধান (সংস্কার) সভা'র সদস্য নির্বাচিত করবে এবং নির্বাচিত সদস্যরা জনগণের অনুমোদন নিয়ে তা পরিবর্তন করবে এবং জনগণের সামনে আবার গণভোট আকারে উত্থাপন করবে। জনগণ পরিবর্তিত বা সংস্কারকৃত সংবিধানকে গণভোটে অনুমোদন করার পর এটি চূড়ান্ত হবে। চূড়ান্ত হওয়ার পর, পরিবর্তিত সংবিধানই হবে আদালতের বিচারের ভিত্তি, ফলে এই বিষয়ে আদালতে যেয়ে আদালতের মাধ্যমে এইসব সংস্কারকে বাতিল করার কোনো সুযোগ থাকবে না।

রাষ্ট্র সংস্কার করতে হলে যে কারণে সংবিধান সংস্কার করতেই হবে

রাষ্ট্র সংস্কার করতে হলে প্রথমে সংবিধান সংস্কার করতে হবে। সংবিধান যেসব আইনকে অনুমোদন দিয়েছে, সংবিধানকে সংস্কার না করে আইনগুলোকে সংস্কার করা হলে, এ ক্ষেত্রেও আদালতের হস্তক্ষেপের সুযোগ থেকে যাবে। তাই রাষ্ট্র পরিচালনার আইনসমূহ, যেগুলোর অধিকাংশই সাংবিধানিক অধিকার-অনধিকারের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত, সেগুলোর পরিবর্তন করার আগে সংবিধান সংস্কার করে নিতে হবে। বর্তমান সংবিধানের শুধুমাত্র দুই-একটি বিষয়কে সংশোধন বা সংস্কার করে এই সংবিধান এবং রাষ্ট্রকে স্বাধীনতার অঙ্গীকারের রাষ্ট্রে পরিণত করা যাবে না। ন্যূনতম মানবিক ও গণতান্ত্রিক একটি রাষ্ট্র হিসেবে পুনর্যাত্রা করতে হলেও সংবিধানের ক্ষমতা কাঠামো অংশের ব্যাপক সংস্কার করতে হবে।

বাংলাদেশের বর্তমান সংকট এমন একটি পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে যদি সামান্য একটা নিরপেক্ষ নির্বাচনও করতে হয়, তাহলেও সংবিধান সংস্কার করা লাগবে। সংস্কার না করে 'ত্রয়োদশ সংশোধনী'র মতো একটি সংশোধনীর মাধ্যমে যদি তা আবার ফেরত আনা হয়, তাহলে প্রতিবার নির্বাচনের আগেই দেশে বর্তমান সংকটের চাইতেও আরও গভীর গভীরতর সংকট তৈরি হতে থাকবে। বর্তমান বাস্তবতায় সংবিধানের সংস্কার এখানে এখন আর কারও ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিষয় নয়, এটা হলো সব চেয়ে কম ক্ষয়ক্ষতিতে সংকট থেকে বের হওয়ার একমাত্র রাস্তা।

বাংলাদেশ যে পরিবর্তনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, যারা জনগণের রাজনীতি করেন, যারা জনগণের পক্ষের রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চান, তাদের প্রত্যেকের উচিত সম্ভাব্য সেই পরিবর্তনকে অনিবার্য করে তোলা। পরিবর্তনকে জনগণের পক্ষে নিতে চায় এমন শক্তির উপস্থিতি এবং শক্তিবৃদ্ধি করা এবং এই আন্দোলনে নিজেদের অবস্থানকে এমন শক্তিশালী করা যাতে আপোসকামী এবং সুবিধাবাদীরা জনগণের ত্যাগ-তিতিক্ষাকে নিজেদের স্বার্থে মাঝপথে আটকে দিতে না পারে, বিপথে না নিয়ে যেতে পারে । মনে রাখতে হবে অন্যথায় ৪৬ সালের মতো, ৭১ সালের মতো, ৯০ সালের মতো আবারও আপনার বন্ধুর রক্তে রঞ্জিত নিশানটা হাতছাড়া হয়ে যাবে। ইতিহাস বাংলাদেশকে এমন জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছে, রাষ্ট্রের ক্ষমতা কাঠামোর পরিবর্তন ছাড়া আর গত্যন্তর নাই।

এইসব পরিবর্তনের কর্মসূচি কেন বিপ্লব বা সংশোধনের কর্মসূচি নয়? কেন সংস্কার?

একটা রাষ্ট্র বা সমাজ কোন অবস্থায় আছে, তার অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতাগুলি কী বা কেমন, সেই প্রতিবন্ধকতা দূর করার সবচেয়ে সহজ পথ কী হতে পারে, সে বিষয়গুলোর ওপর নির্ভর করে পরিবর্তনকামীদের কর্মসূচি ও কর্ম-পরিকল্পনা। মূলত কর্মসূচি এবং কর্মপরিকল্পনাই নির্ধারণ করে পরিবর্তনের পথ-পদ্ধতি। সংশোধন, সংস্কার বা বিপ্লব কোনো উদ্দেশ্যর নাম নয়, উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পদ্ধতির নাম।

যে ব্যবস্থাটি চালু আছে তা যদি সর্বাংশে সঠিক হয় এবং তাকে আর একটু কার্যকর করলে যদি তা আরও ভালো ফলাফল দেবে বলে মনে হয় তাহলে ব্যবস্থাটি সংশোধন করলেই চলে। আমাদের দেশে যারা মূলধারার লোক তারা সবসময়ই কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংশোধনের কথা বলে থকে।

যে ব্যবস্থাটি চালু আছে, তার কোনো কোনো অংশ যদি পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে সেক্ষেত্রে যে যে ক্ষেত্রে যে ধরনের পরিবর্তন করা দরকার, তা করাকে সংস্কার বলে। আর যে ব্যবস্থাটি চালু আছে, তার খোল-নলচে সবই যদি পরিবর্তন করতে হয়, সংস্কার দিয়ে যদি আর কাজ চালানোর মতো অবস্থা না থকে তবে সবকিছু আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। এ রকম পরিবর্তনকে বিপ্লবী পরিবর্তন বলা হয়। বিপ্লব সাধারণভাবে একটা ব্যবস্থার এমন মৌলিক পরিবর্তনকে বোঝায়, যার সাথে ব্যাপক বলপ্রয়োগের ধারণাও যুক্ত।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় আশার ব্যাপার হলো এখানে জনগণের একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানাদির প্রায় সবই আছে, যেমন এখানে সর্বজনীন ভোটাধিকার আছে, নির্বাচন আছে, নির্বাচন কমিশন আছে। কিন্তু এদের সবই ১২৩(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছার কাছে বন্দী। প্রধানমন্ত্রীর এই ইচ্ছাতন্ত্রটা বাতিল করার জন্য ৪৮(৩)/ ১২৩(৩)/ রুলস অব বিজনেস এবং ক্ষমতা কাঠামোটি সংস্কার করতে হবে। একইভাবে এখানে আইনবিভাগ বা সংসদ আছে। শুধুমাত্র সংসদের অনুমোদনেই আইন প্রণয়ন হওয়ার কথা কিন্তু এখানকার সংসদটি ৭০ অনুচ্ছেদের কারণে প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছাতন্ত্রে বন্দী হয়ে আছে।

একইভাবে এখানে 'স্বাধীন' বিচার বিভাগ আছে, প্রশাসন আছে, অর্থবিভাগ আাছে, স্থানীয় সরকার আছে, কেন্দ্রীয় সরকার আছে কিন্তু এর সবই বিভিন্ন কৌশলে, বিভিন্ন অনুচ্ছেদে, আইনের বিভিন মারপ্যাঁচে একজন ব্যক্তির ইচ্ছার কাছে বন্দী হয়ে আছে। তিনি কারও কাছে জবাবদিহিতে বাধ্য নন কিন্তু সবাই তার কাছে জবাব দিতে বাধ্য। এই অবস্থাটি পরিবর্তন করতে হলে জনগণকে আগে এই অবস্থা কীভাবে কাজ করছে তা বলতে হবে। সংবিধান ও রাষ্ট্র পরিচালনার আইন কানুন পাল্টে দিলেই যে এ অবস্থা থেকে সহজেই বেরিয়ে আসা সম্ভব এবং এটা অতি সহজেই সম্ভব তা-ও বলতে হবে।

এটা কোনো সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন না। আমরা মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান কিংবা ব্যক্তিগত মালিকানা নীতির পরিবর্তন করতে চাইছি না। আমরা শুধু স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়-বিচার'-এর যে রাষ্ট্রটি গড়ে তোলার অঙ্গীকার করা হয়েছিল এবং ৭২-এর সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার যে সব 'মূলনীতি' গ্রহণ করা হয়েছিল, সেইসব মূলনীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রকে পরিচালনা করতে হলে, সংবিধানের ক্ষমতা কাঠামো অংশের যতটুকু পরিবর্তন করে মূলনীতির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ করা দরকার ততটুকুই পরিবর্তন করতে চাইছি। এটা যে আমাদের অধিকার, সে অধিকারের স্বীকৃতি আমরা আদায় করেছি ব্যাপক রক্তপাত, জীবন দান এবং জনযুদ্ধে জয়ের মাধ্যমেই। এই স্বীকৃতির জন্য আমাদের নতুন করে রক্তপাত কিংবা জনযুদ্ধ করার কোনো প্রয়োজন নাই। বর্তমানে আমাদের স্বীকৃত অধিকার বাস্তবায়নের পথে যে সব বাধা আছে আমরা শুধু সেইসব বাধাগুলো অপসারণ এবং স্বীকৃত অধিকার বাস্তবায়নের লড়াই করছি। এটি পুরনো যা কিছু আছে তার চুনকাম বা সংশোধনমাত্র নয় আবার নতুন কোনো ভিত্তি নির্মাণও নয়। তাই এটা সংস্কার। এটা সংশোধন নয়, সংশোধনের চেয়ে অনেক বেশি কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের বিপ্লবের চেয়ে অনেক ভিন্নরকম। আসলে বর্তমান বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কারই অর্জনযোগ্য ও বাস্তবোচিত বিপ্লবী কর্মসূচি।

এ রাষ্ট্রের সবকিছুই চলছে ব্যাপক অধিকাংশ মানুষের স্বার্থরক্ষার কথা বলে। সবকিছু পরিচালিত হচ্ছে মানুষের টাকায়। এখানকার কমবেশি সবাই একমত যে, সবকিছু মানুষের উপকারের নামে করা হলেও এগুলো বাস্তবে মানুষের কল্যাণে আসছে না। সবাই এ বিষয়েও একমত যে, এই ব্যবস্থাকে

এমনভাবে পুনর্বিন্যস্ত করা দরকার যাতে এগুলিকে মানুষের পক্ষে আনা যায়। এখানে কয়েকশত পাচারকারী এবং তাদের উচ্ছিষ্টভোগী কিছু দালাল, প্রকৃতি ও পরিবেশ বিধ্বংসী, অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়ার উপযোগী কথিত কিছু উন্নয়ন বাজারজাতকারী দেশি-বিদেশি মাফিয়া, সম্মিলিতভাবে যারা কয়েক হাজারের বেশি নয়, তাদের বাইরে আর কেউ এই কর্মসূচিকে বাধা দেওয়ার অবস্থাতে নাই। এখানে প্রতিপক্ষ অসম্ভব দুর্বল এবং নৈতিকভাবে পরাজিত হয়েই আছে।

কেমন করে করা যাবে রাষ্ট্রের সংস্কার?

সংবিধান বা রাষ্ট্র পরিচালনার আইন-কানুনের সংস্কারের প্রয়োজন মেনে নিলেই বা সবাই মিলে এ সংস্কার দাবি করলেই কি রাষ্ট্রের সংস্কার হয়ে যাবে? রাষ্ট্র সংস্কারের পথ কী? কোন উপায়ে এইসব পরিবর্তন করা সম্ভব? এই ধরনের প্রশ্ন আজকাল অনেকেই করেন।

প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো রাষ্ট্র সংস্কারের প্রথম কাজ হলো সংবিধান সংস্কার। সংবিধান সংস্কারের সবচেয়ে সহজ পথ হলো সংবিধান সংস্কারের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করা। সাধারণভাবে সংবিধান প্রণয়নের জন্য যে নির্বাচন করা হয় সে নির্বাচনকে বলা সংবিধান সভা বা গণপরিষদ বা কনষ্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি নির্বাচন। আমরা যেহেতু নতুন করে সংবিধান প্রণয়ন করছি না যেহেতু সংবিধান সংস্কারের কাজ করছি, তাই যে নির্বাচন করতে হবে সেটাকে বলছি সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন।

এরকম নির্বাচন আমরা নিজেরা প্রথম আবিস্কার করেছি, বিষয়টি তেমন না। অতীতে আমাদের মানুষেরা আরও দুই বার এই ধরনের নির্বাচন করেছে। একবার ১৯৪৬ সালে, পাকিস্তান বানানোর প্রাক্কালে; আর একবার ১৯৭০ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে। ১৯৪৬-এর নির্বাচনের আগে ভারতবর্ষ শাসিত হতো ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী, আর ৭০-এর নির্বাচনের আগে পাকিস্তান শাসিত হতো আইয়ুব খানের ১৯৬২ সালের সংবিধান অনুযায়ী। এই ২টি নির্বাচনের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ২ ধরনের দায়িত্ব ছিল। একদিকে তারা ছিলেন কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি বা গণপরিষদ সদস্য, অপরদিকে তাদের হাতেই ছিল সরকার গঠনেরও দায়িত্ব।

আমরা ওপরে যে আলোচনা করেছি, সেখানে আমরা দেখতে পেয়েছি যে,

বিদ্যমান সংবিধানের অধীনে গত ৫০ বছরের দেশ পরিচালনার অভিজ্ঞতা আমাদের এমন কিছু শিক্ষা দিয়েছে-যে আমরা যদি শান্তিপূর্ণ পথে সরকার গঠন বা বদলের জন্য গ্রহণযোগ্য একটা নির্বাচন ব্যবস্থাও গড়ে তুলতে চাই, আমরা যদি একটি কার্যকর আইনসভা বা সংসদ বানাতে চাই, আমরা যদি জাতির সংকটময় মুহূর্তেও একটি ন্যায্য এবং জনস্বার্থবান্ধব রায় দেওয়ার মতো স্বাধীন বিচার বিভাগ পেতে চাই, আমরা যদি জনস্বার্থে কাজ করবে এমন একটি প্রশাসন পেতে চাই, আমরা যদি দেশের সম্পদ অবাধে লুটপাট, অপচয় এবং পাচার না হয়ে দেশে বিনিয়োগ হবে এমন একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা করতে চাই, আমরা যদি স্থানীয় সরকারগুলোকে সত্যিকারের স্থানীয় সরকার বানাতে চাই,আমরা যদি আমাদের ক্ষমতায় ক্ষমতাবান এবং আমাদের টাকায় চলে যে সরকার সেই সরকার আমাদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে এমন আইন নিশ্চিত করতে চাই, তাহলে সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অংশগুলোর পরিবর্তন করতেই সংবিধান সংস্কার করতে হবে ।

আমরা জানি এই পরিবর্তন যদি কনষ্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি বা সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন ছাড়া অন্য কোনোভাবে করা হয়, তাহলে এইসব পরিবর্তন যথাযথ হবে না এবং উচ্চ আদালত জনগণের মতামত না নিয়েই এইসব আবার বাতিল করে দিতে পারবে। সেইজন্যে আমরা ৭০ সালের মতো এমন একটি নির্বাচন চাই যে নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা একদিকে হবে কনষ্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলির সদস্য, পাশাপাশি অন্যদিকে তারা জাতীয় সংসদের সদস্যও হবে। নির্বাচনের পর প্রথমে তারা সংবিধানের নির্ধারিত ক্ষেত্রগুলি সংস্কার করে জনগণের অনুমোদনের জন্য গণভোটে পাঠাবে এবং জনগণ গণভোটে এইসব পরিবর্তনকে অনুমোদন করলে পরে এইসব সংস্কার গৃহীত হবে এবং নির্বাচিত সদস্যরা পরবর্তীতে গৃহীত সংবিধানের আলোকেই দেশ পরিচালনা করবে।

এইরকম একটা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাওয়া ছাড়া বাংলাদেশের সংকট থেকে বের হওয়ার আর বিকল্প কোনো পথ নাই। অন্য যা কিছুই করা হোক না কেন তা সংকটকে সাময়িক ধামাচাপা দিলে দিতেও পারে, কিন্তু অচিরেই তা আরও বড় সংকটের আকারে হাজির হবে। তাই বাংলাদেশকে যদি রক্ষা করতে হয়, এখানকার প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশ, ন্যূনতম মানবিক গুণাবলী, স্বাভাবিক জীবনপ্রবাহ, কর্মসংস্থান এবং বিশ্বের অপরাপর দেশের সাথে তাল

মিলিয়ে এগিয়ে চলার জন্য যদি রাষ্ট্রকে প্রস্তুত করতে হয়, তাহলে রাষ্ট্রের ক্ষমতাকাঠামো সংস্কার তথা রাষ্ট্র সংস্কারের রাজনীতিকে এগিয়ে নিতে হবে। বাংলাদেশ সেই পথেই হাঁটছে।

হাসান আজিজুল হকের কথাসাহিত্যের কয়েকটি নন্দনসূত্র: সাংস্কৃতিক ও জাতীয়তাবাদী পটভূমি

মোহাম্মদ আজম

মূলত ছোটগল্পের নিপুণ শিল্পী হিসেবেই হাসান আজিজুল হকের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি। তিনি প্রবন্ধ ও সমালোচনা লিখেছেন; ছোট-বড় উপন্যাসও লিখেছেন। *বৃত্তায়ন* নামের নভেলা লিখেছিলেন তরুণ বয়সেই। ওই রচনা নভেলা বা বড় গল্প হিসেবে পাঠকের সমর্থন পেলেও তিনি নিজে লেখাটিকে কবুল করতে চাইতেন না। *আগুনপাখি* ও *সাবিত্রী উপাখ্যান* নামের দুটি উপন্যাস লিখেছেন লেখকজীবনের প্রায় শেষ দিকে। উপন্যাস দুটি – বিশেষত *আগুনপাখি* – আলোচিত এবং পুরস্কৃত হলেও, কথাসাহিত্যিক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ও নৈপুণ্যের গভীরতা স্পর্শ করে নাই বলেই ধারণা করা হয়। বলা যায়, মোপাসাঁ বা চেখভের মতো হাসান আজিজুল হকও ছোটগল্পের তুখোড় রচয়িতা হিসেবেই বাংলা সাহিত্যের মূলধারায় বৃত হয়েছেন।

গল্পকার হিসেবে তাঁর নান্দনিকতার এমন কোনো সূত্র আছে কি না, যা তাঁর ঔপন্যাসিক প্রতিভাকে জুতমতো বিকশিত হতে দেয়নি – এ লেখায় আমরা সে খোঁজখবর খানিকটা নেব। তবে সে সিদ্ধান্ত আমাদের মূল অনুসন্ধানের উপজাত মাত্র। হাসান আজিজুল হকের কথাসাহিত্যিক সত্তায় স্থান, মতাদর্শ ও রাজনৈতিকতার দিকগুলো কীভাবে গোপন বা প্রকাশ্যে ক্রিয়া করেছে, আর তাঁর শৈল্পিক-নান্দনিক অর্জনে সেগুলোর অন্তরঙ্গ কোনো যোগ আছে কি না, আমরা প্রধানত সেদিকেই নজর দেব।

এ কথা কারও অজানা নয়, হাসান আজিজুল হকের কথাসাহিত্যের প্রধান স্থানিক পটভূমি রাঢ়বঙ্গ। তিনি সেখানে জন্মেছিলেন এবং জীবনের প্রথম

দিককার বেশ কিছু অংশ সেখানে কাটিয়েছিলেন। লেখালেখির সময়টাতে পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশ অঞ্চলে থাকলেও, এবং বাংলাদেশের লেখক হিসেবে কীর্তিত হলেও, স্থানিক বাস্তবতার বিচারে তিনি রাঢ়বঙ্গ থেকে খুব বেশি স্থানান্তরিত হননি। অন্যদিকে সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক বিচারে তিনি প্রায় আগাগোড়া 'বাঙালি জাতীয়তাবাদী' অনুমান ও চর্চাগুলো তাঁর লেখালেখিতে উপস্থাপন করে গেছেন। আমরা বুঝতে চাইব, তাঁর জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ ও রাঢ়বঙ্গ-নির্ভরতার মধ্যে কোনো আবশ্যিক যোগাযোগ আছে কি না। তার চাইতে বড় কথা, এ ধরনের সম্ভাব্য যোগাযোগ তাঁর সাহিত্যকর্মের নন্দনসূত্রে কোনো প্রভাব রেখেছে কি না, অথবা মতাদর্শিক-নন্দনতাত্ত্বিক ঠিক কোন বৈশিষ্ট্যের গুণে তিনি রাঢ়বঙ্গের গল্পকে সর্ববঙ্গীয় কিংবা বাংলাদেশীয় গল্প হিসেবে গ্রাহ্য করাতে পেরেছেন, বর্তমান লেখায় আমরা তারই খোঁজখবর নেব।

১

প্রথম থেকেই হাসান গল্পের বিষয় ও পরিচর্যায় উল্লেখ করার মতো সমুন্নতি রক্ষা করে এসেছেন। বিষয়ের দিক থেকে মানুষের সামষ্টিক জীবনের সিদ্ধান্তসূচক বা মূল্যায়নমূলক অভিজ্ঞতাই তাঁর কাছে প্রাধান্য পেয়েছে। ব্যক্তির গল্প তো আছেই; তবে চারপাশের বিশদ পরিচয়লিপির বাইরে ব্যক্তি যেভাবে অস্তিত্ববান থাকতে পারে, আর নিছক ব্যক্তিগত অনুভূতি আর মুহূর্তকে গল্পে রূপায়িত করার যেসব ঘটনা আমরা দুনিয়াজুড়ে ছোটগল্পের ময়দানে দেখতে পাই, হাসান আজিজুল হকের প্রবণতা স্পষ্টতই তার বিরোধী। তিনি ব্যক্তিকেও আঁকেন সমগ্র পরিপ্রেক্ষিতের অংশ করে; স্থানিক বাস্তবতার বিশদ পটভূমিতে স্থাপন করে; আর তার মধ্যেই তৈরি করেন ছোটগল্পের শীর্ষবিন্দু বা মুহূর্ত। এ কারণেই তাঁর গল্পের পরিচর্যায় বিবরণীর প্রাধান্য থাকে, তবে সে বিবরণী প্রায়ই বিচার-বিশ্লেষণের বিশিষ্টতা লাভ করে। বিচার-বিশ্লেষণটা দরকার হয়; কারণ, বড় পটভূমিকে গল্পের কাঙ্ক্ষিত মাত্রার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ রাখতে, ছড়িয়ে গিয়ে লক্ষ্যচ্যুত হওয়া থেকে বিরত রাখতে, তাঁকে নির্মমভাবে মনোযোগী থাকতে হয়। এ কারণেই নিছক ঘটনার বর্ণনা তাঁর গল্পের খুব সামান্য অংশই তৈয়ার করে। লেখকের দিক থেকে ঘটনার স্বাধীন গতির সুবিধা আর পাঠকের দিক থেকে ঘটনার প্রবাহে চলার আরাম – দুটিই তাঁর লেখায় তুলনামূলক অনেক কম। এ বৈশিষ্ট্যের এক ফল এই যে, হাসান আজিজুল হকের গল্পের প্রতিটি অংশ ও সমগ্র সমান যত্নে

প্রস্তুত। গড়নের দিক থেকে গল্পগুলো – বলা যায় – ক্লাসিকধর্মী, সংহত ও মজবুত। এদিক থেকে সুবোধ ঘোষের সাথে তাঁর বেশ কতকটা মিল আছে।

বাংলাদেশের পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের বেশ কয়েকজন গল্পকারের রচনায় এক বিশেষ প্রবণতা বিকশিত হয়েছিল। হাসান আজিজুল হকের মতো আখতারুজ্জামান ইলিয়াস আর শওকত আলীর অনেক গল্পেও এ বৈশিষ্ট্যের দেখা মেলে। নমুনা হিসেবে তিনজনের তিনটি গল্পের নাম উল্লেখ করছি: হাসানের 'পাতালে হাসপাতালে', ইলিয়াসের 'দুধভাতে উৎপাত', আর শওকত আলীর 'কপিলদাস মুর্মুর শেষ কাজ'। খুব বিস্তৃত পরিসরে জীবনের প্রায় সামগ্রিক কথকতা – একটা মাত্রায় উপন্যাসের খণ্ডাংশেই কেবল যার দেখা পাওয়ার কথা – উপস্থাপিত হয়েছে এসব গল্পে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিবরণীর গভীর ভিতর থেকে একটা উপাদানকে নিপুণভাবে বের করে এনে এমনভাবে সমাপ্তি-বাক্য রচনা করা হয়েছে, যেখানে ছোটগাল্পিক মুহূর্তের ব্যঞ্জনা বা ইশারাধর্মিতার বিশেষ ঘাটতি হয় নাই। তদুপরি, অন্তিম মুহূর্ত বা অংশটি চাবির মতো পুরো গল্পটিকে নিজের অধীনে পুনরায় পড়তেও বাধ্য করে। অবশ্য যে তিনটি গল্পের উল্লেখ এখানে করা হলো, তার সবকটিই এক ধরনের অসহনীয় অবস্থার মধ্যে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সম্ভাবনা ও বাস্তবতা নিয়ে কাজ করেছে। খানিকটা শিথিল অর্থে মার্কসবাদী ভাবাবহের মধ্যেই ঘটনাটা ঘটেছে। হাসান আজিজুল হকের ক্ষেত্রে বলা যায়, এই ভাবাবহ আর নির্মাণকলা তাঁর অনেকগুলো গল্পে পাওয়া যাবে।

উপরে যে দুটি ধরনের কথা বলা হলো – বিচার-বিশ্লেষণধর্মিতা আর বড় পটভূমি থেকে গল্পের ইঙ্গিতধর্মী পরিণতিতে পৌঁছানো – সে দু-ক্ষেত্রেই খুব জরুরি শিল্পরীতি হবে অনুপুঙ্খ বিবরণ ও বিশ্লেষণ বা ডিটেইলের কাজ। হাসান আজিজুল হকের গল্প বিশদ আর অনুপুঙ্খ বর্ণনায় নির্মিত। সে বর্ণনা আবার চিত্রময় ও মূর্তিধর্মী। 'মন তার শঙ্খিনী' গল্পে লেখক হামিদার ভালোবাসার ছবি এঁকেছেন এভাবে: 'ঐ যে ওর ভালোবাসাটা ওর চোখে আশ্রয় করে – যেন চোখে দেখা যায়।' 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' গল্পে ইনামের ভাবনা সম্পর্কে মন্তব্য: 'ঝরঝর করে ছবিগুলো এল; যেন দক্ষিণ বাতাসে নিমের হলুদ শুকনো পাতা ঝরে পড়ছে, আর ছবিগুলো চলে গেল যেন ট্রেনটা যাচ্ছে পুল পেরিয়ে, মাঠের বুক চিরে...।'

হাসান প্রবলভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ছবি তৈয়ার করে-করে অগ্রসর হন।

ইন্দ্রিয়গুলো যথাসম্ভব জাগ্রত রেখে, পটভূমির ভেতর দিয়ে, বর্ণনার সহযাত্রী হয়ে, রওয়ানা হয়ে যেতে পাঠককে বাধ্য করেন। এ অভিযাত্রায় হাসান যুগপৎ নির্মম ও নিরাসক্ত। তিনি আবেগের কারবার করেন না এমন নয়। গরিব মানুষের প্রতি সহানুভূতি দেখানো এবং সহানুভূতির বোধ জাগানো তাঁর লেখার খুব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ফলে আবেগের কায়কারবার তিনি করেন বৈকি। কিন্তু তাঁর আবেগ হিসাব-নিকাশে গড়া। তদুপরি আবেগের ক্ষেত্রগুলোও সমাজে বিদ্যমান উৎস থেকে আহরিত নয়; বরং নিজের আকাঙ্ক্ষার সমর্থনে যুক্তির বিন্যাসে গড়া। *কথাসাহিত্যের কথকতা* বইয়ের অন্তর্গত 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বিষবৃক্ষ' প্রবন্ধে তিনি ইলিয়াসের গল্পে আবেগের অনুপস্থিতি ও নির্মমতার আধিক্যের কথা বলেছিলেন। এ দুই সূত্র আসলে তাঁর নিজের গল্পের ক্ষেত্রেও হুবুহু প্রযোজ্য।

অবশ্য বাস্তবের বিশদ বিবরণে ঋদ্ধ হলেও হাসান আজিজুল হকের গল্প রূপক বা প্রতীকে বিমুখ নয়। শুরুর দিকেই তিনি লিখেছিলেন 'শকুন'-এর মতো প্রতীকী গল্প। 'নামহীন গোত্রহীন' গল্পে মুক্তিযুদ্ধের বাস্তব আর ধ্বংসলীলাকে আঁটাতে চেয়েছেন প্রলম্বিত রূপকে। 'জীবন ঘষে আগুন' গল্পের বড় পরিসরে রচনা করেছেন অনেকগুলো রূপকী-প্রতীকী গল্পাংশ। দেশভাগের গল্পগুলোতেও আলঙ্কারিকতা তাঁর অন্যতম অবলম্বন। 'খাঁচা' নিজেই রূপক। তাছাড়া এ গল্পগুলোতে বারবার এসেছে সাপ, অশ্বত্থগাছ, করবী গাছ ইত্যাদি প্রতীকী-রূপকী পরিচর্যা।

তবে বলতেই হবে, ভাষায় কাব্যিকতার প্রবলতা থাকলেও এবং সে কাব্যিকতার অংশ হিসেবে আলঙ্কারিকতার প্রাধান্য থাকলেও, হাসানের গল্পের মূল পাটাতন বাস্তববাদী ছাঁচেই নির্মিত। ধ্রুপদি বাস্তববাদ নয়; কারণ, তাঁর বাস্তব নিজের নৈতিক-রাজনৈতিক দিকগুলোকে এমনভাবে নিজের আওতাভুক্ত করে, আর তা করতে গিয়ে এমনভাবে পাল্টে ফেলে যে, অন্তত প্রথম দেখায় তাকে বাস্তব বলে চেনাই যায় না। কিন্তু এক স্তর গভীরে গেলেই বোঝা যায়, কঠোর ও নির্মম বাস্তবের অনেকগুলো মাত্রা তিনি প্রায় ধার্মিকের মতোই রক্ষা করেন। উদাহরণ হিসেবে তাঁর অন্য ধরনের গল্প 'মন তার শঙ্খিনী'র কথা বলা যেতে পারে। 'মন তার শঙ্খিনী' হাসানের গল্পধারায় খুবই বিরল ধরনের রচনা। এমন 'ব্যক্তিগত' আবেগ-অনুভূতির গল্প তিনি খুবই কম লিখেছেন। বিষয় হিসেবে 'প্রেম' – অন্তত মানব-মানবীর প্রেম –

তাঁর রচনায় খুব একটা দেখা যায় না। কিন্তু এরকম ভিন্ন ধারার রচনায়ও তিনি গল্পের যাবতীয় উপকরণ এবং তাদের সজ্জা রচনা করেন বাস্তবতার গভীর সব ব্যাকরণ মেনে।

প্রথমেই চোখে পড়বে, স্থানিক বাস্তবতা ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার অতি বিশেষ রূপের মধ্যেই এ প্রেম-সম্পর্কের উন্মেষ ও বিকাশ। সংলাপের অতি-আঞ্চলিক রূপ – তাঁর অন্য অধিকাংশ গল্পের মতো – এ গল্পেও 'বাস্তবে'র গভীর আবহ তৈয়ার করে। তদুপরি, উৎপাদন ও বণ্টনের বাস্তবতা এবং পেশাগত সত্যকে চূড়ান্ত প্রাধান্য দিয়েই তিনি মন ও শরীরের তাবত ভাষারূপ উন্মোচন করেছেন। জরুরি বিবেচনা হলো, এ রসায়নে লেখকসত্তার অবস্থান বা বয়ানকারীর অবস্থান কোথায়? লেখক হিসেবে তিনি সর্বত্র বিচরণ করার সুবিধা নিয়েছেন বৈকি; কিন্তু বয়ানকারীকে চরিত্রের মনে বা অন্দরমহলে খুব একটা ঢুকতে দেন নাই। আচরণে, প্রকাশিত কর্মকাণ্ডে আর উচ্চারিত-অনুচ্চারিত সংলাপেই তিনি বয়ানের জন্য জরুরি প্রসঙ্গগুলোর জোগান পেয়েছেন। চরিত্রের পক্ষ থেকে তার বা তাদের মনের কথা বর্ণনা করেন নাই। শুধু তাই নয়। বয়ানকারীর সাথে চরিত্রগুলোর যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ফারাক আছে, সেকথাও বিস্মৃত হন নাই। দুটি অংশ উদ্ধৃত করি:

> ওদের গ্রাম্য নীতিবোধে শাদু ভাবে, কাজটো বড়্ডা খারাপ হচে, উ সোয়ামীর কাচেও যেচে না, আমার ঘরেও আসছে না, অথচ আমাকে ফি রেতেই পেরায় ভালোবাসচে। ই সাংঘাতিক বেপার। ...
>
> আবার ওদের অদ্ভুত গ্রাম্য নীতিবোধে নড়েচড়ে হামিদা বলে, ছি, উ কথা বলিস না। সোয়ামী সব সোমায়েই সোয়ামী।

দেখা যাচ্ছে, লেখক 'অন্যে'র গল্পই বলছেন। 'গ্রাম্য', 'অদ্ভুত' ইত্যাদি শব্দে নিজের বা সম্ভাব্য পাঠকের সাথে ওই 'অন্যে'র জল-অচল ফারাকও তৈয়ার করেছেন। আমাদের জন্য জরুরি তথ্য হলো, চরিত্রগুলোর ব্যক্তিগত অনুভব-অনুভূতি প্রকাশের এরকম মোক্ষম সুযোগেও লেখক নির্ভর করেছেন তাদের কথার উপর – নির্ভর করেছেন তাদের প্রকাশিত বাস্তবের উপর। লেখকের সর্বজ্ঞ সত্তার সুযোগে মনের অন্দরে প্রবেশ করেননি, বা তাদের হয়ে কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও উপস্থাপন করেননি।

হাসান আজিজুল হকের গল্পের এই গভীর বিশিষ্টতায় আমরা পরে আবার ফিরব। তার আগে বলা যাক, হাসান মূলত গরিব মানুষের গল্প লিখেছেন;

আর সে কাহিনিও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষ কতগুলো ফ্রেমে বাঁধা। শেষের কথাটা গভীর অর্থে হয়ত যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ লেখকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য গল্পের প্রথম তল থেকেই।

গরিব মানুষের গল্প লেখার চল বাংলা সাহিত্যে শুরু করেছিলেন কল্লোলীয় লেখকেরা। মানুষকে পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে স্থাপন করে তার তুচ্ছতা ও প্রবৃত্তিচালিত নিয়তির দিকটা পরীক্ষা করা ছিল সে যুগের লেখকদের প্রধান স্বভাব। স্বভাবটা মুখ্যত প্রকৃতিবাদী বা স্বভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এসেছে। হাসান আজিজুল হক এ দৃষ্টিভঙ্গির কতকটা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন। কিন্তু কল্লোলীয় প্রকৃতিবাদীদের সাথে হাসানের পার্থক্যও খুব বড়। তাঁর গরিব মানুষেরা মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিরও ভাগ পেয়েছে বেশ কতকটা। সে কারণেই প্রবৃত্তি ওই চরিত্রগুলোর প্রধান নিয়ামক হয়ে তাদেরকে নিয়তির পুতুল হয়ে উঠতে দেয় নাই। বিদ্রোহ খুব একটা না করলেও প্রতিবাদী পটভূমি হাসানের গল্পে প্রায়ই তৈরি হয়েছে। তদুপরি, যৌনতা হাসানের গল্পে প্রায় কখনোই প্রধান হয়ে ওঠে নাই। এ ধরনের নিরীক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিনিধিস্থানীয় গল্প 'তৃষ্ণা'য় দেখি, ক্ষুধার প্রবল-বিকট নিবৃত্তির পরই কেবল এসেছে যৌনতার প্রসঙ্গ। কিন্তু শুধু এ বৈশিষ্ট্যগুলোর জন্যই হাসানের দৃষ্টিভঙ্গি বা নান্দনিকতাকে মার্কসবাদী বর্গের আওতায় ব্যাখ্যা করতে চাওয়ার বিপদ আছে। কারণ উপরে বলা সবগুলো বৈশিষ্ট্যের সাথে মিশেছে আধুনিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির এক বিশেষ হাসানীয় ধরন, যা এক ধরনের প্রত্যক্ষবাদী বা পজিটিভিস্ট মনের ছত্রছায়ায় রূপায়িত হয়েছে।

হাসান আজিজুল হকদের কালে 'আধুনিকতা' ছিল ঢাকাকেন্দ্রিক সাহিত্যিকদের অনিবার্য নিয়তির মতো। বাস্তববাদী-প্রকৃতিবাদী-মার্কসবাদী হাসানের গল্পে এ আধুনিকতার আবহ বিকশিত হয়েছিল একটা ভিন্ন রূপ ও মাত্রা নিয়ে – খানিকটা দ্রোহী চেতনা ও নাস্তির বেশে। বিদ্যমান সমাজের বৃহৎ কাঠামোকে গুঁড়িয়ে দেয়ার একটা আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যয় তাঁর উচ্চারণে প্রায়ই মূর্ত রূপ নিয়েছে। চারপাশের বস্তু-পৃথিবী থেকে শুরু করে প্রকৃতি ও সংস্কৃতির উপাদানগুলোও তা থেকে রেহাই পায়নি। মনে হয়, প্রচণ্ড ক্ষোভের ঝাঁজ সইতে না পেরে দৃষ্টিগোচর উপাদানগুলো কোথাও বাঁকা কোথাও বিকৃত রূপ পরিগ্রহ করেছে। এখানে আরেকবার কল্লোলীয় কথাসাহিত্যের কথা স্মরণ করতে হয়। কল্লোলীয়দের মতোই হাসানও গরিব মানুষকে ন্যাংটো

করেই আঁকেন। কিন্তু সাধারণভাবে তাঁর লক্ষ্য ভিন্ন। গরিব মানুষকে নগ্ন করে তিনি তাকে বা তাদেরকে দেখতে চান না – যে বৃহৎ কাঠামোর নানা অন্যায্যতার খাঁই মেটাতে গিয়ে এরা জেরবার, তাঁর লক্ষ্য ওই কাঠামোকে পষ্ট করে দেখা। সে কারণেই মমত্বটা শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে। তিনি ক্রমাগত হাজির করতে থাকেন অচিহ্নিত বা চিহ্নিত শত্রুপক্ষকে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে। একটা জোরালো পক্ষপাত হাসান তাঁর গল্পে শেষ পর্যন্ত ফুটিয়ে রাখেন। তাঁর দৃষ্টির নাস্তি বা উচ্চারণের নির্মম নিরাসক্তি সত্ত্বেও তাতে টান পড়ে না।

২

উপরে হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পের যেসব নন্দনসূত্র আমরা উপস্থাপন করলাম, তার সাথে এবার যোগ করা যাক রাঢ়বঙ্গ। রাঢ়বঙ্গ হাসানের গল্পের এক দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রত্যক্ষ বাস্তবতা। ওই বঙ্গের ধূসরতা, বৃষ্টিহীন ঊষর ভূমি, কাঁটাগাছ ও ঝোপের বিস্তার, মাটি ও জীবনের সামগ্রিক রুক্ষতা হাসানের আধুনিকতাবাদী নাস্তির সাথে যেন একাকার হয়ে যায়; অথবা বলা যায়, হাসান ওই ভূ-বাস্তবতার মধ্যেই খুঁজে নেন তাঁর নির্মম ও নিরাসক্ত জীবনদৃষ্টির সমান্তরাল উপাদানগুলো। এ তো গেল উপাদানগত ব্যাপার, আর সেগুলো গল্পের ইমেজে উপস্থাপনার ন্যায্যতা। কিন্তু সামগ্রিক জীবনদৃষ্টি ও বাস্তবতার বিচারে তাঁর লেখালেখিতে রাঢ়বঙ্গের উপস্থিতি এর চেয়েও বেশি কিছু। বাংলাদেশের জীবনযাপনের বাস্তবতার সাথে রাঢ়বঙ্গের খুব গুরুতর পার্থক্য আছে। তাছাড়া রাষ্ট্র এক প্রচণ্ড বাস্তবতা। রাষ্ট্রগত বিধিবিধান ও বাস্তবতার প্রচণ্ড ভিন্নতা-যে হাসানের রাঢ়বঙ্গকে কোনো চ্যালেঞ্জে ফেলে দেয় নাই, তার সবচেয়ে বড় কারণ বোধ হয় এই যে, তিনি অন্তত প্রধানভাবে রাষ্ট্র, রাজনীতি ও এদের নিয়ন্ত্রক ক্ষমতাবান জনগোষ্ঠী নিয়ে কাজ করেন নাই। তিনি কাজ করেছেন মুখ্যত নিম্নবর্গের মানুষদের নিয়ে – কতগুলো ইউনিভার্সেল বা সার্বিক বর্গের ভিত্তিতে। যেমন শ্রেণিচেতনা, শোষণ, প্রতিরোধ, নিপীড়ন, যন্ত্রণা ইত্যাদি। এ বর্গগুলো বড় হয়ে ওঠায় রাষ্ট্রগত বাস্তবতার ভিন্নতা তাঁর গল্পে কোনো বড় প্রশ্ন হয়ে হাজির হয় না।

রাঢ়বঙ্গ কি হাসান আজিজুল হকের গল্পে কোনো প্রতীকী চরিত্র অর্জন করেছিল? সৈয়দ শামসুল হকের 'জলেশ্বরী' বাংলাদেশের গ্রাম-বাংলার প্রতিনিধিত্বশীল এলাকা হয়ে যেভাবে অনেকগুলো রচনার ভিত্তি হিসেবে কাজ

করেছে, কিংবা মার্কেজের মাকান্দো যেভাবে হয়ে উঠেছিল লাতিন আমেরিকার প্রতিনিধি-স্থানীয় অঙ্গন, হাসান আজিজুল হকের ব্যাপারটা ঠিক সেরকম নয়। বরং বাস্তববাদী বিবরণীর প্রচণ্ডতায় তাঁর রাঢ়বঙ্গ – নামের উল্লেখ ছাড়াই – কেবল ভূ-প্রাকৃতিক বিশিষ্টতার জোরে রাঢ়বঙ্গ হয়ে ওঠে। কিন্তু ওটা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বাস্তবতার সাথে খুব বড় সংঘাত তৈরি করে না। যেমনটি আগেই বলেছি, গরিব মানুষের জীবন কিংবা শ্রেণিচেতনার মতো বর্গ প্রতাপশালী হয়ে ওঠায় উপস্থাপনাটা একটা সর্ববঙ্গীয় রূপ পরিগ্রহ করে।

হাসান দেশভাগের পটভূমিতে অনেকগুলো গল্প লিখেছেন। এ গল্পগুলোর সাথে মিলিয়ে পড়লে রাঢ়বঙ্গ অবশ্য এক অন্য তাৎপর্যে উন্নীত হয়। 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ', 'খাঁচা', 'সারা দুপুর' ইত্যাদি গল্পের চরিত্রগুলোকে প্রাথমিকভাবে গরিব শ্রেণিতে ফেলা যাবে না। কিন্তু তাদেরকে গল্পে আমরা যে অবস্থায় আবিষ্কার করি, তা গরিবির চেয়ে ভয়াবহ। মধ্যবিত্ত বা নিম্ন-মধ্যবিত্ত চরিত্রগুলো দেশভাগের নানা বিপর্যয়ের শিকার হয়ে দুর্বিষহ জীবন-যাপনে বাধ্য হয়। হাসান দেশভাগের গল্পগুলোতে সাধারণভাবে রাজনৈতিক-ভাবাদর্শিক দিকগুলোকে গল্পের সামগ্রিক আবহের বাইরে রাখতে পেরেছেন, বা রেখেছেন। এ মানুষেরা পরিস্থিতি তৈরি করেনি; কিন্তু ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে পরিস্থিতির শিকার হয়েছে। এ গল্পগুলোতে লেখক কোনো সামগ্রিকতা তৈরি করতে চান নাই। আমরা আগেই বলেছি, হাসানের গল্পে সাধারণভাবে ব্যক্তির তুলনায় সমষ্টি বা শ্রেণি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু দেশভাগের গল্পগুলোতে তিনি ব্যক্তি বা ব্যক্তিদেরকে মুখ্য করেছেন; এবং এভাবে প্রধানত নেতিবাচক অভিজ্ঞতা হিসেবে দেশভাগকে উপস্থাপন করেছেন। এর মধ্য দিয়ে তাঁর পক্ষপাত ও অবস্থান পষ্টভাবে বোঝা যায়। তিনি দেশভাগ অনুমোদন করেন নাই। একটা প্রকাণ্ড বাস্তবতাকে অস্বীকারের মধ্য দিয়ে, যে বাস্তবতার মধ্যে তিনি নিজে এবং আরও অসংখ্য মানুষ সারাজীবন কাটিয়েছেন, তার অস্বীকৃতির মধ্য দিয়ে, তিনি নিজের পরিসরকে সংকীর্ণ করে তোলার ঝুঁকি নিয়েছেন। প্রশ্ন হলো, এটা তাঁর গল্পে কোনো শৈল্পিক-ভাবাদর্শিক সংকট তৈরি করেছে কি না; করে থাকলে তিনি তা কোন কৌশলে অতিক্রম করেছেন; আর দেশভাগ সম্পর্কে তাঁর এ অবস্থানের সাথে গল্পে উপস্থাপিত রাঢ়বঙ্গের কোনো সম্পর্ক আছে কি না?

সাতচল্লিশে ওপার বাংলা থেকে এসে বাংলাদেশে থিতু হয়েছেন, এমন অন্তত তিনজন লেখকের উল্লেখ এখানে করতে চাই, যাঁদের লেখালেখিতে ওই

অভিজ্ঞতার প্রায় প্রত্যক্ষ ছাপ পড়েছে। শওকত ওসমানের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস *জননী* বাস্তববাদী ভঙ্গির রচনা, যেখানে তাঁর পূর্বতন আবাসভূমির গভীর প্রতিফলন আছে। কিন্তু তাঁর পরবর্তী গল্প-উপন্যাসের একটা বড় অংশ রূপকী-প্রতীকী ভঙ্গিতে রচিত, যেগুলোর জন্য প্রত্যক্ষ বাস্তবের অভিজ্ঞতা খুব জরুরি ছিল না। বলা যায়, এভাবে জন্ম ও বেড়ে ওঠার অভিজ্ঞতার তল থেকে বিচ্যুত হওয়ার ক্ষতি শওকত ওসমান বেশ কতকটা পুষিয়ে নিয়েছেন। মাহমুদুল হকের ক্ষেত্রে আমরা অন্য ধরনের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হই। দেশভাগের বাহ্যিক ক্ষয়-ক্ষতির বদলে তিনি মানসিক ক্ষতির শিল্পরূপ তৈরি করেছিলেন *কালো বরফ* উপন্যাসে। নাগরিক গরিবি ও বস্তিজীবনের অভিজ্ঞতা নির্মাণের সাফল্য সত্ত্বেও মাহমুদুল হকের অধিকাংশ রচনায় আমরা বাস্তববাদী অভিজ্ঞতার বয়ানের তুলনায় মনস্তাত্ত্বিক বিকলনের ছবিই বেশি দেখতে পাই। *খেলাঘর* উপন্যাসকে বলতে পারি তাঁর এক প্রতিনিধি-স্থানীয় রচনা, যেখানে বৃহৎ পৃথিবীর বড় ঘটনাপঞ্জির তুলনায় খুব ব্যক্তিগত মনোলোকই তাঁর কাছে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। আবদুল মান্নান সৈয়দ তাঁর অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসে থেকে গেছেন পরোক্ষে। জীবনের শেষদিকে কিছু গল্পে নিজের অব্যবহিত দৈনন্দিনতার ছবি এঁকেছেন মাত্র।

দেখা যাচ্ছে, দেশভাগজনিত অভিজ্ঞতার বিশেষত্ব লেখকদের নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। হাসান আজিজুল হক এ দায় বোধ করেছেন তুলনামূলক কম। তিনি প্রধানত তাঁর শৈশব-কৈশোর ও প্রথম যৌবনের অভিজ্ঞতার মধ্যেই গড়ে তুলেছেন নিজের শিল্পের দুনিয়া। অন্তত তিনভাবে তাঁর পক্ষে এটা করা সম্ভব হয়েছিল। প্রথমত, 'নামহীন গোত্রহীন' গল্পের মতো সম্পূর্ণ রূপক তিনি তৈরি করেছেন কোথাও কোথাও, যেখানে অধিকাংশ কথাসাহিত্যিক এ ধরনের গল্প লিখেছেন নিরেট বাস্তবতাকে ব্যবহার করে। দ্বিতীয়ত, 'ভূষণের একদিনে'র মতো কোনো কোনো গল্পে মাটি, ভূমির বিন্যাস ও গাছপালাকে তিনি এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন, যার সাথে রাঢ়বঙ্গের পরিবেশ-পরিস্থিতি বেশ অনেকদূর খাপ খেয়ে যায়। ফসল তোলার পরের রিক্ত মাঠ আর তুলনামূলক কম গাছ-গাছালি হাসানের বহু-ব্যবহৃত ভূ-প্রকৃতি। 'ভূষণের একদিন' গল্পেও আমরা কাছাকাছি বাস্তবতার সাক্ষাৎ পাই। বাংলাদেশের বরেন্দ্র অঞ্চলের আবহ কি এ ব্যাপারে তাঁকে কোনো সহায়তা করেছিল? তৃতীয়ত, গ্রামীণ পটভূমিতে জমি-ফসল-শোষণ-গরিবির প্রেক্ষাপটে তিনি এমন এক বাস্তবতা নিয়ে মুখ্যত কাজ করেছেন, যেখানে

বাংলা অঞ্চলের অন্য বাস্তবতার সাথে অমিলের তুলনায় মিলের সম্ভাবনাই অনেক বেশি। এ কারণেই রাঢ়বঙ্গের কাঠামোগত বাস্তবকে বাংলাদেশের বাস্তব হিসেবে উপস্থাপন করতে খুব একটা বেগ পেতে হয় নাই।

কিন্তু এসবের বাইরে আরেকটি বড় উপাদান হাসানের লেখায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কাজ করে গেছে – তাঁর বিশেষ ধরনের জাতীয়তাবাদী চৈতন্য।

৩

হাসান আজিজুল হক খুব গভীর অর্থে 'বাঙালি জাতীয়তাবাদী'। তাঁর গল্প পরিষ্কার সাক্ষ্য দেয়, তিনি মনে করতেন, বৃহৎ বাংলাভাষী সমাজে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এমন বাস্তবতা বিরাজ করে, যার নিরিখে মর্মগতভাবে একটি সমরূপ জনগোষ্ঠী কল্পনা করা সম্ভব। তাঁর রাঢ়বঙ্গের এই-ই হলো প্রধান শৈল্পিক-নান্দনিক ভিত্তি ও ন্যায্যতা। অন্যভাবে বলা যায়, জনগোষ্ঠীকে সমরূপ হিসেবে কল্পনা করা এবং দেশভাগ অনুমোদন না করার কারণেই তিনি রাঢ়বঙ্গের সাথে বাংলাদেশ অঞ্চলের কোনো মর্মগত ফারাক বোধ করেন নাই।

হিন্দু-মুসলমানের চিত্রায়ণে তাঁর ভঙ্গি পরীক্ষা করলে কথাটার প্রমাণ মিলবে। প্রায় সারাজীবন তিনি এমনভাবে জনগোষ্ঠীকে উপস্থাপন করেছেন, যাতে সম্প্রদায়গত বিভাজন খুব বড় হয়ে না ওঠে। তুলনামূলক সচ্ছল জীবনের অভিজ্ঞতা আছে, এমন একটা গল্প থেকে উদাহরণ দেয়া যাক। গল্পের নাম 'সারা দুপুর'। প্রধান চরিত্র এক কিশোর। এ গল্পে লেখক বালক-মনস্তত্ত্বকে যেভাবে একদিকে বৃহৎ পটভূমির সাথে সম্পর্কিত করেছেন, এবং অন্যদিকে চারপাশের অব্যবহিত প্রতিবেশে ছড়িয়ে দিয়েছেন – তার তুলনা বিরল। কিন্তু সেদিকটা বাদ দিয়ে আমাদের বর্তমান আলোচনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা হলো, পুরো গল্পে এমন একটা প্রসঙ্গও নাই, যা বিশেষভাবে হিন্দু বা মুসলমান জনগোষ্ঠীর জন্য অত্যাবশ্যক। কথাটা 'খাঁচা' গল্পের ক্ষেত্রে হয়ত প্রযোজ্য নয়, কিন্তু 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' গল্পের ক্ষেত্রে খুবই সত্য। এখানকার মুসলমান পরিবারটি ওপার থেকে এসেছে – এই বাহ্য তথ্য বাদ দিলে আদতে মুসলমানির আর কোনো চিহ্ন তাদের কথা ও আচরণে পাওয়া যায় না। আগত তিন যুবকের একজন হিন্দু হলেও, এবং নামের পাশাপাশি তার হিন্দুত্বের আরও দুই-চারটা পরোক্ষ চিহ্ন থাকলেও, তিন জনের মর্মগত কোনো ফারাক নাই। বরং নামে হিন্দু থাকা, আর কার্যত কোনো ভেদ না

থাকায় প্রমাণিত হয়, হিন্দু-মুসলমান ফারাক কোনো মর্মগত ফারাক নয়।

অবশ্য বেশিরভাগ গল্পের ক্ষেত্রে এটা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়েছে প্রধানত গরিব মানুষকে অবলম্বন করেছেন বলে। *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা দিয়ে গরিব হিন্দু-মুসলমানের জীবনযাপনের সমরূপতার দাবি পেশ করেছিলেন। বলেছেন, সকলে মিলে তারা অন্য এক ধর্ম পালন করে, যার নাম দারিদ্র্য। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি হাসান আজিজুল হককে প্রভাবিত করে থাকতে পারে। বিপরীতে এমনও হতে পারে, গরিব মানুষের জীবনযাপন চিহ্নিত-চিত্রিত করায় তাঁর যে প্রবল আগ্রহ, তার অন্তত একটা অনুপ্রেরণা এ ধরনের চিন্তা থেকেই এসেছে।

গল্পের শৈল্পিক অভীপ্সার দিক থেকে হাসান আজিজুল হক কাজটা করতে পেরেছেন একটা বড় যোগ এবং একটা বড় বিয়োগের মধ্য দিয়ে। যোগটা হলো তাঁর অতি-প্রত্যক্ষবাদী টান। বলা যায়, একেবারেই দেখা থেকে লেখা – এরকম একটা ভঙ্গি তাঁর সাহিত্যকর্মে প্রবল। 'জীবন ঘষে আগুন' গল্প থেকে একটা উদাহরণ দেয়া যাক।

> এইভাবে গল্প শেষ করে পুরোহিত ঠাকুর চোখ উল্টে দেয়, মুখভাব প্যাঁচার মতো, অল্প অল্প দুলে মায়ের মহিমা উপলব্ধি করে, উপস্থিত কেউ কেউ অবশ্য উশখুশ, বৎসরে বৎসরে এই গল্প চলে আসছে, তবু বুড়ো গল্পটাকে কিভাবেই না রসায় – আঁ, বাপু রসায় মন্দ না – তবু কাহিনীটা এট্টু রসেছে, নয়? বাসি মাছের মতোন। বাজনদারের দল ফসফস করে বিড়ি টানে – ঢাকের কাঠি দিয়ে কানের পাশ চুলকোয় – এসব এজন্যে যে তারা কস্মিনকালেও কোনো কথা শোনে না – তারা ঢাকের ওজনই সইতে পারে না, মাথা ঘাড়ের উপর ঢুলে ঢুলে পড়ে যায়, চোখেও যেন ভাল ঠাহর হয় না – অবশ্য কিছু কিছু ভক্তিমান ভদ্রব্যক্তি অকস্মাৎ খিঁচিয়ে ওঠে, কি দাঁত বের করে হাসিস ফ্যাক্‌ফ্যাক্ করে? কি সব হয়েছে আজকাল! দেবদ্বিজে ভক্তি – আ-ছি, ছি –

'জীবন ঘষে আগুন' গল্পের সুবিশাল আয়োজনে হিন্দু-মুসলমান চরিত্র ও প্রসঙ্গ বারবার এসেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই লেখক বর্ণনা করেছেন পার্শ্বস্থিত একজন তুখোড় দ্রষ্টা হিসেবে। উদ্ধৃত অংশে দেখা যাবে, দ্রষ্টা নিজের মনোভঙ্গি গোপন রাখে নাই – ভাষার ভঙ্গি আর শব্দযোজনা বরং একটু বেশিই অংশগ্রহণমূলক; কিন্তু বাইরে প্রকাশিত বাস্তব যতটা দেখায় বা প্রকাশ করে, তাকে মাড়িয়ে কোনো চরিত্রের অন্তরঙ্গ ভেতরে প্রবেশের কোনো আগ্রহ সে দেখায় নাই। হাসানের গল্পের শিল্পরীতি বিষয়ে আমরা আগে যে মন্তব্য

করেছি, তার বরাতে বলা যায়, তিনি নির্বাচন করেছেন চোখে দেখা সেসব অভিজ্ঞতা, যাকে শব্দ ও ভঙ্গির কুশলী মোচড়ে ছবিতে পরিণত করা যায়, যার প্রাথমিক গ্রহণযোগ্যতা থাকবে দৃষ্টি-ইন্দ্রিয়ের কাছে। মানুষের অনুভূতি বা উপলব্ধির আরও গভীরতলের যেসব উচ্চারণ অকপট অন্তরঙ্গতায় প্রকাশিত হয়, হাসান সাধারণভাবে সেগুলোকে আশ্রয় করেন নাই। বলা যায়, তিনি যা বিয়োগ করেছেন, তার নাম অন্তরঙ্গতা। তার নাম আধ্যাত্মিকতা – ধর্মীয় বা মরমি অর্থে নয়, বস্তু-অতিক্রমী যে অনুভূতি মানুষের গভীরতর অচেতনকে প্রকাশ করে, হাসানের সফলতম রচনাগুলোতেও সে বস্তুর দেখা সামান্যই মেলে।

কিন্তু এ বিয়োগ তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গল্পগুলোর জন্য ক্ষতির কারণ হয় নাই। তাঁর ছিল আধুনিকতার তীর্যক দৃষ্টি, আর শ্রেণিচেতনায় ঋদ্ধ জীবনদৃষ্টি। তাঁর ছিল স্থান আর আবহকে সামষ্টিক জীবনের সাথে একাকার করে উপস্থাপনার মুনশিয়ানা। আর ছিল রাষ্ট্র, রাজনীতি ও জাতীয়তাবাদের বানানো কথামালাকে পাত্তা না দিয়ে নিখিল জনসমাজকে আবিষ্কার করার তুরীয় সাহস। এসবই তিনি গল্পের পর গল্পে পরিবেশন করে গেছেন সংযম ও নিরাসক্তির সাথে। গেল শতকের নব্বইয়ের দশক থেকে ওই নিরাসক্তিতে টান পড়ে। তাঁর তুরুপের তাসগুলো হাতছাড়া হয়ে গেলে তিনি আশ্রয় নেন মূলধারার জাতীয়তাবাদী প্রকল্পে। *আগুনপাখি* উপন্যাস এ পর্বেরই রচনা।

আগুনপাখি উপন্যাসে লেখক এগিয়েছেন বর্ণনামূলক ঢঙে – বিশ্লেষণাত্মক মেজাজের জেদি ও বাঁকা ছবি-আঁকার রীতি বিয়োগ করে। নিরাসক্তির বদলে প্রকল্প প্রমাণের আসক্তি হয়েছে প্রবল। গ্রামীণ পরিসরের বিত্তশালী পরিবারের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ হাওয়া করে দেয়ার গরজ থেকে প্রথমেই এঁকেছেন হিন্দু-মুসলমান মিলমিশের ছবি। এ উদ্যোগের জন্য দরকার ছিল অন্তরঙ্গ নানা আয়োজন। কিন্তু আমরা আগেই বলেছি, তিনি অন্তরঙ্গ কথামালা নির্মাণের শিল্পী নন। কাজেই এ ছবি আরোপণমূলক দায়িত্বশীলতার পরাকাষ্ঠা হয়েছে – অন্তর্লীন জীবনধারার নানা টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে নির্মিত শুভকামনাও হয়ে ওঠে নাই। আর কেন্দ্রের রাজনীতি প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গিয়ে দেশভাগের জরুরতকে সামনে নিয়ে এলেও লেখক কথক-নারীটিকে রেখে দিয়েছেন এর আওতার বাইরে। স্বামী-সন্তান আর যাবতীয় মানব-সম্পর্কের বাইরে গিয়ে, কোনো প্রকার প্রস্তুতি ছাড়াই, ওই নারী লেখকের তরফে

জাতীয়তাবাদী প্রশ্নগুলো উচ্চারণ করে গেছে – যেনবা এক আনুষ্ঠানিক জাতীয়তাবাদী বয়ানের বিপরীতে অন্য আনুষ্ঠানিক জাতীয়তাবাদী বয়ানের ন্যায্যতা প্রমাণ করতে তাঁর যাবতীয় আয়োজন। আগে যেখানে হাসানের শক্তি ও ব্যক্তিত্ব ছিল কেন্দ্রীয় বয়ানকে একেবারেই পাত্তা না দিয়ে নিখিল জীবনযাপনের দৈনন্দিনের মধ্যে জীবনযাপনগত জাতীয়তাবাদ আবিষ্কার, এখন সেখানে উচ্চকিত জাতীয়তাবাদী বয়ান রাষ্ট্র ও রাজনীতির এক ব্যাকরণকে চ্যালেঞ্জ করে অন্য ব্যাকরণকে ন্যায্যতা দিতে তৎপর। আগে যেখানে এক ধরনের সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ কোনো উচ্চারণ ব্যতিরেকেই কেবল যাপিত জীবনের বৃহৎ আয়োজনের মধ্য দিয়ে ফুটে বেরিয়েছে, এখন সেখানে রাজনৈতিক-রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবাদ যাপিত জীবনকে গিলে ফেলতে উদ্যত, নিজের বয়ান ফলাও করতে উচ্চকণ্ঠ।

কালো বরফের সাথে তুলনা করলে এ দুয়ের ফারাক আমরা আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারব। *কালো বরফ* ব্যক্তিগত অনুভূতির ব্যাখ্যা-অসম্ভব প্রতিবেদন। তার নিজেকে যৌক্তিক প্রমাণের দায় নাই। দশের সাথে এক পাটাতনে জড়ো হয়ে নিজের অনুভূতিকে শক্তিমান প্রমাণের জরুরত নাই। কিন্তু *আগুনপাখির* কথক-চরিত্র একদিকে এমন এক ব্যক্তিগত উপলব্ধিতে পৌঁছায়, যার সাথে তার পরিবার-পরিজন বা আত্মীয়-প্রতিবেশীর কোনো সম্পর্ক নাই। অন্যদিকে নিজের উপলব্ধিকে দশের উপলব্ধির চেয়ে অধিকতর জুতসই প্রমাণ করতে তার তৎপরতারও শেষ নাই। অতীতের যাপিত-জীবনের কোনো গভীর তল থেকে এ উপলব্ধি তৈরি হয়নি বলে একে সমসাময়িক রাজনৈতিক বয়ানের এক শক্তিশালী প্রতিপক্ষ বলেই মনে হয়।

এ ধরনের অবস্থান থেকেও উৎকৃষ্ট উপন্যাস রচনার বহু উদাহরণ দুনিয়া জুড়ে আছে। *আগুনপাখি* সে সাফল্যের নাগাল পায় নাই। তার অনেক কারণ। হাসান আজিজুল হকের কথাসাহিত্যের জাতীয়তাবাদী ও সাংস্কৃতিক পটভূমির সাথে তাঁর নন্দনসূত্রের সম্পর্ক তালাশের নিমিত্তে আমরা এখানে যে পর্যালোচনায় নেমেছি, তার দিক থেকে জরুরি কথা দুটি। এক. রাষ্ট্র ও রাজনীতি-নিয়ন্ত্রিত আনুষ্ঠানিক জাতীয়তাবাদী বয়ান রচনার কলা হাসানের আয়ত্তে ছিল না। দুই. বয়ানের যে বিশিষ্টতা তাঁর গল্পের ক্ষেত্রে নিঃসংশয় কার্যকরতার প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছিল, সেগুলো একদিকে উপন্যাসে কার্যকর প্রমাণিত হয়নি, অন্যদিকে উপন্যাস রচনার কালে ওই কলাকৌশলের কার্যকরতায়ও টান পড়েছিল।

৪

হাসান আজিজুল হকের রাজনৈতিক পক্ষপাত এবং নন্দনতাত্ত্বিক কারিগরি মোটেই নিরীহ কিছু নয়। তাঁর রাজনীতি এবং নান্দনিকতা দুটোই বিভিন্ন সময়ে প্রশ্নের মুখে পড়েছে। এ প্রশ্ন যথার্থ বলেই মনে করি। তবে যে ভঙ্গিতে প্রশ্নগুলো উত্থাপিত হয়েছে, তা মোটেই জুতসই নয়। লাভজনকও নয়। তাঁর 'সাংস্কৃতিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী' অবস্থান যে খুব গভীর উপলব্ধিজাত, তার প্রমাণ তো তাঁর গল্পের নন্দনসূত্র এবং তার সাফল্য। শেষদিকের প্রবন্ধ-গল্প-উপন্যাসে প্রচারিত আনুষ্ঠানিক ও কেন্দ্রীয় জাতীয়তাবাদী ধারণা বাদ দিলে প্রায় সারাজীবন তিনি যে 'বাঙালি জাতীয়তাবাদী' অবস্থান ধারণ করেছেন, তাকে মোটেই আরোপণমূলক বলা যাবে না। কাজেই একে জোরালো পক্ষপাত বা জোরালো বিরোধিতার অবস্থান থেকে সমর্থন করা বা প্রশ্নবিদ্ধ করা মোটেই কাজের কথা নয়। বরং বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির অসামান্য টেক্সট হিসেবেই তাঁর রচনাবলি পাঠ্য – যদি স্রেফ গল্পরস আস্বাদনের জন্য গল্প-পাঠের বিষয়টিকে একপাশে সরিয়েও রাখি।

সভ্যতার সংকট ও শিক্ষার দায়

রাখাল রাহা

১

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা উল্টোপথে চলছে, আর সেই উল্টোপথকে বলা হচ্ছে শিক্ষাবিজ্ঞান! বিজ্ঞান এখনো পর্যন্ত যেটুকু জানতে পেরেছে তা দিয়ে বলছে, মানুষের মস্তিষ্কের বিকাশ জন্মের পূর্বেই প্রায় সম্পন্ন হয়ে যায়। যেটুকু বাকি থাকে তা জন্ম-পরবর্তী কয়েক মাসের মধ্যেই সম্পূর্ণ হয়ে যায়। এরপরও যদি কিছু বাকি থাকে তা পূর্ণ হতে হতে কয়েক বছরের পর আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। বিকাশের ঠিক এরকম পর্যায়ে সাধারণত একটা শিশু স্কুলে আসে। অর্থাৎ একটা শিশু যখন স্কুলে আসে তখন তার মধ্যে সম্ভাবনা সৃষ্টি করিয়ে দেওয়ার কাজ আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। স্কুল বা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান তাহলে কি করে? যেটা করে তা হলো শিশুকে শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, সামাজিকীকরণ, সাক্ষরতা ইত্যাদির সুযোগ দিয়ে যার যতটুকু সম্ভাবনা আছে সেটারই বিকাশের পথ করে দেয়, অথবা সুযোগ দেওয়ার নামে সম্ভাবনাকে সঙ্কুচিত করে বিকাশের পথটাকে আরো রুদ্ধ করে দেয়। শুধু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান নয়, পরিবার বা সমাজ বা রাষ্ট্রও বহু ধরণের অভিজ্ঞতা দিয়ে তাকে তার অমিত সম্ভাবনার দিকে চালিত করে, বা তার পথ অবরুদ্ধ করে দাঁড়ায়।

তাহলে শিক্ষা কি, শিক্ষার কাজটা কি? একটা বটবৃক্ষের বীজ পুরনো ভাঙা দালানের কোণায় পড়লে তার সকল সম্ভাবনা নিয়েই সেটা যেমন সারাজীবন বামন হয়ে থাকে, আর উপযুক্ত মাটিতে পড়লে ও প্রত্যাশিত আলো-বাতাস পেলে সেই বীজটাই যেমন বিশাল মহীরূহ হয়ে ওঠে, তেমনি শিক্ষা হলো একটা শিশুর জন্য উপযুক্ত মাটি আর আলো-বাতাসের ন্যায়। পরিবার-সমাজ

বা রাষ্ট্রের কাজ হলো তাই বীজ বুঝে তার উপযোগী মাটি তৈরী করে দেওয়া, তার জন্য উপযুক্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করা, আর এ থেকে যে লতা-গুল্ম-বৃক্ষ-মহীরূহ তৈরী হলো তার ফুল-ফসলের মর্যাদা নিশ্চিত করা। তাহলে বলা যায় **শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হলো এমন একটা পরিকল্পিত সংগঠন, যেখানে সকল লতা-গুল্ম-বৃক্ষ-মহীরূহের বিকাশের পথ অবারিত থাকে। সুতরাং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কাজ এটা নয় যে, সব লতাকে মহীরূহ বানানোর সাধনা করা বা সব মহীরূহকে কেটেছেঁটে গড় মানে নিয়ে আসা।**

কিন্তু বিস্ময়করভাবে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় এমন সৃষ্টি-বিরুদ্ধ প্রবণতা তো রয়েছেই, তদুপরি এখানে এই উপযুক্ত মাটি আর আলো-বাতাস তৈরীর অধিকাংশ প্রযত্ন, শ্রম ও সম্পদ নিবেদিত হয় তাদের জন্য, যাদের সম্ভাবনাই তুলনামূলকভাবে কম। বলা যায়, সম্ভাবনা যেখানে যত কম, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রযত্ন সেখানে তত বেশী। একটা মহৎ উদ্দেশ্য এর পেছনে রয়েছে বলে সামনে যেই ঢোলটা পেটানো হয় তা হচ্ছে – সম্ভাবনার ব্যবধানটা কমিয়ে আনা, যাতে পেছনে যারা রয়েছে তারা সমাজের বোঝা না হয়। কিন্তু এটা করতে গিয়ে যারা জগতে অসীম সম্ভাবনা ধারণ করে এসেছিল, নতুন সম্ভাবনা নিয়ে এসেছিল, তাদের প্রতি আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখনো প্রায় সেভাবে তাকানোরই সময় পায় না! এতে করে শিক্ষা জগতের সমষ্টিগত যতোখানি কল্যাণ সাধন করতে পারতো তার সামান্যই পারে। কারণ মানবশিশুকে বীজ বা গাছের সাথে তুলনা করলেও এ ধরণের তুলনার একটা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সীমাবদ্ধতা হলো, একটা গাছের সর্বোচ্চ পুষ্টি নিশ্চিত করলে সে শুধু তার বিকাশই নিশ্চিত করে সর্বোচ্চ ফুল-ফসল দিতে পারে, কিন্তু তার পরিবেশের অন্যান্য বৃক্ষের পরিপুষ্টি সাধনে বা ফুল-ফসল উৎপাদনে খুব সামান্যই ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু মানুষ তা নয়। অসীম সম্ভাবনাময় একজন মানুষই যথাযথ পরিবেশ পেয়ে শুধু মানুষের জগৎ নয়, বস্তু-অবস্তু-প্রাণ-প্রকৃতির পুরো জগৎটাকেই পরিবর্তনের সম্ভাবনার দিকে চালিত করতে পারে।

এই যে ব্যক্তির অমিত বিকাশর সম্ভাবনা – তাকে অধরা রেখে এবং গড় মান বাড়ানোটাকে কেন্দ্রে রেখে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব এতটাই বাড়িয়ে তোলা হয়েছে যে, পরোক্ষভাবে মনে হয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের উপরই শিক্ষার্থীর সকল সম্ভাবনা নির্ভর করে, তা তার বীজে সম্ভাবনা যতো ক্ষুদ্রই থাক! তাই জগৎ জুড়ে গোটা শিক্ষাব্যবস্থার কারিকুলাম, পাঠ্যসূচি,

পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি সকলকিছু নির্মাণ করা হয় মূলত মাঝারি, এমনকি সম্ভাবনাহীনদের দিকে তাকিয়ে। জগতে মাঝারিদেরই যেহেতু সংখ্যাধিক্য, আর সম্ভাবনাময়দের সংখ্যা যেহেতু সম্ভাবনাহীনদের চেয়েও বহুগুণ কম থাকে, সে-কারণে শিক্ষা ও কল্যাণ-ভাবনায় মাথাগুনতির যুক্তিকে শিক্ষাবিজ্ঞানে স্থায়ীভাবে তত্ত্বাবদ্ধ ও সূত্রাবদ্ধ করা দারুণভাবে সম্ভব হয়েছে। এটা করার জন্য সহজ, শিশুবান্ধব, মানসিক চাপমুক্ত, সবার সমান সুযোগ, ইত্যাদি বহু পরিভাষার সৃষ্টি করা হয়েছে। এতে করে বস্তুত শিক্ষার পরিসর ও তার সম্ভাবনা মারাত্মক রকমভাবে সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। কিন্তু জগতে একটা শক্তির বিকাশ ঘটে গেছে, যারা এই প্রচেষ্টারই গুণগান এবং তার জন্য জানপ্রাণ দেওয়ার উছিলায় আলাদা এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুত হয়েছে!

২

সব শিশু সমশিশু নয়। সুতরাং কার জন্য সহজ, কার বান্ধব, কার মানসকে গুরুত্ব দিলে যে উৎকণ্ঠা-তাড়িত হয়ে এমন উল্টোমুখী শিক্ষাব্যবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে তার নিরসন হতে পারতো – তা বোঝা প্রয়োজন। জগতে ভালোর পথটা প্রশস্ত করে দিলে সে-যে অসংখ্য খারাপের দায়িত্ব নিতে পারে, বা তার সৃষ্টিক্ষমতায় সমাজ বা রাষ্ট্র সমৃদ্ধ হয়ে খারাপের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করতে পারে – এই সত্যটাও বোঝা দরকার। প্রাচীন বাঙলায় গুরুদের পাঠশালায় গরুদের দোহাই দিয়ে সম্ভাবনাময়দের পিছিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা ছিলো না। বরং সর্দার-পোড়ো পার হয়ে পণ্ডিত বা গুরুর কাছে যাওয়ার আগেই অধিকাংশ পোড়োর বিদায় ঘটতো। এখন সর্বজনীনতার যুগ। সমান সুযোগ ইত্যাদির জিগির তুলে সারা দুনিয়াতেই সবাইকে সব অর্জন করিয়ে দেওয়ার সোরগোল। মহত্ব অর্জনের খায়েসে সুযোগের দোহাই, সমতার দোহাই, ইত্যাদি দিয়ে যে যা না-পারে তাকে তাই বানানোর প্রচেষ্টা। আর তার ভীড়ে চাপা দিয়ে-দিয়ে অসীম সম্ভাবনাকে বিবর্ণ করে তোলা!

শিক্ষার এই যে উল্টো প্রচেষ্টা, দেশে দেশে তারও বহু রূপ আছে। প্রায় মেধাহীন, প্রতিবন্ধী, স্লো-লার্নার, পশ্চাদপদ, ঝুঁকিপূর্ণ ইত্যাদি নাম দিয়ে কিছু শিশুকে পৃথক করে এগিয়ে তোলার প্রযত্ন-প্রয়াস যেমন আছে, তার সাথে অতিমেধাবী নাম দিয়ে আবার কিছু শিশুকে ভিন্ন কারিকুলাম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যবইয়ের আওতায় রাখার উদ্যোগও রয়েছে। একইসাথে তত্ত্ব রয়েছে

স্লো-লার্নারদের বন্ধুরাও স্লো-লার্নার হওয়ায় তারা বন্ধুদের কাছ থেকে কিছুই শিখতে পারে না; অ্যাডভান্সড লার্নাররা অ্যাডভান্সড হওয়ায় তারা সমাজের গড় বুঝতে পারে না। উপরন্তু তাদেরকে পৃথক করায় তারা যে আলাদা এটা উপলব্ধি করে উভয় দলই নানা ধরণের মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত হয়। ফলে এ ধরণের পৃথকীকরণে শিক্ষার মাধ্যমে তাদের বিকাশের যেটুকু সুযোগ হতে পারতো সেটাও অনেক ক্ষেত্রে সঙ্কুচিত হয়। আসলে **জগতের বৈচিত্র্যের উপলব্ধি থেকে বিচ্ছিন্ন যে শিক্ষা সে কোনো শিক্ষাই নয়। আর অ্যাডভান্সড বা অতি বুদ্ধাঙ্ক মানেই অতি ভালো বা অতি সৃষ্টিশীল কিছু নয়।**

অতি বুদ্ধাঙ্ক আর প্রায়-শূন্য বুদ্ধাঙ্কের মাঝেই রয়েছে অধিকাংশ। অধিকাংশ – এই সাধারণ বুদ্ধাঙ্কদের নিয়ে যে মূলস্রোত এবং তার যে শিক্ষাকার্যক্রম, সেখানে সৃষ্টিশীল-চিন্তাশীল শিশু বলে কোনো শব্দ নেই। কিন্তু ভালনারেবল, স্লো-লার্নার ইত্যাদি পরিভাষাযুক্ত অসংখ্য শিশু রয়েছে। আর তাদের শিক্ষা দেওয়ার নামে নানা এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সরকার ও বিভিন্ন ধরণের উন্নয়ন-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে কাড়াকাড়ি। কিন্তু জগতে আজ পর্যন্ত প্রায় কোনো নজরুল-রবীন্দ্রনাথ কিংবা নিউটন-আইনষ্টাইন স্কুলে গিয়ে শান্তি পাননি। আজ জগৎ তাঁদের জয়গানে মত্ত, তাঁদের সৃষ্টি-সম্ভোগে বুঁদ। এতটাই বুঁদ যে তাঁরা কেন স্কুলে যেতে চাইতেন না, স্কুল কেন তাঁদের ভালো লাগত না, তা খুঁজে দেখার সময়ও তাদের নেই। তাঁরা যদি স্কুলে গিয়ে আনন্দ পেতেন, বিকাশের উপযোগী পরিবেশ পেতেন তাহলে তাঁদের প্রতিভা আরো বিকশিত হতে পারতো – এই যুক্তি যদি শিক্ষাবিজ্ঞানসম্মত না হয় তবে তো স্কুল উঠিয়ে দিলেই ভালো!

৩

দেশভেদে শিক্ষা সমস্যার অনেক মাত্রা রয়েছে। অতীতে সমাজে শিক্ষা নিয়ে চিন্তা করতো চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক, দার্শনিকেরা – আর এখন করে রাষ্ট্রের ছায়ায় নানা ধরণের কর্পোরেশন ও উন্নয়ন-বাণিজ্যিক সংস্থা। রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থা অতীতে জগদ্বিখ্যাত মনীষীদের শিক্ষাভাবনার সন্ধান করতো, এখন তাকিয়ে থাকে বহু ধরণের কর্পোরেশন ও উন্নয়ন-ব্যবসায়ী সংস্থার পাইপলাইনের দিকে। এবং সেই পাইপলাইন থেকে যা কিছু প্রকল্পাকারে নির্গত হয় বিতর্ক অনুষ্ঠানের পূর্বনির্ধারিত পক্ষ-বিপক্ষের মতো করে তারা, "অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই সেই প্রস্তাবের পক্ষে বা বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে"

ফেলেন! তাদের এই অবস্থান থাকে মূলত ক্ষমতা রক্ষা বা ক্ষুন্নিবৃত্তির স্বার্থে, কিংবা বাধ্য হয়ে। মন থেকে এগুলো তারা বিশ্বাস করুন বা না-করুন এই তাগিদে তারা বলতে পারেন না, বা করতে পারেন না এমন কোনো কিছু নেই। অথচ শিক্ষাব্যবস্থায় অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন মিলালে পানি হবেই এমন কোনো গ্যারান্টিযুক্ত পেডাগোজি নেই, মেথডোলজি নেই। তবু বহু কিছিমের কর্পোরেশন ও উন্নয়ন-ব্যবসায়ী চক্র যখন যে পেডাগোজি হাজির করেন, যে মেথডোলজি গেলান তাকেই এরা সর্বরোগের মহৌষধ মনে করেন!

বোঝা দরকার, একজন যোগ্যতাসম্পন্ন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক বই ছাড়াই শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা দিতে পারেন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেও যদি একটা শিশু লিখতে-পড়তে না পারে, তার মূল দায় কারিকুলাম বা পাঠ্যপুস্তকের নয়; দায়ী হলো শিক্ষাব্যবস্থা এবং সেই ব্যবস্থার যারা নির্মাতা-কারিগর, তারা। যদি কোনো শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক নিয়োগ-প্রক্রিয়া ত্রুটিপূর্ণ হয়, অযোগ্যরা শিক্ষক হন, যোগ্যরা ক্লাস পরিচালনায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন, যেনতেনভাবে ক্লাস পরিচালনা করলেও যদি সমস্যা না হয়, প্রশিক্ষণের ন্যূনতম মান যদি না থাকে, ক্লাসের বাইরের এলোমেলো কাজকে যদি শিক্ষকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা যায়, সরাসরি শিক্ষার্থীদের সাথে ক্লাস ও মিথস্ক্রিয়ার সময় যদি কমিয়ে দেওয়া যায় – তবে কোনো কারিকুলাম বা পাঠ্যপুস্তক দিয়েই শিক্ষার মানের উন্নতি করা যায় না। কিন্তু শিক্ষা-উন্নয়নব্যবসায়ী চক্রের প্রধান মনোযোগ সেখানে থাকে না – থাকে কারিকুলাম, মূল্যায়ন-পদ্ধতি, কাঠামো, স্তর, ব্যাপ্তি, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভাঙচুর আর অস্থিরতা রেখে বছর বছর বই নিয়ে জোড়াতালি দেওয়াতে; আর এর মাধ্যমেই প্রকল্পের পর প্রকল্প করে পূর্বের প্রকল্পের ব্যর্থতার মূল্যায়ন করে-করে আরো-আরো প্রকল্প হাজির করে ধারাবাহিকভাবে শিক্ষার নিম্ন, মধ্য ও উচ্চস্তর ধ্বংস করে যাওয়াতে!

৪

শিক্ষা নামে প্রচলিত প্রপঞ্চটা কখনো কখনো একটা সমাজ বা রাষ্ট্রের জন্য দুর্যোগ বা দূষণতুল্যও হতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা সেই সমাজ বা রাষ্ট্রের জনমানসে কখনোই দুর্যোগ বা দূষণতুল্য হবে না। কারণ শিক্ষা হলো মানবসভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে প্রভাবশালী ইতিবাচক প্রপঞ্চ বা ফেনোমেনা।* অতীতে বহু কাঙ্ক্ষিত এই প্রপঞ্চ থেকে মানুষকে বঞ্চিত রাখার

মাধ্যমে ধ্বংসসাধনের পরিকল্পনা করা হতো। বর্তমানে এটাকে সবার জন্য সমান সুযোগ হিসাবে হাজির রাখার মাধ্যমে ধ্বংসের পরিকল্পনা সাজানো হয়। সবার জন্য যেনতেন কোনো এক ধরণের শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়ে যদি তার উপযোগী সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তন না করা হয়, কিংবা যদি পরিকল্পিতভাবে উল্টোটা করে তোলা যায়, তবে পূর্বের অশিক্ষা থেকে সেই সমাজের যতখানি ক্ষতিসাধন করে স্বার্থ হাসিল করা যাচ্ছিল, পরের তথাকথিত শিক্ষা দিয়ে তার থেকে অনেক বেশী ক্ষতিসাধন করা সম্ভব হয়, এবং একইসাথে বহুগুণ বেশী স্বার্থসিদ্ধিও লাভ করা যায়। শিক্ষা এ পর্যায়ে হয়ে ওঠে শুধুমাত্র সাক্ষরতা বা বড়োজোর পঠনযোগ্যতার প্রতিশব্দ, কিংবা সনদপত্রের নাম!

এই তথ্য তো সবার জানা যে, আজও পৃথিবীর প্রতি ১০ জনে ১ জন না-খেয়ে বা ক্ষুধা নিয়ে ঘুমাতে যায়! প্রতি ১০০ জন মানুষের মধ্যে প্রায় ৩ জনের কোনো ঘর নেই এবং প্রায় ২০ জনের যেটা আছে তা না-থাকার মতোই! পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে থাকা এই শতকোটি মানুষের বস্ত্র বা পোশাকের তথ্যও ধারণা করা যায়; ধারণা করা যায় চিকিৎসাসুবিধা প্রাপ্তির বিষয়েও। বাংলাদেশের মতো দেশের কথা চিন্তা করলে এমন মানুষের হার আরো বেশী হবে, এবং সংখ্যাটা কয়েক কোটি ছাড়িয়ে যাবে।* যেটুকু পুষ্টি পেলে আর পারিবারিক-সামাজিক বন্ধন নিশ্চিত থাকলে মানুষের ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত বোধ কাজ করে তা কোনো ঘরহীন-ক্ষুধার্ত মানুষের সাধারণত থাকে না। মানুষের বিবেচনাবোধের যে ন্যূনতম মাত্রা বিবেচনায় রেখে রাষ্ট্রের প্রশাসন ও শৃঙ্খলাযন্ত্রের কাঠামো ভাবা হয় তা এখানে অচল। কারণ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের তীব্র সংকট থাকলে মানুষের অপরাধবোধের ধারণা পৃথক হয়। তাই প্রচলিত অপরাধ নিরাময় কর্মসূচীও তাদের ক্ষেত্রে সেভাবে কাজ করে না। এদের উন্নয়নের (!) জন্য বহু ধরণের উন্নয়ন-ব্যবসায়ী চক্র কাজ করে। তাদের কাজের ধরণটা এমন যাতে মনে হয় মানুষের মৌলিক চাহিদাক্রমের শুরুতেই শিক্ষা!

অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-চিকিৎসার ন্যূনতম সুবিধাবঞ্চিত এই মানব-কীটগুলোকে তারা শিক্ষার নামে মূল্যবোধহীন কিছু দক্ষতার উন্নয়ন ঘটায়। শিশুবয়স থেকেই সাধারণত এই মানুষগুলো অতি নিম্নমানের কায়িক শ্রমের সাথে যুক্ত থাকে। কিন্তু শিক্ষা নামক দক্ষতা (!) পেয়ে তারা নিম্ন-মধ্যমানের কায়িক শ্রম ও সেবা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পায়। এদের

অপরাধ-বিবেচনার বোধ যেহেতু আগে থেকেই ভিন্ন থাকে, সে কারণে কিছু দক্ষতার পাঠ পাওয়ায় তারা সমাজ ও রাষ্ট্রে চালু থাকা উচ্চমানের অপরাধের সাথে নিম্ন-মধ্যস্তরে যোগাযোগের সুযোগ পায়। এভাবে ক্রমশ তাদের অনেকেই গোটা সমাজ ও রাষ্ট্রের নিম্ন-মধ্য পর্যায়ে নির্ধারক ভূমিকায় দাঁড়িয়ে যায়। এমনকি কখনো কখনো শীর্ষপর্যায়ের সাথেও তারা যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়। আর এভাবে শিক্ষা ব্যাষ্টিক লেভেলে উন্নয়নের মাধ্যমে একটা রাষ্ট্রের সামষ্টিক লেভেলের যতোটুকু ভারসাম্য থাকে তাকে আরো অস্থির করে পুরো সমাজ-রাষ্ট্রকে আরো পতিত করে।

অন্যদিকে একেবারে ঘরহীন বা ক্ষুধার্তদের বাইরের যে জনসমষ্টি – যারা একটা সমাজ বা রাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্য উপযোগী মূল্যবোধ, বিশ্বাস, রীতি, সংস্কার, সংস্কৃতি ইত্যাদি প্রবহমান রাখায় প্রধান ভূমিকা পালন করে – তাদের শিক্ষায় যদি পরিকল্পিত অস্থিরতা সৃষ্টির মাধ্যমে সেটাকে ধারাবাহিকভাবে পতিত করা যায়, তাদের উদ্যোগ-আয়োজনের উপায়কে পরিকল্পিতভাবে সীমিত করা যায়, রাষ্ট্রীয় নীতির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগকে সঙ্কুচিত করা যায়, তবে বিশাল একটা বেকার জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করা যায়, যারাও সমাজের ন্যূনতম ভারসাম্যটুকু ভেঙে ফেলে সমাজকে পতিত করতে বিশাল ভূমিকা রাখে। এভাবেই পরিকল্পিতভাবে শিক্ষাকে একটা সমাজের জন্য দুর্যোগ বা দূষণের মতো করে তোলা যায়, যেটাতে বাংলাদেশের মতো বহু দেশ আজ আক্রান্ত।

৫.

পরিকল্পিতভাবে ঘনিয়ে তোলা শিক্ষাসংকটের বাইরের যেই আধুনিক ও উন্নত শিক্ষা-গবেষণার আমরা ভক্ত, তাকে এক ধরণের নৈর্ব্যক্তিক বা নিরপেক্ষ বা নরম্যাটিভ সত্তায় স্থাপন করে আমরা অধিকাংশ সময় এর দিকে তাকাই এবং গুণগান করি। এখানে মান, আবিষ্কার এবং উদ্ভাবনই মোক্ষ। শিক্ষার এমত সত্তা নির্ধারণের কারণে সেই মোক্ষ অর্জনের নেতিবাচক ভূমিকার দায় যখন আমরা তাকে একটুও না দিই, সেটাকে নিয়ে ফেলি রাজনীতি-অর্থনীতির ঘাড়ে সম্পূর্ণত, আর এমন একটা ধারণাগত বাতাবরণ ও তত্ত্ব যখন নির্মাণ হয়ে যায় – তখন মান, আবিষ্কার ও উদ্ভাবনও অনেকখানি ব্যক্তিবিযুক্ত সত্তায় পর্যবসিত হয়; যেন সে-ও কোনো স্বয়ম্ভু সত্তা, তারও যেন কোনো স্রষ্টা বা পরিচালক বা নিয়ন্ত্রক নেই। এমন পরিস্থিতিতে **শিক্ষায় সৃষ্ট জ্ঞান, মান ও**

উদ্ভাবন স্বয়ং যখন ব্যক্তির সত্তাকে ধারণ করে যেই জগৎ-প্রাণ-প্রকৃতি তার বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করা হয়, তখনও এর উদ্ভাবক থাকতে চায় নৈর্ব্যক্তিক – নিমজ্জিত হতে চায় আরো আরো মানে, আরো উদ্ভাবনে! সে মনে করে এর মাধ্যমেই তার কর্তৃক পয়দাকৃত জ্ঞান-মান-উদ্ভাবন দ্বারা সৃষ্ট নয়া সংকট তারই কৃত নয়াতর জ্ঞান ও উদ্ভাবনের মাধ্যমেই ক্রমাগতভাবে দূর হতে থাকবে! এটাকেই সে মনে করে জগতে তার ও তার প্রজাতির স্বাভাবিক এবং অনিবার্য সারভাইবাল প্রসেস! এভাবে জ্ঞান, মান ও উদ্ভাবনও হয়ে পড়ে একটা চক্র বা দুষ্টুচক্র, যে চক্র সারা জগতের জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে জগতের সর্বনাশ প্রতিরোধের লক্ষ্যে জগৎকে আরো আরো মান ও উদ্ভাবন সৃষ্টির দিকেই ক্রমাগত প্রলুব্ধ ও চালিত করতে থাকে এবং এভাবে আরো সম্মিলিত সর্বনাশের দিকে ধাবিত হতে থাকে। তার এই চলমানতা যে আগের চেয়েও ক্রমাগত সামষ্টিক বিপর্যয় আর সংকটের দিকে – সেটা নির্ণয় করাও, এমনকি ভবিষ্যদ্বাণী করাও তখন তার কাছে এক বৃহৎ উদ্ভাবন, জ্ঞান, মান ও সাধনার নাম! অনিবার্যভাবে এই চক্রের নিয়ন্ত্রণ থাকে পৃথিবীর গুটিকয় দেশের হাতে, এবং আরো সুনির্দিষ্টভাবে বললে গুটিকয় রাজনৈতিক- অর্থনৈতিক মোড়লের হাতে, যারা কিনা আবার এই শিক্ষারই উৎপাদ বা আউটপুট! কিন্তু শিক্ষা ও জ্ঞানতত্ত্ব এমনভাবে নির্মাণ করা হয়, যেন তারা কোনো শিক্ষার উত্তরাধিকার কখনো বহন করে এখানে আসেননি! যেন তারা এমন এক সত্তা, যার অর্থনীতি-রাজনীতি ছাড়া আর কোনো ব্যাখ্যা নেই!

এভাবে পৃথিবীর শিক্ষাদুর্যোগগ্রস্ত মানুষের কাছে এই দেশগুলো থাকে মোক্ষ এবং সারা জগতের সম্ভাবনাবনময় সকল বীজ এবং তা থেকে সৃষ্ট লতা-গুল্ম-বৃক্ষ-মহীরূহের অনিবার্য গন্তব্য হয়ে ওঠে তারা। তারা সত্য ভালোবেসে, বস্তু-ধারণা-প্রাণ-প্রকৃতিকে ভালোবেসে কেন্দ্র থেকে প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে সকল জ্ঞান সদা মান বজায় রেখে অর্জন করে-করে অনিবার্যভাবে একমুখী প্রবাহ তৈরী করে। জগৎসভায় তারা পুরস্কৃত হয়, দৃষ্টান্ত হয়, তাদের জ্ঞানের সকল তথ্য সংরক্ষিত হয়। কিন্তু তাদের সকল জ্ঞানের সম্মিলিত গতিপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণের ভার যখন গিয়ে পড়ে উপরোক্ত চক্রের হাতে, তখনো তারা তার দিকে তাকানোটা তাদের কাজ বলে মনে করে না। এ পরিস্থিতিতে ক্ষুদ্র কেন্দ্রের বাইরে বিশাল প্রান্তের মাটি, প্রান্তের বাতাস, প্রান্তের প্রাণ-প্রকৃতির মাঝ দিয়ে যে জ্ঞান আহরিত হয় সেই জ্ঞানই হয়ে ওঠে প্রান্তের সেই বিশাল জ্ঞানক্ষেত্র ধ্বংসের হাতিয়ার! এভাবে পুরো পৃথিবীটাই

নৈর্ব্যক্তিক ও বিমূর্ত জ্ঞান-মানের উৎকর্ষতা অর্জনের ধারাবাহিকতা নিয়ে যেতে থাকে চরম মূর্ত এক ধ্বংসের কিনারের দিকে।

৬

আধুনিক শিক্ষাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে স্পষ্ট হবে যে, কোনো শিক্ষাদর্শন বা লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নয়, একটা চরম কাঙ্ক্ষিত প্রতিপাদ্যকে প্রাণকেন্দ্রে রেখে এর সকল আয়োজন সাজানো হয়েছে। এটা হলো – মানুষ জানে এবং মানুষ পারে। আর এই জানা ও পারার বোধ জগৎ জুড়ে সকল শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে এমনভাবে চারিত করা হয়েছে, এবং যার ফলে এমন একটা বাতাবরণ শিক্ষাজগতে ছড়িয়ে আছে তা হলো, মানুষ সবই জানে বা সবই পারে। বস্তুত শিক্ষার স্নায়ুতে ছড়ানো এই প্রাণস্পন্দন সত্য নয়। সত্য হচ্ছে মানুষ ইতিমধ্যে যতোটা জেনেছে বা পেরেছে তা দিয়েই বুঝেছে যে, জগতে যতো জানা বা পারা যায় ততোই না-জানা বা না-পারার পরিমাণটা বাড়তে থাকে। কারণ নতুন নতুন জানা বা পারার মাধ্যমে তার সামনে আরো বহুগুণ না-জানা বা না-পারার বিষয়টা উদ্ঘাটিত হতে থাকে। কিন্তু এই বিশাল সত্যের প্রকাশ জগতের কোনো আধুনিক শিক্ষা-আয়োজনের মধ্যে এতটুকু স্পষ্ট তো নয়ই, বরং ঠিক তার উল্টো প্রাণপ্রবাহ চরমভাবে চলমান। ফলে মানুষের সকল শিক্ষা, সকল মান, সকল কলা, সকল বিজ্ঞান, সকল উদ্ভাবনের সামষ্টিক সৃজনফল শেষাবধি দানবীয় এক ঔদ্ধত্য, যার মাধ্যমে পৃথিবী নামক তার একমাত্র বাসোপযোগী গ্রহটাকে ক্রমশ ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়া।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষ শিক্ষার প্রাণে এমন প্রতিপাদ্য নির্মাণ করলো কেমন করে? সভ্যতার বর্তমান এই ভয়াবহ সংকট, বস্তুত শিক্ষারই সংকট – সে বিবেচনা থেকে প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রকৃতপক্ষে মানুষ পারে – এই প্রতিপাদ্যের ঠিক বিপরীত প্রতিপাদ্য ছিল, মানুষ পারে না। বিপরীত এই প্রতিপাদ্যকে প্রাণকেন্দ্রে রেখে অতীতে (বলা যায় রেনেসাঁ-পূর্ব কাল পর্যন্ত) যে শিক্ষা-আয়োজন সাজানো ছিল তার উৎস ছিল মূলত ধর্ম, রীতি, বিশ্বাস ও সংস্কার। মানুষের সমাজকে এই শিক্ষা একটা পর্যায় পর্যন্ত এগিয়ে দিলেও শেষাবধি এর অবস্থান এমন হয়েছিল যে, মানুষের কোনো পারা বা কোনো জানাটাকেই সে সহজভাবে গ্রহণ করেনি,

বরং দীর্ঘকাল ধরে তার প্রতি বর্বরতর আচরণ করেছে। **এভাবে না-পারার শিক্ষা একপর্যায়ে মানুষের জন্য এমন দানবীয় শিকলতুল্য হয়েছে যে, আর সেই শিকল মানুষকে এতো ভুগিয়েছে এতো পিছিয়েছে যে, বহু ত্যাগের বিনিময়ে সেই শিকল যখন সে ছিঁড়েছে তখন ঠিক তার বিপরীত প্রতিপাদ্যে গিয়ে হাজির হয়েছে-যে – মানুষ সবই পারে, সবই জানে। মানুষের এ এক নিরন্তর ট্র্যাজেডি! এই উদ্ধত শিক্ষা-প্রতিপাদ্য এবং তার দ্বারা সৃষ্ট বোধ ও নির্মিতিই সভ্যতার সংকটের মূলে।**

বস্তুত আমি কিছুই জানি না, কিছুই পারি না – এই বোধ ছিল মানবসত্তার জন্য ভয়াবহ রকমভাবে অবমাননাকর। এই বোধ মানুষকে প্রকৃতপক্ষে এক ধরণের জড়বস্তুতে পরিণত করে। অন্যদিকে আমি সব পারি, সব জানি – এই বোধের মনোস্তাত্ত্বিক পরিণতি শেষাবধি ঔদ্ধত্য এবং এটা অনিবার্য। এই বোধ সত্যও নয়, সার্থকও নয়। প্রকৃতপক্ষে আমি যতো পারি আমার না-পারার পরিমাণ ততো বাড়তে থাকে – এই সত্যবোধই আজ আমাকে সংযত করতে পারে। এটা মনোস্তত্ত্বের বিষয়, শিক্ষামনোস্তত্ত্বের বিষয় – রাজনীতি-অর্থনীতি বা পুঁজিবাদ-সাম্যবাদের বিষয় নয়। শিক্ষার প্রাণকেন্দ্রের প্রতিপাদ্য এই মনোস্তত্ত্বের ভিত্তিতে নির্মাণ আজ মানবসভ্যতা রক্ষায় অতি জরুরী।

টীকা

*একটা বিশেষ সময়ে মানুষ হিসাবে আমাদের যা কিছু আবশ্যকীয় চাহিদা থাকে, কিংবা বিশেষ কিছুর প্রতি আগ্রহ বা ভালোলাগা তৈরী হয়, খেয়াল করলে দেখা যাবে, সেগুলোর ক্ষেত্রে একটা সাধারণ ঐক্যও তৈরী হয়। এরকম সাধারণ ঐক্য তৈরী হওয়া কোনো বস্তুগত বা অবস্তুগত চাহিদা কিংবা আকাঙ্ক্ষা বা ভালোলাগা নিয়ে যখন কোনো সমাজ বা রাষ্ট্র তার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে তখনই সেগুলো হয়ে ওঠে সেই বিশেষ সময়ের জন্য সেই সমাজ বা রাষ্ট্রের ইতিবাচক প্রপঞ্চ।

*চাহিদার বিষয় হিসাবে শিক্ষা যে-কোনো সমাজে অন্যতম কাঙ্ক্ষিত প্রপঞ্চ। এটা শুধু চাহিদা নয়, এর প্রতি মানব সমাজের রয়েছে দীর্ঘকালের শ্রদ্ধা ও ভক্তি। পাশাপাশি শিক্ষার শক্তি প্রচলিত মূল্যবোধে ধাক্কা দেয় বলে এর প্রতি সমাজের নানা স্তরে কমবেশী ভীতিও কাজ করে। কিন্তু সার্বিকভাবে এটা হলো সেই প্রপঞ্চ, যার প্রতি ভয় থেকে কেউ বিরোধীতা করলেও তাদের প্রতি সামাজিক-সামষ্টিক নেতিবাচক দৃষ্টি অজান্তেই তাদেরকে ভিতর থেকে দুর্বল করে তুলতে থাকে। ফলে অনেকসময় শিক্ষা বিস্তার হয়ে পড়ে সমাজের অন্য সকল ইতিবাচক প্রপঞ্চের বিস্তার থেকে বিচ্ছিন্ন এবং এককভাবে কর্তৃত্বপরায়ণ।

‘মাঙ রাহা হায় হার ইনসান, রোটি কাপড়া মাকান’
–ভুট্টোর রাজনৈতিক বর্ক্তৃতা থেকে

জুলফিকার আলী ভুট্টো ও পিপলস্ পার্টি: দক্ষিণ এশিয়ায় রাজনৈতিক সংস্কার চেষ্টার এক খণ্ডাংশ

আলতাফ পারভেজ

অতি সংক্ষেপে ভুট্টোর রাজনৈতিক জীবন

অখণ্ড পাকিস্তানের রাজনীতির ‘নায়ক’ কিংবা ‘খলনায়ক’ যাই বলা হোক তাঁকে জুলফিকার আলী ভুট্টো চ্যালেঞ্জ নিতে পছন্দ করতেন। অনেক সময় চ্যালেঞ্জ নিজেই তৈরি করে নিতেন। ১৯৬৬ সালে ‘তাসখন্দ চুক্তি’র পর আইয়ুব খানের সঙ্গে মতভিন্নতায় মন্ত্রিত্ব ছাড়ার সময় ভুট্টোর সামনে চারটি বিকল্প ছিল। প্রথমত, রাজনীতি ছেড়ে দেয়া; দ্বিতীয়ত, মুসলিম লীগের কোনো একাংশে যুক্ত হওয়া; তৃতীয়ত, তুলনামূলকভাবে মুসলিম লীগের চেয়ে প্রগতিমুখী ন্যাপে যুক্ত হওয়া; কিংবা নিজে একটা দল গড়া। শেষের বিকল্পটি ছিল অপেক্ষাকৃত ঝুঁকিবহুল। ভুট্টো সেদিকেই ঝুঁকে পড়েন।

দক্ষিণ এশিয়ার প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলগুলোর মাঝে পাকিস্তান পিপলস পার্টি বা পিপিপি এই অর্থে বিশিষ্ট যে, দলটির জন্ম হয়েছিল কেবল একজনের জনপ্রিয়তাকে পুঁজি করে।

জন্মের পর প্রথম নির্বাচনেই পিপিপি পশ্চিম পাকিস্তানে প্রধান রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি পায়। ভুট্টোর জীবদ্দশায় এই দলের প্রভাব বেড়েছে কেবল। গত প্রায় ৫৫ বছরের পথ চলায় এই দলের প্রতিনিধিরা এ পর্যন্ত পাকিস্তানে চার বার প্রধানমন্ত্রিত্ব করেছে। কিন্তু ১৯৭৭ সালে সামরিক বাহিনীর হাতে ভুট্টোর ক্ষমতাচ্যুতি এবং দু’বছর পর তাঁর ফাঁসির বিরুদ্ধে পিপিপি

তাৎক্ষণিকভাবে শক্ত প্রতিরোধ গড়তে পারেনি। অথচ ভুট্টো ছিলেন এই দলের প্রাণপুরুষ। আবার এ-ও সত্য, ভুট্টোর কন্যা বেনজীর পরবর্তীকালে তুমুল জনপ্রিয়তা নিয়ে দেশটির ক্ষমতায় ফিরে এসেছিলেন। পিপিপির এরকম উত্থান-পতনময় ইতিহাসের ব্যাখ্যা কী? সেই ইতিহাসে জুলফিকার কীভাবে মিশে আছেন? জুলফিকার ও তাঁর দলের ইতিহাস দক্ষিণ এশিয়ার জন্য কেন বিশেষভাবে তাৎপর্যময়? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের পিপিপির দীর্ঘ ইতিহাসের একটা সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনার ভেতর দিয়ে যেতে হবে। তবে আপাতত এই আলোচনা দলটির প্রথম ১০ বছরের মধ্যে (১৯৬৭-৭৭) সীমিত থাকছে।[১] পিপিপিকে জুলফিকার আলী ভুট্টো ঐ এক দশকই কেবল ভালোভাবে সময় দিতে পেরেছিলেন।

ভুট্টো প্রতিদ্বন্দ্বী তৈরি করতেন

পাঁচ দশক পেরোনো রাজনৈতিক দলের সংখ্যা দক্ষিণ এশিয়ায় কম নয়। তবে তাদের মধ্যে অল্প কয়টি জাতীয় এবং আঞ্চলিক প্রভাব ধরে রাখতে পারছে। সেই তালিকায় পিপিপি আছে। জাতীয় পরিষদের ৩৪২ আসনের মধ্যে ৫২ আসন নিয়ে পিপিপি এখনো পাকিস্তানের তৃতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দল। সিন্ধুতে প্রাদেশিক সরকার পরিচালনা করছে তারা। এই লেখা তৈরির সময় কেন্দ্রীয় সরকারে অংশীদার হিসেবেও ছিল তারা। ভুট্টোর নাতি বিলওয়াল দেশটির তরুণতম পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন।

পিপিপির এতসব সফলতার ভিত্তি মুখ্যত জুলফিকার আলী ভুট্টো। দল তাঁকে জনপ্রিয় করেনি– বরং তাঁর জনপ্রিয়তাই ছিল এই দলের প্রতিষ্ঠাকালীন বড় পুঁজি। পাকিস্তানে এবং দক্ষিণ এশিয়ার অন্যত্রও অনেক সময় কোনো বিশেষ ব্যক্তির জনপ্রিয়তাকে পুঁজি করে রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব ঘটেছে এবং টিকে থাকছে। তবে পিপিপি একই সঙ্গে পাকিস্তানের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ইতিহাসের এক মোড় পরিবর্তনেরও ফসল।

সিন্ধুতে জন্মের পরই ভূ-স্বামী (‘ওয়াডেরা’) জগতে ভুট্টো দেখেছেন এক ব্যক্তিকে ঘিরে একটা গোত্রের রাজনৈতিক প্রভাব তৈরি হয়। এই অভিজ্ঞতা ভুট্টোর মাঝে একটা স্বাভাবিক সাহস তৈরি করে– যা পিপিপির প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে। আবার পশ্চিমের উন্নত শিক্ষা তাঁকে দিয়েছিল বৈশ্বিক মনন। কূটনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি, পাঠাভ্যাস ও রাজনৈতিক পণ্ডিতদের সঙ্গে যোগাযোগ দক্ষতায় ভুট্টো ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁর সময়ের অনেকের চেয়ে বেশ

এগিয়ে। যা তাঁর নেতৃত্বের প্রতি আন্তর্জাতিক সমীহ এনে দিয়েছিল।

এসব বৈশিষ্ট্য আবার ভুট্টোর মাঝে এমন এক অহং তৈরি করে যা পিপিপির জন্য ক্ষতিকর হয়েছিল। তাঁর জন্যও ক্ষতিকর হয়। ভুট্টোর অহং প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পছন্দ করত। তিনি প্রবলভাবে 'আমিত্ব' প্রভাবিত মনস্তত্ত্বে ভুগতেন। এরকম অহং থেকে তিনি জেনারেল আইয়ুব খানকে প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। অথচ ঐ জেনারেলের প্রধান সহযোগী হিসেবে তিনি সাত-আট বছর ১০টি মন্ত্রণালয়ে[২] মন্ত্রিত্ব করেছেন।

আইয়ুব খানকে প্রতিপক্ষ ধরে নিয়েই ১৯৬৬-এর জুন থেকে দল গড়ায় মনোযোগ দেন ভুট্টো। আইয়ুব চলে যাওয়ার পর ভুট্টো নতুন করে প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁজে পেতেও দেরি করেননি। আওয়ামী লীগকে প্রতিপক্ষ তৈরি করে ভুট্টোর দল পাকিস্তানের খণ্ডিকরণেও ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু তাতে ব্যক্তি ভুট্টো ক্ষতিগ্রস্ত হননি। বরং ১৯৭২ সালে খণ্ডিত সীমান্ত নিয়ে গড়ে ওঠা 'নিজ দেশে' কার্যত শক্ত কোনো রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীই ছিল না ভুট্টোর। তবে নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে আবারও তিনি প্রতিপক্ষ তৈরিতে নামেন। এভাবে ভুট্টো চরিত্রের সবচেয়ে সবল দিক তাঁর জন্য বিপদ ডেকে আনতে শুরু করে। সেই বিপদের দিনে দল তাঁকে বাঁচাতে পারেনি। দলকে সেভাবে প্রস্তুতও করেননি তিনি।[৩] পিপিপি ও ভুট্টোর ইতিহাস তাই একটা রাজনৈতিক ট্রাজেডির মতো। দক্ষিণ এশিয়ায় কুলীন রাজনীতির এরকম ট্রাজেডি অবশ্য এটাই একমাত্র নয়।

পিপিপির তাত্ত্বিক ভিত্তি তৈরির কাজে ভুট্টো বেছে নিলেন পূর্ব পাকিস্তানের একজনকে

পাকিস্তান পিপলস পার্টি বা পিপিপি যখন পাকিস্তানে ক্ষমতাসীন হয় তখন দেশটিতে এই দলের বড় রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকলেও রাজনৈতিক সংকট ছিল। আর তা হলো প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি নিয়ে। যে ধরনের সংকটের কারণে পাকিস্তানের জনবহুল প্রদেশ 'পূর্ব পাকিস্তান' ইতিমধ্যে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। স্বায়ত্তশাসন ও আঞ্চলিক বৈষম্যের সমস্যা পশ্চিম পাকিস্তানে ১৯৭১ সালের পরেও রয়ে যায়। দেশের বাকি চারটি প্রদেশ ছিল পশ্চিমাংশে এবং পাঞ্জাবের আধিপত্যে অপর তিন প্রদেশে হতাশা ও অসন্তোষ ছিল। বেলুচ ও পাখতুনরা তাদের এলাকায় বাড়তি স্বায়ত্তশাসন প্রত্যাশা করছিল। এসব বঞ্চনাবোধ ছিল ১৯৪৭-এ অদ্ভুত ধাঁচে ভারত ভাগেরই জের।

পাকিস্তানের জন্য এসময় ঔপনিবেশিক সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের আমূল সংস্কারও জরুরি ছিল। পিপিপি এসবের সমাধানে হাত দেবে বলে প্রত্যাশা ছিল সবার। সংস্কারে আগ্রহীরা দেশব্যাপী পিপিপিতে যোগ দিচ্ছিল তখন। ভুট্টো ও পিপিপির উত্থান পশ্চিম পাকিস্তানে একটা রাজনৈতিক মোড় পরিবর্তনের সুযোগ তৈরি করে। কিন্তু সেই সুযোগ প্রত্যাশা মতো কাজে রূপান্তর করা যায়নি। প্রায় একই ধরনের অভিজ্ঞতা দেখা যায় দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশেও।

আইয়ুবের এক দশকের উন্নয়ন পাকিস্তানে যে ধন বৈষম্য ও গুটিকয়েকের হাতে সম্পদের পুঞ্জিভবন ঘটিয়েছিল– সেটা ঐ সরকারের মন্ত্রী হিসেবে ভুট্টোর অজানা ছিল না। আইয়ুবকে পরিত্যাগের পর তিনি প্রাথমিকভাবে কাউন্সিল মুসলিম লীগ কিংবা ন্যাপের ওয়ালি খানদের সঙ্গে কাজ করার কথা বিবেচনা করেছিলেন। তবে এসব দল তাঁকে নেতা হিসেবে মেনে নিতে কিছুটা দ্বিধান্বিত ছিল। আবার এসব দলের আঞ্চলিক ধরনে ভুট্টোও তাদের নিয়ে দ্বিধান্বিত ছিলেন।[৪] রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকে ভুট্টোর মাঝে প্রবণতা ছিল– তিনি আঞ্চলিক রাজনীতিতে সীমিত থাকতে অনিচ্ছুক ছিলেন। ১৯৫৪-এর পর কিছুদিন তিনি সিন্ধুতে 'ওয়ান স্কিম' বিরোধী আন্দোলনে শরিক হলেও পরে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিলেন।[৫] ভুট্টো নিজের জন্য জাতীয় চরিত্রের রাজনৈতিক ভূমিকার কথাই ভেবেছেন সবসময়। এমনকি, কেবল দেশের রাজনীতি নয়– আঞ্চলিক ভূরাজনীতির প্রতিও ভুট্টোর প্রবল আগ্রহ ছিল।

পিপিপি গড়ার আগে মাঝে মাঝে বিভিন্ন সভা-সেমিনারে ভুট্টো সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যেসব বক্তব্য রাখতেন শহুরে বুদ্ধিজীবীদের সেটা বিশেষভাবে আকর্ষণ করত। পিপিপির সমাজতান্ত্রিক আবরণ পাওয়ার পেছনে শহুরে এই ভাবুকদের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বা অবদান ছিল। যা স্মৃতিচারণ আকারে পাকিস্তানের রাজনৈতিক সাহিত্যে আজও বেশ দেখা যায়।

তৃতীয় বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের পাশাপাশি শহুরে সর্বহারা এবং গ্রামীণ দরিদ্রদের কথাও ১৯৬৭ থেকে ১৯৭০ সময়ে হামেশা ভুট্টোর ভাষণে উঠে আসত। আইয়ুব ও ইয়াহিয়া খানকে 'খলনায়ক' হিসেবে সামনে রেখে নিজের রাজনৈতিক সত্তাকে বিকশিত করতে হলে গ্রাম-শহরের গরিবদের বিপন্নতার কথা বলা সেই সময়ের সবচেয়ে কার্যকর রাজনৈতিক কৌশল ছিল এবং ভুট্টো

ঠিক তাই করেন। আইয়ুব খানের মন্ত্রিসভা ছাড়ার পর থেকে নতুন দল গড়ার মাঝের সময়টিতে (জুন ১৯৬৬–নভেম্বর ১৯৬৭) ভুট্টো পাকিস্তানের সমাজকে জানা বোঝার বাড়তি সময় পান। তিনি বুঝতে পারছিলেন অর্থনৈতিক বঞ্চনা সমাজের প্রধান দ্বন্দ্ব হয়ে আছে। আবার, সমাজতান্ত্রিক আদর্শের রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গেই এসময় ভুট্টোর দেখা-সাক্ষাৎ হচ্ছিল বেশি। এসবের ফল হিসেবে সামাজিক বিপ্লবমুখী অবস্থান গ্রহণ করেন তিনি। এই রাজনৈতিক অবস্থান যতটা কৌশলগত ততটা নীতিগত ছিল না বলে দলটির পরবর্তী ইতিহাস প্রমাণ করেছে, যা একটু পর এই আলোচনায় আমরা দেখব। তবে পরবর্তীকালে পিপিপিতে ভূ-স্বামীদের যে আধিক্য ও প্রভাব দেখা যায়– ১৯৬৭ সালের সূচনা পর্বে সেটা ছিল না।

১৯৬৭-এর সেপ্টেম্বরে ভুট্টো প্রথম ঘোষণা দেন নতুন একটা দল আসছে। সেই ঘোষণা পরিণতি পায় ঐ বছরের নভেম্বর-ডিসেম্বরে। দল গঠনের শুরুতে ভুট্টো যাঁদের সঙ্গে পান তাদের মধ্যে রাজনীতিবিদ ছিলেন কম– বেশি ছিলেন জালালুদ্দীন আব্দুর রহিম ও ড. মুবাশ্বের হাসানের মতো বামপন্থী বুদ্ধিজীবী। ৩০ নভেম্বর লাহোরে পিপিপির উদ্বোধনী অধিবেশনে মঞ্চে যে তিনজন ছিলেন তাঁরা হলেন রহিম, ভুট্টো এবং মালিক হামিদ সরফরাজ[৬]। দুদিন চলে এই সম্মেলন।

১৯৭০-৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানকেন্দ্রীক বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে ভুট্টোর রাজনৈতিক অবস্থানের বিবরণ অনেকেরই জানা। সেই ইতিহাসের সঙ্গে বেশ বেমানানভাবে পিপিপিতে ভুট্টোর প্রধান রাজনৈতিক সহযোগী হিসেবে দেখা যায় দেশের পূর্বাংশের একজনকে। দলের দ্বিতীয় প্রধান এই সংগঠক ছিলেন জালালুদ্দিন আব্দুর রহিম– যিনি রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে জে এ রহিম নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষ মেদিনীপুরের হলেও ভারত ভাগকালে তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানে চলে এসেছিলেন। তাঁর পিতা বিচারপতি আব্দুর রহিম একসময় মাদ্রাজ হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি ছিলেন। জালালুদ্দিন রহিমের বোন নিয়াজ ফাতেমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর।

জে এ রহিম, মুবাশ্বির হাসান ও খুরশিদ হাসান মীরকে ভুট্টো সম্ভাব্য নতুন দলের তাত্ত্বিক দলিলপত্র তৈরির দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আর গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিবিদদের দলে টানার কাজ দেয়া হয় লাহোরের বড় ভূ-স্বামী গোলাম

মোস্তফা খার ও সিন্ধুর রসুল বক্স তালপুর[৭] প্রমুখকে। দলের উদ্বোধনী সম্মেলনের আহ্বায়ক ছিলেন পাঞ্জাবের আইনজীবী নেতা মালিক আসলাম হায়াত। উপরের সংক্ষিপ্ত চিত্র থেকে কিছু ইঙ্গিত মেলে– পিপিপির শুরুর কালের প্রতিনিধিদের মধ্যে আইনজীবী, শ্রমিকনেতা, ছাত্র সংগঠক, বুদ্ধিজীবী এবং প্রাক্তন আমলাদের বৈচিত্র্যময় সমাবেশ ঘটেছিল। তখনকার মূলধারা প্রচারমাধ্যমে পিপিপির আবির্ভাব সম্পর্কে নেতিবাচক খবরই ছিল বেশি। যেমন, *দ্য পাকিস্তান টাইমস* পিপিপির উদ্বোধনী অধিবেশন সম্পর্কে হাস্যরসাত্মক ভাষায় নিম্মোক্ত প্রতিবেদনে লেখে: .."সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের অনেকে আশ্চর্য হয়ে ভাবছিলেন এটা কি রাজনৈতিক দলের সম্মেলন হচ্ছে নাকি স্নাতক শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পুনর্মিলনী হচ্ছে...!"

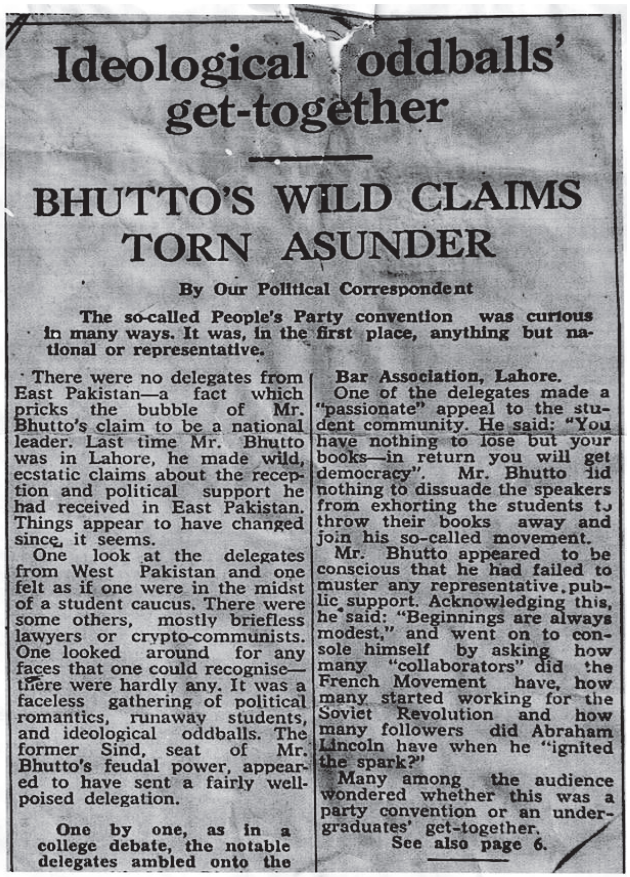

Ideological 'oddballs' get-together

BHUTTO'S WILD CLAIMS TORN ASUNDER

By Our Political Correspondent

The so-called People's Party convention was curious in many ways. It was, in the first place, anything but national or representative.

There were no delegates from East Pakistan—a fact which pricks the bubble of Mr. Bhutto's claim to be a national leader. Last time Mr. Bhutto was in Lahore, he made wild, ecstatic claims about the reception and political support he had received in East Pakistan. Things appear to have changed since, it seems.

One look at the delegates from West Pakistan and one felt as if one were in the midst of a student caucus. There were some others, mostly briefless lawyers or crypto-communists. One looked around for any faces that one could recognise—there were hardly any. It was a faceless gathering of political romantics, runaway students, and ideological oddballs. The former Sind, seat of Mr. Bhutto's feudal power, appeared to have sent a fairly well-poised delegation.

One by one, as in a college debate, the notable delegates ambled onto the

Bar Association, Lahore.

One of the delegates made a "passionate" appeal to the student community. He said: "You have nothing to lose but your books—in return you will get democracy". Mr. Bhutto did nothing to dissuade the speakers from exhorting the students to throw their books away and join his so-called movement.

Mr. Bhutto appeared to be conscious that he had failed to muster any representative, public support. Acknowledging this, he said: "Beginnings are always modest," and went on to console himself by asking how many "collaborators" did the French Movement have, how many started working for the Soviet Revolution and how many followers did Abraham Lincoln have when he "ignited the spark?"

Many among the audience wondered whether this was a party convention or an undergraduates' get-together.

See also page 6.

পিপিপি যে কারণে সমাজতন্ত্রকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে

এটা এখন কিছুটা বিস্ময়কর ঠেকতে পারে, জন্মের সময় পিপিপি আন্তর্জাতিক জোট 'সোশ্যালিস্ট ইন্টারন্যাশনাল'-এর সদস্য ছিল। ভূ-স্বামী পুত্র এবং অক্সফোর্ড ও বার্কলেতে পড়া ভুট্টো-যে তখন সমাজতন্ত্রপন্থী একটা দল গড়তে গেলেন সেটা খুব দূরদর্শী ও অনিবার্য এক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ছিল।[৮] ভুট্টোর লেখনিতে এর নানান ধরনের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এক জায়গায় তিনি বলছেন,

> আমার ২১তম জন্মদিন ছিল ১৯৪৮ সালের ৫ জানুয়ারি। আমি তখন লস এঞ্জেলসে। লারকানা থেকে আমার নামে দুটো উপহার এল। একটা ছিল বেশ দামি– পাঁচ খণ্ডে নেপোলিয়নের জীবনী। উলিয়াম মিলিগান স্লোয়েন (William Milligan Sloane)-এর লেখা। অপর উপহারটি ছিল সেই তুলনায় কম দামি। কার্ল মার্কসের *কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার*। নেপোলিয়নের জীবনী থেকে আমি বুঝেছি ক্ষমতার রাজনীতি। আর ঐ পুস্তিকা থেকে আমি গ্রহণ করেছি দারিদ্র্যের রাজনীতিকে।[৯]

ভুট্টোর সচেতন পর্যবেক্ষণ ও উচ্চশিক্ষা তাঁকে দেশের পশ্চিমাংশের রাজনৈতিক চাহিদা বুঝতে সাহায্য করেছিল ঐসময়। আরেকটি ডান বা মধ্যপন্থী দলের জন্য পাকিস্তান আগ্রহী ছিল না তখন। যদিও বরাবরই এরকম বিতর্ক ছিল এবং আছে, সমাজতন্ত্রের প্রতি নিবিড় আনুগত্য নয়– ভবিষ্যতের সম্ভাব্য রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সযত্ন হিসাব নিকাশ থেকে পিপিপিকে ভুট্টো ঐ ধরনের আদর্শের মোড়ক দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে পরে ভুট্টোর বক্তব্য ছিল,

> আমরা আসলে সাম্যবাদী ধাঁচের সমাজতন্ত্রের কথা বলি না। আমরা সেই 'সমাজতন্ত্র'-এর কথা বলি যা আমাদের বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খায়।[১০]

আবার এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ-ও বলেন,

> 'আমি পাকিস্তানে সাম্যবাদের ঢেউ থামিয়েছি এখানে সমাজতন্ত্রকে এনে।'[১১]

এরকম বিচিত্র ধাঁচের বক্তব্য থেকে অনুমান করা যায়– ভুট্টো 'সমাজতন্ত্র'কে গ্রহণ করেছিলেন প্রতিবাদী রাজনীতি হিসেবে সমাজ বদলে দেয়ার কর্মসূচি আকারে নয়– যেমনটি ভাবছিলেন পিপিপিতেই মুবাশ্বির হাসান, জালালুদ্দিন আব্দুর রহিম, শেখ মোহাম্মদ রশীদ প্রমুখ।

উপরের ব্যক্তিদের মধ্যে প্রথম দুজন দলে ভুট্টোর গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক সংগ্রহ ছিলেন। তৃতীয়জনকে ন্যাপ থেকে নিয়ে এসেছিলেন রহিম। হাসান ছিলেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে পিএইচডি। ১৯৬৭ সালে একাডেমিক

কাজে ঢাকায় এসে রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনায় বেশি ঝুঁকে পড়েন। পিপিপিকে সামনে রেখে পাকিস্তানে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার চিন্তা ছিল তাঁর। অন্যদিকে রহিম পড়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে এবং পেশাগত জীবনে কাজ করেছেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে। চিন্তাচেতনায় বামপন্থী ঝোঁক ভুট্টোর ঘনিষ্ঠ করে তাঁকে।[১২] আর, রশীদ ছিলেন পাঞ্জাবে মাঠ পর্যায়ের একজন শ্রমিক-কৃষক সংগঠক। পরে এদের বিপরীত আদর্শের মানুষদেরও ভুট্টো দলে টেনেছেন অবাধে। যাদের মধ্যে ছিলেন হাফিজ পীরজাদা, মাখদুম জামান প্রমুখ। শেষোক্তজন ছিলেন সিন্ধুর প্রভাবশালী পীর ও ভূ-স্বামী। সংখ্যালঘু থাকলেও দলে দ্রুত তাদের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলতে থাকেন ভুট্টো। বিশেষ করে যখন দেখতে পান– বামপন্থীরা নানান বিষয়ে তাঁর সঙ্গে ভিন্নমত প্রকাশ করছে। ১৯৭২ সালের ৩০ নভেম্বর ও ১ ডিসেম্বর পিপিপির তৃতীয় সম্মেলনে ভুট্টোর সঙ্গে দলের বামপন্থীদের ভিন্নমত ও দূরত্ব প্রকট হয়ে ওঠে।

সমাজতন্ত্র থেকে 'মুসাওয়াতে মুহাম্মদী': ভুট্টোর আদর্শিক কলাকৌশল

পিপিপি শুরুতে দলীয় যেসব তাত্ত্বিক প্রচার-পুস্তিকা প্রকাশ করে তাতে বামপন্থী ধারার নেতা রহিম ও মুবাশ্বির হাসানের চিন্তার প্রবল প্রভাব দেখা যায়। পিপিপি তাদের প্রথম সম্মেলনে বিভিন্ন বিষয়ে ১০টি দলিল প্রকাশ করে।[১৩] পাকিস্তানের মূলধারার রাজনৈতিক ঐতিহ্যে এটা মনোযোগ আকর্ষণী ঘটনা ছিল। সেনাবাহিনী দেশটিতে যে দীর্ঘসময় রাষ্ট্র পরিচালনায় আধিপত্য বিস্তার করে রাখতে পারল তার বড় কারণ ছিল রাজনৈতিক দলগুলো সেখানে প্রতিষ্ঠান আকারে বিকশিত হতে না পারা। পিপিপি শুরুতেই প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেদের আবির্ভাবের ইঙ্গিত দিয়েছিল। যার একটা প্রমাণ উদ্বোধনী দিনের রাজনৈতিক দলিলপত্রগুলো।

তাদের প্রাথমিক রাজনৈতিক দলিলগুলোতে সামগ্রিক বক্তব্য আবর্তিত হচ্ছিল ইসলাম, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র– এই তিন ধারণা ও তাদের সমন্বয় ঘটানোর প্রচেষ্টার ওপর ভিত্তি করে। যদিও উদ্বোধনী কোনো দলিলে 'ইসলামী সমাজতন্ত্র' শব্দযুগল ছিল না– কিন্তু পিপিপি নেতৃত্ব ইসলাম ও সমাজতন্ত্রের সমন্বয়ের চেষ্টায় ছিল এবং এরকম চেষ্টার নাম দেয়া হয়, 'মুসাওয়াতে মুহাম্মদী' বা হযরত মোহাম্মদ (সা.)–এর সাম্যবাদী ধ্যানধারণার চর্চা। পিপিপি ও ভুট্টো এসময় 'ইসলামী সমাজতন্ত্র'-এর ধারণাকে ন্যায্যতা দিতে

এ-ও বলছিল, খোদ জিন্নাহ ১৯৪৮ সালের ২৬ মার্চ চট্টগ্রাম সফরকালে পাকিস্তানের জন্য এই আদর্শের কথাই বলেছিলেন প্রথম। তথ্যটি মিথ্যা ছিল না। চট্টগ্রামে ওটাই ছিল জিন্নাহ'র প্রথম সফর। সফরের মূল গন্তব্য বন্দর হলেও এখানে জিন্নাহ বিশাল গণসংবর্ধনায় ইংরেজিতে যে ভাষণ দেন তার শুরুতেই বলেছিলেন পাকিস্তানের ভিত্তি হবে 'ইসলামী সমাজতন্ত্র'। পিপিপি জিন্নাহ'র বক্তব্যকে তার কাজে লাগাতে বিলম্ব করেনি। কিন্তু তাদের এরকম সমাজতান্ত্রিক অভিলাষের বিরুদ্ধে ১৯৭০-এর ২৬ ফেব্রুয়ারি ১১৩ আলেম ফতোয়া দেন। ভুট্টো তাঁর উত্তরে বলেন:

> আমি উলেমাদের সম্মান করি। কিন্তু যারা ফতোয়া দিচ্ছে তারা আসলে কাফিরদের স্বার্থে সেটা করছে অর্থের বিনিময়ে। ইসলাম মোটেই সমাজতন্ত্র দ্বারা বিপদে নেই। বিপদে পড়ছে পুঁজিপতি ও ভূ-স্বামীরা আর তাদের পুতুলরা। যারা রাতে ঘুমাতে পারে না। ঘুমের বড়ি খেয়ে যাদের ঘুমাতে হয়। খোদার ইচ্ছা, আমরা এই সামাজিক ব্যবস্থা বদলে দেব। ইসলামী মুসাওয়াতকেই ইংরেজিতে 'সোশ্যালিজম' বলা হয়। যেভাবে 'জনগণের শাসন'কে বলা হয় 'ডেমোক্রেসি'।

বাস্তবে 'মুসাওয়াতে মুহাম্মদী' ছিল পিপিপির প্রাথমিককালে গৃহীত 'সমাজতন্ত্র'-এর নীতি থেকে খুব মৃদুলয়ে পিছু হটার চেষ্টা। ক্ষমতায় আসার আগে পিপিপি বলেছিল:

> দলের নীতির চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো পাকিস্তানে একটা শ্রেণিহীন সমাজে পৌঁছানো। আমাদের সময়ে এটা সম্ভব কেবল সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে। এর অর্থ, নাগরিকদের জন্য আমাদের সত্যিকারের সমতাবাদী অবস্থায় পৌঁছাতে হবে। যেখানে গণতন্ত্রের অধীনে মানুষের মাঝে মৈত্রীর সংস্কৃতি বিকশিত হবে। যে সমাজে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার থাকবে।[১৪]

এরকম অঙ্গীকার অবশ্যই 'মুসাওয়াতে মুহাম্মদী'-এর চেয়ে বেশি কিছু ছিল। ইসলামের সাম্যবাদী চিন্তা যতটা সামাজিক চরিত্রের মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক চিন্তার স্বরূপ ততটাই অর্থনীতির উৎপাদন সম্পর্কে আমূল পরিবর্তনবাদী। তবে ক্ষমতায় এসে ভুট্টো পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উৎপাদন সম্পর্কে আমূল পরিবর্তনবাদী কোনো পদক্ষেপ নেননি– কিছু সংস্কারে হাত দিয়েছিলেন কেবল। পিপিপি সেটাকেই 'মুসাওয়াতে মুহাম্মদী' হিসেবে ধারণা দিচ্ছিল। এর সঙ্গে সমন্বিত করে তারা দলের নির্বাচনী প্রতীক পছন্দ করে তলোয়ার ('জুলফিকার')– যাকে তারা দলের পোস্টারে বলছিল 'জুলফিকার-ই-আলী'। পোস্টারে দেখা যায় ভুট্টো ঘোড়া হাঁকিয়ে চলেছেন– হাতে তাঁর

'জুলফিকার'। সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়েছে স্থানীয় সমাজের জনপ্রিয় এই কবিতা:

> শাহে মরদান শেরে য়াযদান কুয়াতে পরওয়ারদিগার
> লা ফাতাহ ইলা আলি
> লা সাইফ ইলা জুলফিকার
> [মানুষের সম্রাট স্রষ্টার সিংহ খোদার বাহুবল
> আলী ছাড়া জয় নেই
> জুলফিকার ছাড়া তরবারি নেই।]

এভাবে নানান প্রতীকী উপাদানকে ব্যবহার করে পিপিপির তরফ থেকে ইসলাম ও সমাজতন্ত্রের আদর্শিক মিশ্রণের চেষ্টা নির্বাচনী রাজনীতিতে ব্যর্থ হয়েছে বলা যায় না। যেসব দল ভুট্টো ও পিপিপির সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচির বিরোধিতা করেছে, ফতোয়া দিয়েছে তারা সকলে মিলে সত্তরের নির্বাচনে পশ্চিম পাকিস্তানে মাত্র ১৮টি আসন পায়। পিপিপি পেয়েছিল চার গুণের বেশি আসন। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, জনতা সমাজতন্ত্র ও মুসওয়াত-ই-মুহাম্মদী চাইছে। কিন্তু ভুট্টোই ক্রমে সেখান থেকে সরে আসতে থাকেন দক্ষিণপন্থী শিবিরের সহানুভূতি পেতে। সমাজতন্ত্রের কথা বলে নির্বাচনে জেতা দল পিপিপির অধীনে ১৯৭৩-এর সংবিধান প্রণীত হলেও তাতে 'সমাজতন্ত্র' শব্দটা রাখা হয়নি বা রাখা যায়নি। অর্থাৎ পাকিস্তানের রাজনীতিবিদরা জনগণের রায় দ্বারা চালিত হতে প্রস্তুত ছিলেন না– বরং নিজেদের মতাদর্শ এবং রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশ দ্বারা জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছেন। শুরুতে, ১৯৬৬-৬৭ সালে দেশের রাজনৈতিক বাস্তবতা বদলাতে চাইলেও ভুট্টো ক্রমে সেই বাস্তবতার সঙ্গে আপোস করতে থাকেন এবং কখনো কখনো সেই বাস্তবতার সুবিধা নিতে চাইলেন।

সমাজতন্ত্রের ধারণার সঙ্গে মুসওয়াতে-ই-মুহাম্মদীর মিশ্রণের মতোই পিপলস পার্টিতে আরেক মিশ্রণের উদ্যোগ নেয়া হয় ভূ-স্বামীদের সঙ্গে বামপন্থীদের। দ্বিতীয় মিশ্রণের উদ্যোক্তা ভুট্টো নিজেই। প্রথমোক্ত মিশ্রণে ভুট্টো তাত্ত্বিক সহায়তা নেন দলের সংগঠক মুহাম্মদ হানিফ রামে'র। রামেকে সমর্থন দিতেন মাওলানা নিয়াজী। হানিফ রামে ও তাঁর সহযোগীরা গোলাম আহমেদ পারভেজের (১৯০৩-১৯৮৫) দার্শনিক চিন্তা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন।[১৫] পাকিস্তানে ইসলামের সাম্যবাদী দর্শনকে জনপ্রিয় করতে হানিফ রামে বহুভাবে সচেষ্ট ছিলেন।

রাজনীতিবিদরা পাকিস্তানে বহুবার ইসলামের সঙ্গে সাম্যবাদী ধ্যানধারণা

সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন। কখনো আন্তরিকভাবে, কখনো ভোটের কৌশল হিসেবে। দেশটির সর্বশেষ শাসক ইমরান খান তাঁর এরকম চিন্তাকে বলে থাকেন 'রিয়াসাত-ই-মদিনা' (অর্থাৎ মদিনা-রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতার চর্চা)। তবে ধনিকশ্রেণির প্রতিভূ রাজনীতিবিদদের এরকম সমাজতান্ত্রিক অভিলাষ সর্বত্র সমানভাবে ভোটে দরিদ্রদের আকর্ষণ করে কি না সেটা এক প্রশ্ন। পিপিপির ইতিহাস থেকে এ বিষয়ে একটা উদাহরণ তুলে ধরা যেতে পারে।

১৯৭০-এর নির্বাচনে এই দল সবচেয়ে ভালো ফল করে পশ্চিম পাকিস্তানের সবচেয়ে সমৃদ্ধ প্রদেশ পাঞ্জাবে– দারিদ্র্যতাড়িত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে নয়। পিপিপি জাতীয় পরিষদে পাঞ্জাবের ৮২টি আসনের ৬২টিই পায়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের জন্য নির্ধারিত ২৫টি আসনের মধ্যে পায় মাত্র ১টা। একইভাবে প্রাদেশিক নির্বাচনে পাঞ্জাবের ১৭৯টি আসনের মধ্যে এই দল পায় ১১২টি আসন। আর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রাদেশিক নির্বাচনে ৪০টি আসনের ভেতর পায় মাত্র ৩টি।

পাঞ্জাবে পিপিপি হারায় অপেক্ষাকৃত দক্ষিণপন্থী মুসলিম লীগকে। অন্যদিকে ঐ জাতীয় পরিষদের ভোটে একই মুসলিম লীগ এবং জামায়াত-ই-ইসলামী জেতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে। নির্বাচনী এই ফলের ব্যাখ্যা এটাই দাঁড়ায়– অর্থনৈতিকভাবে তুলনামূলকভাবে সমৃদ্ধ পাঞ্জাবে ভুট্টোর 'ইসলামী সমাজতন্ত্রে'র ধারণা যতটা আবেদন তৈরি করে– দারিদ্র্যপীড়িত ট্রাইবাল এলাকায় ততটা করেনি। এর ব্যাখ্যা এ-ও দাঁড়ায়, ভোটে দরিদ্ররা আদর্শের চেয়ে পুরনো গোত্র বন্ধন ও ধর্মীয় বিবেচনাকে গুরুত্ব দিয়েছে বেশি– তারা 'ইসলাম-পছন্দ' দলসমূহের ছত্রছায়ার বাইরে আসেনি। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে জামায়াতের নির্বাচনী শ্লোগান ছিল: 'আল্লাহর সমর্থক বা বিরোধীকে বেছে নিন।' পাঞ্জাবে এরকম শ্লোগান খুব বেশি কাজ করেনি– সমাজের ভেতর এখানকার নাগরিক বুদ্ধিজীবীদের দীর্ঘদিনের মননচর্চার কারণে। নগরায়ন ও শিল্পায়নের কারণে এখানে শ্রমজীবী ভোটারদের কাছে পিপিপির অর্থনৈতিক বক্তব্য গুরুত্ব পেয়েছিল।

পিপিপির উদ্বোধনী অধিবেশনে পূর্ব-পাকিস্তানের কোনো প্রতিনিধি ছিল না

জেনারেল আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে কী কী ঘটেছে তার অনেক তথ্য এখন বাংলাভাষীদের জানা। কিন্তু সে

তুলনায় অনেকখানি অজানা পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্র-তরুণদের আইয়ুববিরোধী সংগ্রামের বিবরণ। সেসময় ঐ অঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা মিশ্রিত বক্তব্যের কারণে লাহোর ও সিন্ধুর ছাত্রনেতা এবং আইনজীবীদের কাছে সম্ভাবনাপূর্ণ এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে হাজির হয়েছিলেন জুলফিকার ভুট্টো। এই ছাত্র সমাজের জমায়েত ক্ষমতা নতুন দল করার কাজে ভুট্টোর জন্য নীরব উৎসাহ হিসেবে কাজ করেছে।[১৬] দল হিসেবে আবির্ভাবের পর ছাত্রদের মাঝে প্রভাব বাড়াতে পিপিপি তাৎক্ষণিকভাবে কোনো একক ছাত্র সংগঠনকে তাদের 'অঙ্গ সংগঠন' করেনি। বরং লাহোর ও সিন্ধুর সকল ছাত্র সংগঠনকে আইয়ুবের বিরুদ্ধে নামানোর চেষ্টায় ছিল। এতে সকলের মাঝে প্রভাব ধরে রাখতে ভুট্টোর সুবিধা হয়। এরকম ছাত্র, আইনজীবী, শ্রমিক সংগঠক ও বুদ্ধিজীবীদের মাঝেই ভুট্টোর প্রাথমিক সাংগঠনিক বিচরণ ছিল। অথচ মৃত্যুর আগে ভুট্টো তাঁর দলকে অনেকাংশে ভূ-স্বামীদের হাতে সঁপে যান।

পিপিপির প্রথম সম্মেলনে প্রায় ৩০০ প্রতিনিধি হাজির ছিল। প্রতিনিধিদের ৬০-৭০ জন ছিলেন দেশের তখনকার সময়ের প্রভাবশালী বামপন্থী বুদ্ধিজীবী। লাহোরের ৪-কে গুলবার্গে মুবাশ্বির হাসানের বাড়িতে এই সম্মেলন বসে। এই বাড়ি থেকেই আইয়ুব আমলে ভুট্টো প্রথম গ্রেফতার হন। রাজনৈতিক দলের সম্মেলন বাড়ির ভেতর করতে হচ্ছিল– কারণ নতুন দলের আবির্ভাবকে বাধাগ্রস্ত করতে সরকার লাহোরের বিভিন্ন স্থানে ১৪৪ ধারা জারি করে জনসমাবেশে বাধা দিয়ে রেখেছিল। প্রতিনিধিদের ১০ রূপি রেজিস্ট্রেশন ফি দিয়ে পিপিপির সম্মেলনে যোগ দিতে হয় উদ্বোধনের দিন– যাঁদের প্রায় অর্ধেক ছিলেন নারী। সেসময়কার পাকিস্তানে নারীদের মাঝে রাজনৈতিক সচেতনতার উচ্চহার নির্দেশ করে এই তথ্য। তবে বিস্ময়করভাবে পিপিপির উদ্বোধনী অধিবেশনে পূর্ব-পাকিস্তানের কোনো প্রতিনিধি ছিল না।[১৭] সম্মেলনে লাহোরের প্রতিনিধিই ছিল বেশি। অনেকে এসেছিলেন পর্যবেক্ষক হিসেবে, কিন্তু ভুট্টোর ভাষণ ও অপর প্রতিনিধিদের বক্তব্যে উৎসাহিত হয়ে নবীন দলে যুক্ত হয়ে যান। আইনজীবী নেতা খুরশীদ হাসান মীর ছিলেন এরকম একজন। সম্মেলনের শুরু হয়েছিল কোরান তেলাওয়াত ও কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে। সম্মেলনের অন্যান্য অধিবেশেনও শুরু হয় কবিদের ১-২টি স্বরচিত কবিতা পড়ে। উদ্বোধনী অধিবেশনের অন্যতম কবি ছিলেন আসলাম গুরুদাসপুরী। পরে তাঁকে ছয় মাসের হুলিয়া মাথায় নিয়ে পালিয়ে থাকতে

হয়। অপরাধ ছিল, তিনি লিখেছিলেন 'উঠঠো দোস্তোঁ গুলামি সে বাগাওয়াত কর দো' (ওঠো বন্ধুরা, দাসত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো।) এসব টুকরো টুকরো দৃশ্য থেকে এটা অনুমান করা দুঃসাধ্য নয়– পিপিপির আবির্ভাব কীভাবে সে সময়ের পশ্চিম পাকিস্তানের শহুরে সচেতন সমাজকে বিদ্যুতায়িত করেছিল।

সম্মেলনের পরপর ভুট্টো দেশব্যাপী সাংগঠনিক সফরে বের হন। সেসময় তিনি ঢাকায় এসেছিলেন। এখানে পিপিপির একটা দপ্তরও খোলা হয়। তবে সেটা বছর না ঘুরতেই বন্ধ হয়ে যায়। পিপিপির পূর্ব-পাকিস্তান শাখায় যারা মূল দায়িত্বে ছিলেন– যেমন, চেয়ারম্যান হিসেবে মাওলানা নুরুজ্জামান এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে জয়নাল আবেদীন– তারা সত্তরের নির্বাচনের আগেই দল পরিবর্তন করেন।[১৮]

এভাবে 'জাতীয়' দল করতে যেয়েও ভুট্টো মূলত আঞ্চলিক দলেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েন। আওয়ামী লীগ ও ন্যাপও তখন ক্রমে আঞ্চলিক চরিত্র নিচ্ছিল। আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে এবং বিভক্ত ন্যাপের এক অংশ পূর্ব পাকিস্তানে, অপর অংশ বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। জাতীয় রাজনীতির গতিধারা সবকিছু এভাবে 'পূর্ব' ও 'পশ্চিম'-এর মাঝে ভাগ করে ফেলছিল একাত্তরের বহু আগে থেকে। বিশেষ করে ন্যাপের বিভক্তি পাকিস্তানে জাতীয়ভিত্তিক রাজনৈতিক দলের সম্ভাবনাকে চূড়ান্তভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

ন্যাপ গড়ে উঠেছিল পুরো পাকিস্তানের বিভিন্ন জাতিসত্তার তুলনামূলকভাবে প্রগতিবাদী রাজনীতিবিদদের নিয়ে। ১৯৫৭ সালে গঠিত হওয়ার মুহূর্তে এটা ছিল পাকিস্তান জুড়ে সবচেয়ে বিস্তৃত বহুত্ববাদী দল। একে পাকিস্তানের সামাজিক গণতন্ত্রীদের প্রথম বড় ধরনের মঞ্চও বলা যায়। পিপিপি যে বছর গঠিত হয় সেই ১৯৬৭ সালে ন্যাপ ভাঙ্গে। তবে তার আগে প্রায় এক বছর অনানুষ্ঠানিকভাবে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে ছিল ন্যাপের দুটি ধারা। যা পিপিপির জন্য রাজনীতিতে জায়গা করে নিতে বিশেষ সুবিধার হয়।[১৯] তবে পূর্ব-পাকিস্তানে দলকে প্রসারিত করতে পারেননি ভুট্টো। উল্টো দিকে দেশের পশ্চিমাংশে, বিশেষ করে লাহোর ও সিন্ধুতে ছাত্র ও শ্রমিকদের মাঝে পিপিপির অবস্থান তৈরি করতে পারা ছিল ভুট্টোর জন্য তাৎক্ষণিক সফলতার পরিচায়ক। মুখতার রানা, জিয়াউদ্দিন বাট, মাহমুদ বাবর প্রমুখ শ্রমিক নেতা পিপিপিকে

তাদের কাজের মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার শুরু করেন এসময়। এরা অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা শেষ করে শ্রমিক রাজনীতিতে যুক্ত হয়েছিলেন উচ্চতর আদর্শবাদের প্রেরণায়। মুখতার রানা ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের স্নাতক এবং একই সঙ্গে বস্ত্রকল খাতের শ্রমিক সংগঠক। এরকম মেঠো নেতাদের সঙ্গে পাওয়ার কারণেই সত্তরের নির্বাচনে পিপিপি লাহোর ও সিন্ধুতে ভালো আসন পায়।[২০] লাহোরে ১৯৭০ নাগাদ পিপিপির প্রায় ১৫০টি কার্যালয় হয়ে গিয়েছিল।

এ পর্যায়ের ব্যতিক্রমী একটা ঘটনা হলো লাহোর ও সিন্ধুর ভূ-স্বামীরা প্রাথমিক অনাগ্রহ কাটিয়ে দ্রুত পিপিপিতে যুক্ত হতে শুরু করেছিল। পিপলস পার্টির মঞ্চে ক্রমে একই সঙ্গে দেখা যেতে থাকে সমাজতন্ত্রের প্রতি অনুরাগী তরুণদের পাশাপাশি সামন্তপ্রভুদের। দলের ওপর নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে ভুট্টো সচেতনভাবে এটা করছিলেন নাকি পাকিস্তানের পটভূমিতে সমন্বয়বাদী একটা দল গড়তে চেয়েছেন – সে বিষয়ে আজও পাকিস্তানে বিতর্ক চলছে।

আইয়ুব আমলে ভূস্বামী ও পুঁজিপতিরা ছিল পাকিস্তানের প্রধান দুই কুলীন সামাজিক শক্তি। ভুট্টো শেষোক্তদের যত বিরোধী ছিলেন প্রথমোক্তদের ক্ষেত্রে তত নন। ভূস্বামী ও মধ্যবিত্ত শহুরে পেশাজীবীদের একত্রে রেখে তিনি প্রাথমিকভাবে একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে কিছু পদক্ষেপ নিতে চেয়েছিলেন। বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণির বিপরীতমুখী স্বার্থের একটা যৌথতা (coalition of interests)-র চেষ্টা ছিল তাঁর কিছু ব্যবহারিক পদক্ষেপে। দলীয় নেতা হানিফ রামের এরকম একটা তত্ত্ব দ্বারা ভুট্টো তাঁর এসব পদক্ষেপকে ন্যায্যতা দিতেন যে, আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদকে মোকাবিলায় দেশের ভূস্বামী ধনীদের কাছে পেতে হবে। এই বিবেচনা থেকে সামন্ত ভূ-স্বামীদের ভুট্টো দলের প্রধান সমর্থক ভিত্তি বানাতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন ক্রমে।

ভুট্টো মনে করতেন ভাবাদর্শ ছাড়া শহুরে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সমাজের হাতে এমন সম্পদ নেই যা দ্বারা তারা রাজনীতির যুদ্ধে এগিয়ে যেতে পারে। এরকম বুদ্ধিজীবী সমাজ নিজ মননশীলতার জোরে তাঁর অনুগতও হবে কম– যেমনটি হবে ভূস্বামীরা। তাছাড়া সামন্তপ্রভুদের সমাজ পরিচালনায় প্রাথমিক কিছু অভিজ্ঞতা রয়েছে– যা শহুরে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের নেই। ভূ-স্বামী গোষ্ঠী একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের অতটা মিত্রও নয়– যতটা শহুরে শিল্পপতিরা।

হানিফ রামের উপরোক্ত ধাঁচের তত্ত্বায়ন ভুট্টোকে শেখ রশীদসহ দলের অতিবাম অংশকে মোকাবিলায় আদর্শিকভাবে সহায়তা দিয়েছিল। যদিও তিনি বামদের সবাইকে দল ছাড়া করেননি। এই যৌথতার একটা কৌতুকপ্রদ ফলাফল দেখা যায় মাঠ পর্যায়ে। সেখানে দুই বিপরীতমুখী ঐতিহ্য থেকে আসা কর্মীদের পিপিপির জন্য কাজ করতে দেখা যেত। যাদের একাংশ এসেছিল মুসলিম লীগ করার অভিজ্ঞতা নিয়ে– অপর অংশ আসে বামপন্থী সংগঠন করার ঐতিহ্য থেকে। সভা-সমিতিতে দেয়া ভুট্টোর বক্তব্যের আক্রমণাত্মক ভাষা ও তেজোদীপ্ত ভঙ্গী উভয়ধারার কর্মীদের পছন্দ ছিল।[২১] আপাত বিপরীতমুখী এই দুই রাজনৈতিক ধারাকে তাঁর ব্যক্তিগত আকর্ষণ দিয়ে ভুট্টো পিপিপিতে আটকে রেখেছিলেন। গবেষকরা একেই বলেছেন 'ভুট্টোর ক্যারিশমা'![২২] তবে এই ক্যারিশমা বেশি দিন দলের ভেতরকার আদর্শিক ও সাংগঠনিক স্ববিরোধিতা আড়াল করে রাখতে পারেনি। এরকম দ্বিমুখী চরিত্রের সাংগঠনিক অভিমুখের ভবিষ্যত সম্পর্কে হয়ত শুরু থেকে সচেতন ছিলেন ভুট্টো। যে কারণে দেখা যায়, আদর্শগত দিক থেকে দলের মাঝে মধ্যপন্থী বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতেও সচেষ্ট হন তিনি। যার প্রমাণ, দলের নাম বাছাই করতে যেয়ে মধ্যপন্থী অবস্থান নিয়েছিলেন তিনি। প্রাথমিকভাবে নতুন দলের তিনটি নাম প্রস্তাব আকারে এসেছিল: পিপলস প্রগ্রেসিভ পার্টি, পিপলস পার্টি এবং সোশ্যালিস্ট পার্টি অব পাকিস্তান। এর মধ্য থেকে পাকিস্তান পিপলস পার্টি নামটি বাছাই হয়।

এল 'ভুট্টোবাদ'

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী উচ্চকণ্ঠ, ইসলামের মধ্যে সাম্যবাদী উপাদান খোঁজার চেষ্টা এবং ভূস্বামী ও বাম আদর্শের ছাত্র ও শ্রমিক নেতাদের একত্রিত করার রাজনীতিকে পরবর্তীকালে 'ভুট্টোবাদ' নামে অভিহিত করার একটা মৃদু চেষ্টা দেখা গেছে পিপিপির পরিমণ্ডলে। বিশেষ করে, ১৯৮৬ সালে বেনজীর যখন দলকে পুনর্জীবিত করার চেষ্টায় নামেন তখন তিনি এই শব্দটি ব্যবহার করতেন।[২৩] কিন্তু দলের কোনো নেতা ভুট্টোবাদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেননি কখনো। এ থেকে অনুমান করা হয় দক্ষিণ এশিয়ার পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতিতে 'নায়কপূজা' ও 'গোত্রবাদ'-এর যে ঐতিহ্য রয়েছে সে অবস্থান থেকেই জুলফিকার আলী ভুট্টোকে একটা রাজনৈতিক 'মতবাদ' বা 'ইজম'-এর প্রবক্তা হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ভুট্টোবাদ এবং

ভুট্টো-অনুসারীদের একালের মুরুব্বিরা এটা আড়াল করে যে, নিজের জীবদ্দশাতেই জুলফি ভুট্টো:

এক. পিপিপির গণতন্ত্রায়ন ও দলীয় বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন;

দুই. দলের ভেতরকার সবচেয়ে সংগ্রামী ধারাটিকে ভিন্নমতালম্বী হিসেবে সহ্য করতে না পেরে দুর্বল করে দিয়েছেন সচেতনভাবে[২৪];

তিন. দলের সকল কাজ তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছা-অনুকম্পার ওপর নির্ভরশীল করে ফেলেছিলেন।

এই তিন পরিণতি শেষ বিচারে পাকিস্তানের রাজনীতিতে ভুট্টোর অস্তিত্বকে ধীরে ধীরে সংকুচিত করে ফেলে। 'ভুট্টোবাদ' এই অর্থেও নতুন কিছু নয়– যখন দেখা যায় প্রধানমন্ত্রী ভুট্টো বেলুচদের স্বায়ত্তশাসনের দাবি থামাতে সেখানে সৈন্য পাঠাচ্ছেন। রাজনৈতিক সমস্যাকে সামরিকভাবে মোকাবিলার এই পদ্ধতি ইয়াহিয়া খান প্রশাসন অনুসরণ করেছিলেন ১৯৭১ সালে এবং পূর্ব-পাকিস্তানে খলনায়কে পরিণত হন। সেই অভিজ্ঞতা জানা সত্ত্বেও ভুট্টো বেলুচিস্তানে প্রথমবারের মতো নির্বাচিত সরকারকে মাত্র ৯ মাসের মাথায় ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে বরখাস্ত করেন। বরখাস্ত করার আগে নয় মাসের মধ্যে এমন নয় দিনও ছিল না যখন ভুট্টো-সরকার বেলুচিস্তানের সরকারকে কোনো না কোনোভাবে চাপ প্রয়োগ বা হুমকি-ধমকি দেয়নি বা অসহযোগিতামূলক আচরণ করেনি। নিজেদের নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত হতে দেখে বেলুচিস্তানের মানুষের পুরনো ক্ষোভ সশস্ত্র হতে থাকলে ভুট্টো সেখানে সামরিক বাহিনী পাঠান এবং চার বছর তারা সেখানে নিজ দেশের জনগণের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে। জেনারেল জিয়া-উল-হক ক্ষমতায় এসে সেই অভিযান বন্ধ করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে তাতে সরকারি হিসেবেই ৫ হাজার ৫০০ বেসামরিক মানুষ মারা যায়। বেলুচ সমাজের সেই ক্ষত আজও শুকোয়নি। অঞ্চলটি এখনো যে পাকিস্তানের মূলধারা থেকে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতায় ভুগছে তার বড় দায় ভুট্টোরও। তিনি সেখানকার রাজনৈতিক ইতিহাসে চিরতরে আরেক 'ইয়াহিয়া খান' হয়ে আছেন।

১৯৭২ থেকে পরবর্তী ৫ বছরে দলের প্রধান নেতার এরকম পদক্ষেপসমূহ ক্রমে পিপিপিকে রাজনৈতিক পরিসরে একাকী করে ফেলেছিল এবং এই দলের সঙ্গে আপোসের রাস্তা বিরোধী দলের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এরকম

অবস্থা যে-কোনোভাবে রাজনৈতিক সংকট তৈরি করতে পারত; ১৯৭৭ নাগাদ সেটাই ঘটে।

দল হিসেবে পিপিপির শক্তিমত্তার প্রথম বড় ধরনের পরীক্ষার সময় হাজির হয় ১৯৭৭ সালে। সেই পরীক্ষায় এই দল এবং তার নেতৃত্ব কী করছে সেটা এক নম্বর টীকায় উল্লেখিত বর্তমান লেখকের প্রকাশিতব্য বইয়ের অন্য এক অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সামরিক অভ্যুত্থান রুখতে পারেনি পিপিপি এবং পিপিপি দলীয় নেতা ভুট্টোকেও বাঁচাতে পারেনি। এ থেকে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, ঠিক কবে থেকে এই দলে অবক্ষয়ের শুরু?

এর উত্তর দিন-তারিখ ধরে দেয়া কঠিন। তবে ঠিক কী কী কারণে অবক্ষয় ঘটতে শুরু করেছিল সেসব শনাক্ত করা সম্ভব। ভুট্টোর বিশ্বাস, চর্চা ও রাজনৈতিক আচরণের মাঝেই এরকম সব প্রশ্নের উত্তর পাব আমরা। ভুট্টো যেভাবে দলকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন সেভাবে পিপিপি গড়ে উঠেছে। তিনি চেয়েছেন তাঁর জনপ্রিয়তার ওপর পিপিপি দাঁড়িয়ে থাকুক। দলকে তিনি প্রাতিষ্ঠানিকতা পেতে দেননি। বামপন্থী ও সামন্তবাদী– উভয়ধারার ব্যক্তিদের দলে এনেছিলেন। শিগগির আত্মঘাতী প্রমাণিত হয় এটা। সময় যত গড়িয়েছে এই দুই ধারার দূরত্ব বেড়েছে এবং ভুট্টো ক্রমে শেষোক্তদের দিকে হেলে পড়ে দলের গণচরিত্র দুর্বল করেন এবং সমাবেশ ক্ষমতা কমিয়ে ফেলেন। এভাবে দলের সংগ্রামী ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান তিনি। এটা এ-ও মনে করিয়ে দিচ্ছিল যে এই ভুট্টোই একসময় আইয়ুব খানের কনভেনশন মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এবং তিনি সেই রাজনীতিতেই ফিরছেন হয়ত। রাষ্ট্রযন্ত্র হাতে থাকার সময় নিজের সম্ভাব্য জনবিচ্ছিন্নতা টের পাননি তিনি। কারাজীবন শুরুর পরই কেবল সেটা উপলব্ধিতে আসে তাঁর।

দলে নির্বাচনে অনাগ্রহী ছিলেন ভুট্টো

রাজনৈতিক দলের শক্তির জায়গা হলো তার কর্মসূচি ও নেতৃত্বের আকর্ষণী ক্ষমতা। পিপিপির দুটোই ছিল শুরুতে। কিন্তু ধীরে ধীরে এই দল তার প্রতিষ্ঠাকালের প্রতিশ্রুতি থেকে সরতে শুরু করে। যাত্রা মুহূর্তে দল বলেছিল 'ইসলাম আমাদের বিশ্বাস, গণতন্ত্র হবে আমাদের ব্যবস্থা এবং সমাজতন্ত্র হবে আমাদের অর্থনীতি।' ক্রমে প্রথমটি কেবল সক্রিয় থাকে– শেষের

দুটোকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। উল্টো ভুট্টোর চরম কর্তৃত্ববাদী এক ইমেজ তৈরি হতে শুরু করে– যা তাঁকে রাজনৈতিকভাবে বন্ধুহীন করে ফেলছিল। পিপিপির এসব দুর্বলতা ধরা পড়ে ১৯৭৭ সালে বিরোধী দলের আন্দোলনের মুখে। ঐ সময় মুবাশ্বির হাসানসহ দলটির পুরনো বামধারা ভুট্টোকে পরামর্শ দিচ্ছিল শ্রমিক ও কৃষক সমাবেশীকরণের মাধ্যমে বিরোধী পিএনএ'র আন্দোলন মোকাবিলার জন্য। ভুট্টো তা করেননি বা সে পদক্ষেপের জন্যও হয়ত তখন দেরি হয়ে গিয়েছিল। পাকিস্তানের গবেষক মালিহা লোদি মনে করেন, ১৯৭১ সালে দেশের পূর্বাংশ হারানোর পর ভুট্টো পশ্চিমাংশের জনগণকে আর শ্রেণিগতভাবে বিভাজিত করতে চাননি– বরং জাতীয় ঐক্য ও পুনর্গঠনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। বামধারার বাড়তি সমাবেশীকরণ দেশকে আবার সামরিক অভ্যুত্থানের সুযোগ করে দেবে বলে শঙ্কিত ছিলেন ভুট্টো। ভুট্টোর মাঝে সবসময় অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা হারানোর নীরব ভীতি কাজ করত।[২৫] কিন্তু দলীয় দলিলপত্রে সমাজতন্ত্রের ডাক দিয়ে– বাস্তবে দলের ভেতর বামপন্থীদের নিয়ন্ত্রণে রেখে দেয়ায় কার্যত ঐসব সংগঠকদের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব তৈরি হয়। ১৯৭২-এর মে মাসে সাধারণ সম্পাদক জে এ রহিম ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন, দলে সমস্যা হচ্ছে। সমস্যা আসলে ১৯৭০-এর নির্বাচনের সময় ভূস্বামীদের ব্যাপক হারে মনোনয়ন দেয়া থেকে শুরু হয়। নবপর্যায়ের সমস্যার কারণ হিসেবে রহিম যা বলছিলেন, 'অনেকে দলে যোগ দিলেও দলের কাজে আগ্রহী নয়। আবার দলে সদস্য সংখ্যা বাড়লেও তাদের সমন্বয় করা যাচ্ছে না– কারণ সমন্বয় করার মতো নেতৃত্ব গড়ে তোলা যাচ্ছে না দলের ভেতর নির্বাচন করতে না পারার কারণে।'[২৬]

পিপিপিতে প্রতিষ্ঠাকালীন সম্মেলনে চেয়ারম্যান পদ ছাড়া আর কোনো পদে নির্বাচন হয়নি। চেয়ারম্যান পদেও ভুট্টোর 'নির্বাচন' পূর্বনির্ধারিত ছিল– কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না তাঁর। এক্ষেত্রে কৌতূহল উদ্দীপক এক দিক হলো পাকিস্তানের রাজনৈতিক ঐতিহ্যে দলের প্রধানকে 'সভাপতি' বা 'প্রেসিডেন্ট' বলার রেওয়াজ। কিন্তু ভুট্টো তাঁর পদকে 'সভাপতি'র বদলে 'চেয়ারম্যান' হিসেবে সাব্যস্ত করেন। তাঁর বামপন্থী কর্মীরাও তাঁকে চীনের 'চেয়ারম্যান মাও'-এর আদলে 'চেয়ারম্যান ভুট্টো' বলতে শুরু করেছিল তখন। পিপিপির মুখপত্র হানিফ রামে সম্পাদিত *নুসরাত*-এর একটা সংখ্যায় মাও সেতুঙ ও ভুট্টোর করমর্দনের ছবি ছেপে এমনও শিরোনাম দেয়া হয়, 'এশিয়ার দুই সেরা নেতা চেয়ারম্যান মাও ও চেয়ারম্যান ভুট্টো'। এসময় এমনকি মাও

সেতুঙ-এর ক্ষুদে 'রেডবুক' বা লাল বইয়ের আদলে ভুট্টোর বিভিন্ন বক্তব্য থেকে কিছু উদ্ধৃতি বাছাই করে পকেট আকারের বই প্রকাশ করে পিপিপি। এরকম আয়োজন ভুট্টোর মাঝে এমন এক নেতার মানসিকতা তৈরি করে– যাঁকে কোনো কিছুর জন্য জবাবদিহি করতে হবে না।

১৯৭০-৭১ এ প্রথমে বিরোধী দল এবং পরে ক্ষমতাসীন দল হয়েও পিপিপিতে নির্বাচন না করতে পারার জন্য রহিমদের নেতৃত্বাধীন অংশ পরোক্ষে চেয়ারম্যান ভুট্টোকে দায়ী করছিলেন। কারণ ভুট্টো নানান অজুহাতে দলের ভেতর নির্বাচনকে নিরুৎসাহিত করেন।[২৭] এর একটাই ব্যাখ্যা ছিল তখন– ভুট্টো মনে করছিলেন নির্বাচন হলে দলের ভেতর ভূস্বামীরা কোণঠাসা হয়ে যাবে। আসলে বামপন্থীদের প্রভাবশালী হতে দিতে চাইছিলেন না তিনি। জামায়াত-ই-ইসলামীর প্রাক্তন নেতা মাওলানা কাউসার নিয়াজীকে দলে গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানো নিয়েও ভুট্টোর সঙ্গে রহিমদের বিরোধ বাঁধে। যদিও ভুট্টো মনে করছিলেন আলেমদের সমালোচনা থেকে তাঁকে রক্ষা করতে দলে প্রভাবশালী একজন মাওলানা থাকা দরকার। ভুট্টোর এরকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সেসব বাস্তবায়নে দলের অন্যদের, এমনকি সাধারণ সম্পাদককে সামান্যই অবহিত করতেন। ১৯৭৮ সালে ঐ মাওলানা কাউসার নীয়াজিকেই দেখা যায় নুসরাত ভুট্টোকে নিষেধ করছিলেন জেনারেল জিয়া-উল-হকের বিরুদ্ধে আন্দোলন না করার জন্য। আন্দোলন না করলেই কেবল ভুট্টো ফাঁসি থেকে রেহাই পাবেন এমন ধারণা দিচ্ছিলেন মাওলানা নিয়াজী ও গোলাম মোস্তফা জাতোইসহ পিপিপি নেতৃত্বের একাংশ।[২৮] এই নিয়াজীর বিরোধিতা করেই ১৯৭৪-এ মন্ত্রিত্ব[২৯] ও দল ছাড়তে হয়েছিল জে এ রহিমকে; আর মোস্তফা জাতোই পিপিপি ভেঙ্গে ন্যাশনাল পিপলস পার্টি নামে পৃথক দল গড়েছিলেন।[৩০] ইতিমধ্যে রহিমের কাছাকাছি আদর্শের মুবাশ্বির হাসানও অর্থমন্ত্রিত্ব হারান। দলে কোণঠাসা হয়ে পড়েন একই মতাদর্শের মালিক মেরাজ খালিদ। শেষোক্তজনকে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী করেও ভুট্টো পরে সরিয়ে আনেন এবং দলের জন্য কম প্রভাবশালী কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেন।[৩১] ভুট্টো এমনকি এসময় মধ্য-বাম হানিফ রামেকেও দলচ্যুত করে সাড়ে চার বছর কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করেন। যে দণ্ড থেকে রামে মুক্ত হন জিয়া-উল-হক ক্ষমতায় আসার পর। অথচ পিপিপিতে এরাই ছিলেন ভুট্টোর পর রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও বুদ্ধিবৃত্তিতে সবচেয়ে এগিয়ে। তাদের ক্রম কোণঠাসা এবং অপদস্থ অবস্থা একটা দীর্ঘমেয়াদী বার্তা হিসেবে এসেছিল–

যদিও তাৎক্ষণিকভাবে সেই বার্তা পিপিপি বা পাকিস্তানে সকলের উপলব্ধিতে আসেনি।[৩২] রহিম ও মুবাশ্বির হাসানের অবস্থানচ্যুতি পিপিপির অন্যসকল বাম সংগঠকদের মাঝে ভীতি ও হতাশার সঞ্চার করে। এদের কেউ কেউ তখন দল ছাড়েন, কেউ নীরব হয়ে যান এবং অনেকে নিজেদের পুরনো পেশায় ফেরেন। এই শূন্যতা পূরণ হয় বিপরীত আদর্শের লোকদের দ্বারা।

আমলাতন্ত্র ও সুযোগ সন্ধানীদের প্রভাব বাড়ছিল

১৯৭৫-এর শেষে এসে ভুট্টো বুঝতে পারেন দলের পুনর্গঠন দরকার। এটা যতটা দলের স্বার্থে তিনি ভেবেছিলেন– তার চেয়ে বেশি প্রয়োজন মনে করেছিলেন সামনের নির্বাচনে বিজয়ের জন্য। পুনর্গঠন ভাবনার ফসল হিসেবে ১৯৭৫-এর নভেম্বর থেকে ১৯৭৬-এর জুলাই পর্যন্ত ভুট্টো দেশব্যাপী রাজনৈতিক সফরে বের হন। প্রায় ১৬টি স্থানে কর্মীদের সঙ্গে মিলিত হন তিনি। কিন্তু এইসব সফরে রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কর্মকর্তারা তাঁকে ঘিরে রাখত। ফলে দলের সংগঠকদের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছিন্নতা আর কাটেনি। এমনকি এই সফরের পরপর পিপিপি নির্বাচনকে সামনে রেখে যে ইশতেহার তৈরিতে হাত দেয় তাতে আমলারাই মুখ্য ভূমিকা নেন– আগের নির্বাচনের মতো দলীয় বুদ্ধিজীবীরা নন। পছন্দের আমলাদের কাজে লাগিয়ে ভুট্টো দলের উপদলীয় সংঘাত মেটাতেও চেষ্টা করতেন। বিরোধী রাজনীতিবিদদের হয়রানির কাজেও আমলাতন্ত্রকে ব্যবহার করা হতো। ভুট্টো জেলা পর্যায়ে দলীয় সমাবেশে গেলে তাতে জনসমাগম বাড়ানোর জন্য পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশ দেয়া থাকত। এসব বহুকাল দক্ষিণ এশিয়ার কুলীন রাজনীতির সংস্কৃতি। তবে ভুট্টোর জন্য তা রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার কারণ হয়ে উঠছিল। এরকম রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রশাসক-ভুট্টোকে ক্রমে পাকিস্তানের পুরনো শাসকদের মতো আমলাতন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হয়।

সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রাথমিকভাবে সমালোচনাপূর্ণ। সেসব পর্যালোচনা ও দৃষ্টিভঙ্গি অনেক সময়ই সঠিক ছিল। ঔপনিবেশিক এই কাঠামোর সদস্যরা স্বাধীন দেশেও 'Brown Englishmen' হয়েই থেকে যান। কিন্তু তার বিকল্প হিসেবে এসব প্রতিষ্ঠানের গণতন্ত্রায়ন ও বিকেন্দ্রীকরণের বদলে সেগুলোকে 'পছন্দের লোক' দিয়ে নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে আনাই ভুট্টোর প্রশাসনিক পদক্ষেপের ফল

দাঁড়িয়েছিল। এসব প্রতিষ্ঠানে কাঠামোগত সংস্কারের বদলে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে দলে দলে কর্মকর্তাকে ছাঁটাই[৩৩] এবং সেসব স্থানে বংশবদ ব্যক্তিদের নিয়ে আসার চেষ্টা করেন তিনি। যাতে ঔপনিবেশিক ধাঁচের প্রশাসনিক কাঠামোতে তাঁর ব্যক্তিগত ও দলের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ একচ্ছত্র হয়। তাঁর দিক থেকে এটাই ছিল 'প্রশাসনিক সংস্কার'। তাতে করে পাকিস্তান পুরনো 'প্রশাসনিক রাষ্ট্র' (administrative state) হিসেবেই থেকে যায়। অথচ ১৯৭০-এর নির্বাচনী ইশতেহারে বর্তমান প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে পাল্টাবে বলে কথা দিয়েছিল পিপিপি। সে বিষয় উল্লেখ করে গবেষক মালিহা লোদি লিখেছেন,

> ...তাঁর (ভুট্টোর) লক্ষ্য মোটেই একসঙ্গে তাদের (সামরিক-বেসামরিক আমলাদের) প্রভাব নির্মূল করা ছিল না; বরং তাদের ক্ষমতা খর্ব করে ব্যক্তি হিসেবে তাঁর কর্তৃত্বের অধীনস্থ হতে বাধ্য করাই ছিল লক্ষ্য।...[৩৪]

ভুট্টো যখন নিজের মতো করে এভাবে আমলা নির্ভর হচ্ছিলেন– সাংগঠনিকভাবে দলটি তখন দখল করে নিচ্ছিল নবীন ক্ষমতালোভীরা। ১৯৭৬ সালে পিপিপি সদস্য সংগ্রহের এক নতুন অভিযানে নামে। সদস্য ফি নির্ধারণ করা হয় ৫০ পয়সা। শেখ রশীদ এই কর্মসূচির প্রধান ছিলেন। ২০ ডিসেম্বর জানানো হয়, দলটির সদস্য সংখ্যা এক কোটি পেরিয়েছে। এই সংখ্যা নিয়ে অনেকেই তখন বিস্ময় প্রকাশ করে। তবে এ-ও সত্য ছিল– সুযোগ সন্ধানী প্রচুর মানুষ তখন এই দলে ঢুকে পড়েছিল। *ভিউ পয়েন্ট* নামে পিপিপি সমর্থক তখনকার এক সাপ্তাহিক কাগজ এই বিষয়ে ভুট্টোর নজর কামনা করে বলে 'চেয়ারম্যান যেন আত্মস্বার্থবাদীদের হাত থেকে দলকে হেফাজত করেন।'[৩৫] কিন্তু কার্যত হয়েছিল উল্টো। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে পাঞ্জাবে পিপিপির মনোনয়ন পাওয়াদের ওপর পরিচালিত এক জরিপে[৩৬] দেখা যায় অর্ধেকই তাঁরা দলে যোগ দিয়েছেন ভুট্টো ক্ষমতায় আসার পর এবং সত্তরের নির্বাচনে তারা এই দলের বিরুদ্ধপক্ষ ছিলেন। এদের সংখ্যাগরিষ্ঠই ছিলেন বিভিন্ন স্তরের ভূ-স্বামী। অথচ ১৯৭০-এ পিপিপির প্রথম নির্বাচনী ইশতেহারে ছিল: 'সামন্তীয় ভূমি মালিকদের ক্ষমতা ধ্বংস করতে বড় জোতগুলো ভাঙ্গতে হবে। এটা একটা জাতীয় অপরিহার্যতা।' পিপিপির এসময়কার নেতৃত্বের সামাজিক পটভূমি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় গবেষক মালিহা লোদির সূত্রে পাওয়া নিম্নোক্ত সারণী থেকে।[৩৭]

সারণী: এক

পিপিপির প্রথম সারির ৫০ জন নেতার আর্থ-সামাজিক অবস্থান (১৯৭৫-৭৬)

পেশাগত সামাজিক অবস্থান	সংখ্যা
ভূ-স্বামী	২৭
ট্রাইবাল প্রধান	৬
ব্যবসায়ী ও ঠিকাদার	৫
আইনজীবী, প্রকৌশলী, শিক্ষক ইত্যাদি	৭
'প্রিন্সলি স্টেট' বা দেশীয় রাজ্যের পুরনো শাসক	২
প্রাক্তন সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা	২
ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক	১

ভুট্টোর সঙ্গে বিরোধীদলের স্বাভাবিক সম্পর্কের ঘাটতি

১৯৭১ সালে ভুট্টো ও পিপিপি যখন পশ্চিম পাকিস্তানে ক্ষমতায় আসে তখন তাদের জাতীয়ভিত্তিক কোনো প্রতিপক্ষ ছিল না। জাতীয় পরিষদে পিপিপির ৮১ জন সদস্য ছিল– অথচ ভুট্টোর প্রধানমন্ত্রিত্বের পক্ষে ১০৮ ভোট পড়ে। এই তথ্য সাক্ষ্য দেয়, বিরোধীদলসমূহ তাঁকে সময় দিতে ইচ্ছুক ছিল। তারা দেশে জেনারেলদের শাসনের বিকল্প দেখতে চাইছিল। রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে ভুট্টো এই পরিস্থিতিকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিতে পারতেন। পাকিস্তানের জন্য ঐ মুহূর্তে সেটা ছিল ঐতিহাসিক সুযোগ। ১৯৭২ সালে ভুট্টো যা চাইতেন তাই হতো। কিন্তু ভুট্টো যা করলেন তা হলো, সর্বত্র ব্যক্তিগত পছন্দ ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। তিনি সিন্ধু ও পাঞ্জাবে দলীয় ব্যক্তিদের গভর্নর নিয়োগ দিলেন এই যুক্তিতে যে সেখানে সত্তরের নির্বাচনে

তাঁর দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। একই যুক্তিতে বালুচিস্তানে ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ন্যাপ ও অন্যান্য দলের পছন্দের ব্যক্তিদের গভর্নর পদে নিয়োগ পাওয়ার কথা। সেখানে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। কিন্তু ভুট্টো শেষপর্যন্ত সেখানেও স্থানীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজের ঘনিষ্ঠদের ঐ পদে বসালেন। এভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে তাঁর অঙ্গীকার শুরুতে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে গেল এবং বিরোধী দল তাঁর ওপর আস্থা হারাল। এর আরেক প্রতিক্রিয়া ছিল– ভুট্টো ও পিপিপির হাত থেকে আত্মরক্ষার খাতিরে পরস্পরের আদর্শের দিকে না তাকিয়ে বিরোধীদলসমূহ ক্রমে জোটবদ্ধ হতে শুরু করে। এই প্রক্রিয়াতেই ন্যাপ ও জামায়াতে উলামায়ে ইসলামের মতো সম্পূর্ণ বিপরীত আদর্শের দলকে ১৯৭৭ নাগাদ ভুট্টোবিরোধী এক মঞ্চে দেখা যায়। অথচ ন্যাপ ও পিপিপি ছিল আদর্শগত দিক থেকে অনেকটা কাছাকাছি। কিন্তু ভুট্টোর একলা চলো নীতি ন্যাপকে বিপরীত আদর্শের দলের দিকে ঠেলে দেয়। প্রথাগত রাজনৈতিক দলগুলোকে কোণঠাসা রেখে জনপ্রিয় থাকার কৌশল হিসেবে ভুট্টো ধর্মভিত্তিক শক্তিসমূহকে কাছে টানার চেষ্টা করেন ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বরে আহমদিয়া সম্প্রদায়কে অমুসলমান ঘোষণার দাবি মেনে নিয়ে। এর মাধ্যমে পাকিস্তানে রাতারাতি এই সম্প্রদায়ের লোকরা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিসরে অচ্ছুত হয়ে পড়ে। ফলে তারাও ভুট্টোর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়।

রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ মাত্রই ব্যক্তিগত ক্ষমতার ব্যাপক জবাবদিহিতা। ভুট্টো সেরকম জবাবদিহিতার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন না। ফলে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনই প্রশাসক ভুট্টোর ধরন ছিল। যে কোনো ভাবে রাজনীতিকে এককভাবে নিয়ন্ত্রণের ইচ্ছা পোষণ করতেন তিনি। এর শিকার কেবল বিরোধীদল ছিল না, পিপিপিতেও তার ছাপ পড়ছিল প্রবলভাবে। প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজ দলকে তিনি কম সময়ই সামনে এগিয়ে দিয়েছেন। দলীয় কর্মী সংগঠক নির্বাচনের বেলাতেও যোগ্যতার চেয়ে সামাজিক আত্মীয়তা ও বংশগত যোগসূত্রকে গুরুত্ব দেয়া হতো বেশি। নির্বাচনে মনোনয়নের সময় পিপিপিতে এমনভাবে প্রার্থী ঘোষণা শুরু হয়– যেন দল নয়, ভুট্টো দয়া করে মনোনয়ন দিচ্ছেন। এতে প্রার্থীদের মাঝে যে কোনো অবস্থায় ভুট্টোর প্রতি অনুগত থাকার মনস্তাত্ত্বিক দায় তৈরি হতো। কাউকেই মনে করতে দেয়া হতো না– একান্ত নিজের যোগ্যতায় তিনি মনোনয়ন পাচ্ছেন।

বিরোধী দলকে রাজনীতিতে তৎপরতার স্বাভাবিক সুযোগ দিতেও অনিচ্ছা দেখা যায় ভুট্টোর তরফে। অথচ সেনা-আমলাতন্ত্রের দীর্ঘ ছায়া থেকে মুক্তির জন্য পাকিস্তানে সেটা তখন জরুরি ছিল। বিরোধী দলের প্রতি ভুট্টোর অসহিষ্ণুতায় দেশটির রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে পারস্পরিক আস্থাহীনতা বাড়ে এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল থেকে যায়। রাজনীতিবিদ ভুট্টোর মাঝে এ সময় যেসব প্রবণতার অধিক প্রকাশ দেখা যায় তার মধ্যে ছিল:

–সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের জন্য বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেয়া; বিরোধীদলকে প্রচারমাধ্যমে বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ না দেয়া;

–ভিন্নমতাবলম্বী সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ (এমনকি দলীয়দেরও[৩৮]) গ্রেফতার, নির্যাতন– এমনকি হত্যা। ক্রমে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড নৈমিত্তিক চিত্র হয়ে দাঁড়ায়– যা এমনকি জেনারেলদের সামরিক শাসনেও দেখা যায়নি। বিখ্যাত সাংবাদিকদের মাঝে ভুট্টোর দ্বারা নিপীড়িতদের মধ্যে ছিলেন আলতাফ গরহর (*ডন*), সৈয়দ সরদার আলী শাহ (*মেহরাণ*), সালাউদ্দীন (*জাসারাত*) প্রমুখ।

–বিরোধী দলের জনসভা গুণ্ডাদের দিয়ে ভেঙ্গে দেয়া (যা একসময় আইয়ুব খান করিয়েছিলেন ভুট্টোর জনসভায় ১৯৬৭ সালে![৩৯]);

–ন্যাপের মতো অতি পুরনো ও প্রতিষ্ঠিত বিরোধী রাজনৈতিক দলকে প্রতিনিয়ত দেশবিরোধী শক্তি হিসেবে উল্লেখ করা;[৪০]

–দলীয় কর্মী, সংগঠকদের তরফ থেকে প্রশ্নহীন আনুগত্য চাওয়া; ইত্যাদি।

পিপিপি গঠনের পর প্রথম নির্বাচনে ভুট্টোর ইশতেহারের ভিত্তি ছিল 'সকল ক্ষমতা হবে জনগণের'। কিন্তু উল্লিখিত পদক্ষেপসমূহের মাধ্যমে ভুট্টো কার্যত সকল ক্ষমতা নিজের হাতে রাখতে চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। তাঁর এরকম আচরণের সমর্থকরাই কেবল দলে ও আশেপাশে টিকতে পারছিল। এর ফল হয়েছিল পিপিপি তার কোনো রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক ভুল সম্পর্কে সঠিক সময়ে জানতে পারেনি; সতর্কও হতে পারেনি। বরাবর আত্মশ্লাঘার মধ্যে থাকাবস্থায় ১৯৭৭ সালে দলটি হঠাৎ দেখতে পায়, পায়ের নীচ থেকে জনসমর্থনের জমিন খানিক সরে গেছে। সাবলীল ও সক্রিয় বিরোধীদল যে সরকারি দলের জন্য রক্ষাকবচ হয়ে থাকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি হয়েও ভুট্টো তাঁর সমসাময়িক দক্ষিণ এশিয়ার আরও অনেক নেতার মতো সেটা ভুলে গিয়েছিলেন। আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খানের রাজনীতির সমালোচনা করে তাঁর রাজনৈতিক উত্থান হলেও দ্রুত তিনি নিজে 'ভুট্টো খান'-এ পরিণত হতে থাকেন। ১৯৭৪ সালে লাহোরে ওআইসির সম্মেলনের পরপর তিনি দলের

কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলেন দেশে এক দলীয় ব্যবস্থা পত্তনের। এ নিয়ে আলোচনায় ড. মুবাশ্বির হাসানের মতো কেউ কেউ প্রবল আপত্তি জানিয়েছিলেন।[৪১] ভুট্টোর তরফ থেকে এরকম প্রস্তাব একেবারে আকস্মিক ছিল না। ১৯৬২ সালে আইয়ুব খানকেও একবার তিনি একদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন।[৪২] অথচ এই ভুট্টোই আবার ১৯৬৮ সালে আইয়ুব খান দ্বারা গ্রেফতারের পর আদালতে হলফনামায় উল্লেখ করেন, "গণতন্ত্র হলো খোলা বাতাসে নিঃশ্বাস নেয়ার মতো, বসন্তে ফোটা ফুলের ঘ্রাণের মতো, মুক্তির সুরেলা ধ্বনির মতো– স্পর্শে বোধগম্য সকল সুখানুভূতির মাঝে যে অধিক মূল্যবান।" এরকম সকল বিবরণে ভুট্টোর অনন্য বাকচাতুর্যের সঙ্গে বাস্তব পদক্ষেপের যে ফারাক পাওয়া যায়– সেই রাজনৈতিক স্ববিরোধিতাই তাঁর চরিত্রের প্রধান এক দিক। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে একজন জীবনীকার[৪৩] ভুট্টোকে তুলনা করেছেন গ্রিক পুরাণের দুই মুখ বিশিষ্ট জানুসের সঙ্গে।

এরকম দ্বিমুখিতা ও স্ববিরোধিতাই তাঁর জীবনের উজ্জ্বল ১৯৭২ সালকে বেদনাময় ১৯৭৯ সালে পরিণত করে। ভুট্টোর ক্ষমতায় অভিষেক কালে তিনি বিবেচিত হচ্ছিলেন ত্রাণকর্তা হিসেবে। মাত্র ৫ বছরেই সেই মনোভাব যে উল্টে গেল তার উত্তর রয়েছে তাঁর প্রশাসক জীবনের মাঝে। দক্ষিণ এশিয়ার লোকরঞ্জনবাদী জাতীয়তাবাদের এরকম করুণ নজির ভুট্টো একমাত্র নন। তাঁর সমকালে তো ননই।

ভুট্টো চরিত্রে স্ববিরোধিতার ধারবাহিকতা– তথা ব্যক্তিত্বের বিভক্তিজনিত সমস্যা (split personality) দেখেছি আমরা তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকে। দীর্ঘ প্রায় আট বছর আইয়ুব খানের সঙ্গে কাটিয়ে হঠাৎ তীব্রভাবে তাঁর বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছিলেন ভুট্টো। সত্তরের নির্বাচন শেষে ক্ষমতার দরকষাকষি কালে এবং একাত্তরের ২০ ডিসেম্বর ক্ষমতা লাভের সময় তিনি সরাসরি সেনাবাহিনীর মদদ পান– অথচ ক্ষমতায় বসেই তিন মাসের মধ্যে সেনা ও বিমানবাহিনী প্রধানকে বরখাস্ত করেন। আবার এরকম 'সাহসী' পদক্ষেপের আগে-পরে সবসময় সেনাবাহিনী নিয়ে ভীতিতে থাকতেন। সেই ভয়েরই ফসল ছিল এফএসএফ নামের আধা-সামরিক বাহিনী গঠন। এফএসএফ সেনাভীতির বিপরীতে তৈরি হলেও এর বেশি ব্যবহার দেখা গেছে বেসামারিক প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে। ভুট্টো সশস্ত্র বাহিনীর ওপর

বেসামরিক কর্তৃত্ব চাইতেন– কিন্তু বেলুচিস্তানে সশস্ত্র বাহিনীকে দীর্ঘসময়ের জন্য নির্বিচারে অভিযান চালাতে দিয়েছেন। তাঁর ব্যবহারিক আচরণে স্ববিরোধিতার চূড়ান্ত রূপ দেখা যায় সেনাপ্রধান নিয়োগের ক্ষেত্রেও। সেনাবাহিনীতে তিনি বিশ্বাসভাজনদের খুঁজতেন, অথচ তাঁর সবচেয়ে বিশ্বাসভাজন টিক্কা খানের সুপারিশ অগ্রাহ্য করেই জিয়া-উল-হককে বাছাই করেছিলেন। যার জন্য তাঁকে নির্মমভাবে মাশুল দিতে দেখা যায়।

অতঃপর পাকিস্তানে আরেকটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা

১৯৭৯ সালে ভুট্টোর ফাঁসির পর হতবিহ্বল পিপিপিকে নেতৃত্ব দেয়ার দায় পড়ে তাঁর স্ত্রী নুসরাত ভুট্টোর ওপর। ইতিমধ্যে 'ভুট্টো বাঁচাও আন্দোলন' 'গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে' রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু ১৯৮২ সালে নুসরাতের শরীরে ক্যানসার ধরা পড়ে এবং চিকিৎসার জন্য বাইরে যান তিনি। এরপর ক্রমে দলের নেতৃত্ব আসতে থাকে বেনজীর ভুট্টোর হাতে– যদিও তখনো, অন্তত ১৯৮৩ সালের শেষ দিক পর্যন্ত, নুসরাতই দলের অভিভাবক হিসেবে বহাল ছিলেন।[৪৪]

বেনজীর এই দলে আবার প্রাণ সঞ্চার করেন বটে– কিন্তু তাঁর হাত ধরে পিপিপি সংক্রমিত হয়ে পড়ে দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতির পুরনো ব্যাধিতে। এই 'মডেল'-এ বিশেষ বিশেষ কয়েকটি পরিবার এ অঞ্চলের দেশগুলোর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতার ভরকেন্দ্র হয়ে থাকছে। পিপিপিরও সেই ঘরানায় অভিষেক ঘটে এবং ভুট্টো কন্যা বেনজীর সেখানে দ্রুত 'মোহতারামা' হয়ে যান। আসিফ জারদারীকে বিয়ে করে তিনি 'ভুট্টো-গোত্র'-এর সঙ্গে 'জারদারি গোত্র'-এর অংশীদারত্বের মাধ্যমে পিপিপির প্রভাবের পরিসর খানিকটা বাড়িয়েছেন কেবল।

১৯৬৭ সালে জুলফি ভুট্টো পাকিস্তানের রাজনীতিকে কুলীনদের কবল থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর দলও একই মডেলের গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হয়ে যায়। পিতার ফাঁসির পর বেনজীর দু'বার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে অবশ্যই মোটাদাগে রাজনৈতিক প্রতিশোধ নিয়েছেন– এটা যেমন ভুট্টো বংশের শক্তিমত্তার পরিচায়ক তেমনি এ-ও সত্য, ২০০৭ সালে এই দলের নেতৃত্ব আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে তাঁর পরিবারের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যবস্থা করে যান হার্ভার্ডে পড়া জুলফিকার কন্যা। অথচ তাঁকে, পিতার

মতোই এ অঞ্চলের রাজনীতিতে আধুনিকতার প্রতীক গণ্য করা হতো। সেই ধারাবাহিকতায় বেনজীরের পর তাঁর পুত্র বিলওয়াল দলের নেতৃত্বে আসেন ১৯ বছর বয়সে অক্সফোর্ডের শিক্ষার্থী অবস্থায়। বিলওয়াল শৈশব-কৈশোরে দীর্ঘ সময় পাকিস্তানের বাইরে দুবাই ও লন্ডনে অবস্থানের কারণে ভালো করে উর্দু ভাষাও জানতেন না। অথচ পরিবারতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তাঁকেই দলের নেতৃত্বের মুকুট মাথায় নিতে হয় এবং নামের শেষে 'ভুট্টো' শব্দ রাখতে হয়। পিতৃতান্ত্রিক প্রথায় তাঁর নাম উচ্চারিত হওয়ার কথা শুধু বিলওয়াল জারদারি। কিন্তু তাঁর পক্ষে 'রাজবংশ'-এর পদবী পরিত্যাগ করা সম্ভব হয়নি। তিনি হয়ে উঠলেন 'বিলওয়াল ভুট্টো জারদারি'।

পিপিপির রাজ পরিবার হয়ে ওঠাকে জুলফিকার আলী ভুট্টোর রাজনৈতিক জীবনের সূচনাকালীন অঙ্গীকারসমূহের একরূপ অপমৃত্যু[৪৫] বলা যায়। তবে পাকিস্তানের পটভূমিতে এটা কোনো ব্যতিক্রমী চিত্র নয়। কারণ সেখানে পিপিপির আধিপত্য খর্ব করতে সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র যে দলের অভ্যুদয় ঘটায় সেই নওয়াজ শরীফদের মুসলিম লীগকেও দেখা যাচ্ছে পরিবারতন্ত্রের ধারাবাহিকতায় এগোতে। এই লেখা তৈরির সময় নির্বাসিত নওয়াজ শরীফের পর দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁর কন্যা ও ভাই। শেষোক্তজন প্রধানমন্ত্রীও হয়েছেন। দেশটির অন্যতম প্রগতিশীল দল ন্যাপের নেতৃত্বেরও পালাবদল ঘটছে একটি পরিবারের ভেতর। সেখানে গাফফার খানের পর নেতৃত্বে আসেন পুত্র ওয়ালী খান ও তার স্ত্রী নাসিম ওয়ালী খান। তারপর আসেন তাদের পুত্র আসফান্দিয়ার ওয়ালী খান। এমনকি দেশটিতে ধর্মভিত্তিক দলগুলোতেও একই পথে দলীয় 'মালিকানা'র হস্তান্তর হচ্ছে। মাওলানা ফজলুর রহমানের নেতৃত্বাধীন জামায়াতে উলামায়ে ইসলাম তাঁর হাতে এসেছে পিতা মুফতি মাহমুদের হাত থেকে। দেশটির সামরিক কর্মকর্তারাও কর্তৃত্ব ও অর্থ-বিত্তের বদৌলতে উপরোক্ত প্রক্রিয়াতেই ছোট ছোট রাজনৈতিক ডাইনেস্টির জন্ম দেয়ার চেষ্টা করছেন। এই প্রক্রিয়াতে পাকিস্তান পেয়েছে জেনারেল জিয়া-উল-হকের পুত্র ইজাজুল হক, জেনারেল আইয়ুব খানের পুত্র গওহর আইয়ুব খান ও নাতি ওমর আইয়ুব খানকে। এরকম উদাহরণ দেশটিতে আরও রয়েছে। এরকম ডাইনেস্টিগুলো আসলে পাকিস্তানে 'রাষ্ট্র'-এর এক ধরনের সম্প্রসারিত অংশ। আরও উদারভাবে বললে দক্ষিণ এশিয়ার কুলীন রাজনীতিরই এক বিস্তৃত রূপ।

কিন্তু পাকিস্তানে (এবং দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশেও) গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিকশিত না হওয়ার একটা বড় কারণ হলো এরকম 'ডাইনেস্টি'সমূহের রাজনৈতিক উপস্থিতি ও প্রতাপ। 'নেতৃত্ব'কে এখানে প্রজননবিদ্যার বিষয় করে রাখা হয়েছে– রাজনীতিবিদ্যার বিষয় নয়। কিন্তু এই সামন্তীয় গোত্র-সংস্কৃতি দক্ষিণ এশিয়ার সমাজের এমন এক বাস্তব অবশেষ– যা অগ্রাহ্য করার উপায় নেই। এই গোত্রবাদের শোকাতূর এক শক্ত সাংস্কৃতিক ভিত্তি তৈরি করে দেয় 'শহীদী-আত্মদান'-এর ঘটনা। অন্তত ভুট্টো গোত্রের বেলায় এটা প্রবল সত্য হিসেবে হাজির রয়েছে। জুলফি ভুট্টোর জীবনের 'শেষ অধ্যায়' তারই সাক্ষী হয়ে আছে। সে বিবরণ থাকছে চলতি গবেষণায় অন্যত্র; মূলগ্রন্থে।

টীকা

১. বর্তমান নিবন্ধটি জুলফিকার আলী ভুট্টোর উপর লেখকের গবেষণার একটা অধ্যায় মাত্র। মূল গবেষণাপত্রটি গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হবে শিগগির। ইতিপূর্বে একই গবেষণার আরেকটি অধ্যায় প্রকাশিত হয়েছে *রাষ্ট্রচিন্তা* জার্নালের অষ্টম সংখ্যায় (বর্ষ ৬, সংখ্যা-২)

২. বাণিজ্য, জ্বালানী, বিদ্যুত, জাতীয় সম্পদ, কাশ্মীর, জাতীয় পুনর্গঠন, তথ্য, পর্যটন, সংখ্যালঘু ও পররাষ্ট্র।

৩. ভুট্টোর জীবনের এই রাজনৈতিক ট্রাজেডির সঙ্গে তখনকার দক্ষিণ এশিয়ায় তুলনাযোগ্য দৃষ্টান্ত আছে। যদিও আমরা অপর দেশের সেসব দৃষ্টান্তের আলোচনায় যাব না– কিন্তু এটা বেশ কৌতূহলউদ্দীপক, ভুট্টো যে ধরনের রাজনৈতিক ভূমিকার মাধ্যমে নিজের ভবিষ্যতকে ঝুঁকিতে ফেলেন অপর দৃষ্টান্তসমূহেও প্রায় সেরকমই দেখা যায়।

৪. Maleeha Lodhi, *Bhutto, The Pakistan People's Party and Political Development in Pakistan, 1967-1977,* 1980, p.44, https://bit.ly/30mnOYc

৫. এই 'স্কিম'-এর অধীনে পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশকে একটা প্রদেশ আকারে হাজির করা হয়। ১৯৭০-এ ইয়াহিয়া আবার এই স্কিমের অবসান ঘটান। এই স্কিম নিয়ে পাঞ্জাব ব্যাতীত অন্যান্য প্রদেশে প্রবল আপত্তি ছিল।

৬. মালিক হামিদ সরফরাজ একসময় সোহরাওয়ার্দীরও ঘনিষ্ঠ হিসেবে পাঞ্জাবে আওয়ামী লীগের সমর্থক ছিলেন।

৭. তালপুরকে পরে সিন্ধুর গভর্নর করা হয়।

৮. ঠিক একই সময়, ১৯৬৭ সালে আমরা দেখব ভারতের একাংশে নতুন ধারার কমিউনিস্ট

আদর্শতাড়িত নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলনের তুমুল বিস্তৃতি, পূর্ব-পাকিস্তানে 'পূর্ববাংলা সর্বহারা পার্টি'র গোড়াপত্তন, (তার দু'বছর আগে) শ্রী লঙ্কায় সাম্যবাদী 'জনতা বিমুক্তি পেরামুনা'র আবির্ভাব। এসব ছিল দক্ষিণ এশিয়ায় বিশেষ এক রাজনৈতিক সময়ের প্রকাশ। পশ্চিম পাকিস্তানেও ছাত্র-তরুণদের মাঝে তখন বামপন্থার প্রতি আগ্রহের ঢেউ বয়ে যাচ্ছিল। ভুট্টো সময়ের এই ক্ষুধার জোগান হতে চেয়েছিলেন– নাকি একে মোকাবিলার কৌশল নিয়েছিলেন সেটা আজও প্রবল বিতর্কের বিষয় হয়ে আছে।

৯. Z. A. Bhutto, If *I am Assassinated*, (1979), p. 223

১০. Maleeha Lodhi, Ibid, p.46

১১. *The Times*, London, 12 December1970.

১২. ভুট্টোর মতোই পিতার সূত্রে তিনি রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা পেয়েছিলেন। তাঁর পিতা বিচারপতি আব্দুর রহিম একসময় নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির সভাপতি ছিলেন। রহিম পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা হলেও গোপনে পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। ধারণা করা যায় ভুট্টো যখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন তখনই জে এ রহিমের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে।

১৩. এর মাঝে কয়েকটি ছিল এরকম: 'কেন পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি গঠিত হচ্ছে'; 'কেন একটা নতুন দল এল', 'পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি', 'পাকিস্তানের জন্য কেন সমাজতন্ত্র অপরিহার্য', 'পার্টির ঐক্য প্রসঙ্গে ঘোষণা' ইত্যাদি। দ্বিতীয় দলিলটি ভুট্টো নিজে লেখেন। বাকিগুলো প্রধানত রহিম ও মুবাশ্বির হাসানের তৈরি। দশটি দলিলের সর্বশেষটি ছিল আওয়ামী লীগের 'ছয় দফার উত্তর' নামে। আগের বছরের ফেব্রুয়ারিতে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে *আমাদের বাঁচার দাবি: ছয়দফা কর্মসূচি* নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল। এই দলিলগুলোর সংকলনের জন্য দেখা যেতে পারে: Mubashir Hasan's *Foundation and Policy—Pakistan People's Party*, Masood Printers, Lahore, 1968.

১৪. Pakistan People's Party, *Election Manifesto*, 1970, p.9, 29.

১৫. কোরআন ও সাম্যবাদ বিষয়ে পণ্ডিত গোলাম আহমেদ পারভেজ জিন্নাহ'র ঘনিষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু কট্টর মাওলানাদের সমালোচনার পাত্র হন তিনি। জিন্নাহ'র মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পারভেজও কোণঠাসা হয়ে পড়েন এবং ১৯৫৬ সালে তিনি পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন। পারভেজের মতো ভাবুকরা ইসলামের সাম্যবাদী ঐতিহ্য তুলে ধরতে যেয়ে বিশেষভাবে জোর দিতেন হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বিদায় হজ্জের ভাষণে। যেখানে মহানবী (সা.) বলেছিলেন:

'অন্ধকার যুগের সব কৌলীন্য বিলুপ্ত করা হলো...সব মুমিন পরস্পর ভাই ভাই। আরবের ওপর অনারবের এবং অনারবের ওপর আরবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, সাদার ওপর কালো আর কালোর ওপর সাদার কোনো মর্যাদা নেই। তোমরা এখানে যারা উপস্থিত আছো তারা

অনুপস্থিতদের কাছে (কথাগুলো) পৌঁছে দেবে।'

১৬. পশ্চিম পাকিস্তানে ছাত্র রাজনীতির এই নবতরঙ্গ তৈরি হয় তাসখন্দ চুক্তির পর– ঐ চুক্তির বিরোধিতার মধ্য দিয়ে। সেকারণে এদের 'তাসখন্দ জেনারেশন' নামে অভিহিত করা হয়। তখনকার ন্যাশনাল স্টুডেন্ট ফেডারেশনের বিভিন্ন ধারা এই ছাত্রদের র‍্যাডিক্যাল অংশের প্রতিনিধিত্ব করছিল। ভুট্টোকে তারা তখন দেখছিল আইয়ুব ও ভারত বিরোধী সাহসের প্রতীক হিসেবে। ক্ষমতায় আসার পর ভুট্টোর সঙ্গে ক্রমে এনএসএফ-এর র‍্যাডিক্যালদের দূরত্বের প্রতিক্রিয়া হিসেবে পিপলস্ পার্টি তার ছাত্র শাখা হিসেবে গড়ে তোলে 'পিপলস্ স্টুডেন্ট ফেডারেশন' (পিএসএফ)। এভাবে ক্রমে মধ্য ও বাম ধারার ছাত্র সংগঠনগুলো পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও কোন্দলে লিপ্ত হওয়ার মাঝে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শক্তিশালী হয়ে ওঠে জামায়াতের ছাত্রশাখা ইসলামী জামিয়াত তালিবা (আইজেটি)। এসময় ভুট্টো যত কর্তৃত্ববাদী হয়ে ওঠেন ততই ১৯৭০-এর নির্বাচনে কোণঠাসা হয়ে পড়া রাজনৈতিক রক্ষণশীলরা আবার তরুণদের মাঝে আগ্রহ তৈরি করতে শুরু করে। ছাত্র সংসদ নির্বাচনে তার ছাপ পড়ছিল। ভুট্টোর শাসনামলের বড় এক বৈশিষ্ট্য ছিল– ছাত্র সংসদ নির্বাচন হতে পারছিল অবাধে।

১৭. ফাতেমা ভুট্টো দাবি করেছেন, আইয়ুব সরকার পূর্বপাকিস্তানের প্রতিনিধিদের লাহোরে ঢুকতে দেয়নি। এই দাবি অন্য কোনো উৎস দ্বারা সমর্থিত হয়নি।

১৮. মোশারফ হোসেন, *১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন: বাংলাদেশের অভ্যুদয়*, দ্যু প্রকাশন, ২০২০, পৃ. ১৪৪।

১৯. ন্যাপের বিভক্তিতে দুটি উপাদান কাজ করে প্রধানত। প্রথমত ফাতেমা জিন্নাহ'র বিপরীতে আইয়ুব খানের নির্বাচনে ন্যাপের একাংশের আইয়ুবের প্রতি নমনীয় অবস্থান; দ্বিতীয়ত দলের সমাজতন্ত্রীদের মাঝে চীন ও রাশিয়াপন্থী উপদল তৈরি হওয়া। দল গঠনের সময় ভুট্টো এসব প্রশ্নে এমন অবস্থান নেন– যা জনগণের পছন্দ হয়। আইয়ুবের বিরুদ্ধে জনরোষ তেঁতে ওঠা মাত্র ভুট্টোও তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ান। আর সমাজতন্ত্রের কথা বললেও মস্কো বা চীনপন্থী কোনো পক্ষ নেননি তিনি।

২০. তবে ভুট্টো প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর এরকম শিক্ষিত ও স্পষ্টবাদী সংগঠকদের সঙ্গে ক্রমে তাঁর দূরত্ব বাড়ছিল। যেমন, পিপিপির শাসনামলে সামরিক শাসন কেন চলছে এরকম প্রশ্ন করায় ১৯৭২ সালে মুখতার রানাকে ২৩ মার্চ গ্রেফতার করা হয় এবং ভুট্টোর অধীনস্থ সামরিক ট্রাইব্যুনালে এপ্রিলে তাঁর পাঁচ বছর সাজাও হয়। এর এক সপ্তাহ পর সামরিক শাসন উঠে গেলে দেশে উচ্চ আদালত সামরিক আদালতে দণ্ডিতদের সাজা অবৈধ ঘোষণা করে। কিন্তু সামারিক আইনকে প্রতিস্থাপন করেছিল যে অস্থায়ী সংবিধান সেখানে পূর্ববর্তী শাসনামলে গৃহীত কার্যক্রমকে বৈধতা দেয়া হয়। ফলে সামরিক আইনে দেয়া সাজাও বহাল থাকে। ভুট্টো জীবনের এরকম ঘটনাগুলো তাঁর চরিত্রের কম আলোচিত এক দিককে উন্মোচিত করে। জাতীয় পর্যায়ে তিনি ক্ষমতা পাওয়া মাত্র পিপিপিতে ভিন্নমতালম্বীদের অনেকের ভাগ্য বিপর্যয়ের শুরু হয়েছিল।

২১. ভাষার ক্ষেত্রে তিনি বিরোধী দল ও ব্যক্তিদের প্রতি কীরকম আক্রমণাত্মক ছিলেন তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তাঁর বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা কয়েকটি দলের একটা জোটের প্রতি তার এরকম ভাষণে: 'এই জোট হলো খিচুড়ি। তবে এই খিচুড়ির মাঝে দুটো আলু আছে। একটা নুর খান, অন্যটা আসগর খান। আবার দুই টুকরা হাড্ডিও আছে। একটা হলো পিডিপি এবং আরেকটা হলো জামায়াত।' (*Weekly Nusrat*, October 11-18, 1970. *নুসরাত* ছিল পিপিপির প্রগতিশীলদের সাপ্তাহিক মুখপত্র। হানিফ রামে এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এছাড়াও *মুসাওয়াত* নামেও এই দলের কাগজ ছিল।)

২২. Asaf Hussain, *Elites and political development in Pakistan*, https://bit.ly/32bY1ms . দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশেও ভুট্টোর সমকালে অনেক প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ এরকম 'ক্যারিশমা'র ওপর ভর করে আদর্শিক গোঁজামিল দিয়ে এগোতে চেয়েছেন এবং সেরকম 'নিরীক্ষা' এখনো বন্ধ হয়েছে বলা যায় না।

২৩. সেসময় বেনজীর ভুট্টো এক সাক্ষাৎকারে ভুট্টোবাদের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন: 'ভুট্টোবাদ বলতে বোঝায় সংবিধান, মৌলিক অধিকার এবং স্বাধীন বিচারব্যবস্থার পুনর্প্রতিষ্ঠা। এটা আরও বোঝায় স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় ব্যয়, শ্রম আইন তৈরি করে শ্রমজীবীদের সুরক্ষা এবং দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও মাদকের চোরাচালান থামানো।' "Pakistan and 'Bhuttoism'", *The New York* Times, Aug. 23, 1986. স্বাধীন পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, বেনজীর কথিত উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর অনেক কয়টি জুলফিকার আলী ভুট্টোর শাসনামলে অবক্ষয়ের শিকার হয়েছিল পাকিস্তানে।

২৪. সচেতনভাবে যে ভুট্টো এটা করেছেন তার প্রমাণ হিসেবে বলা যায়, ১৯৭২ সালের সম্মেলনে প্রতিনিধি বাছাইয়ের দায়িত্ব দেন তিনি পাঞ্জাবে গোলাম মোস্তফা খারকে এবং সিন্ধুতে মুমতাজ ভুট্টোকে। এই দুই জন দলে বাম বিরোধী ঘরানার নেতা ছিলেন এবং ভুট্টোর বিশেষ ঘনিষ্ঠ ছিলেন। দুজনই দলে ভূ-স্বামী গ্রুপের সংগঠক। ভুট্টোর এই সিদ্ধান্তের কারণ ছিল প্রতিনিধি বাছাইয়ে বামপন্থীদের সংখ্যা কমানো। এর মধ্য দিয়ে পরবর্তীকালে গুরুত্বপূর্ণ যেটা ঘটে– পিপিপির সমর্থক ভিত্তির ধরন আমূল পাল্টে যায়। তবে ভূ-স্বামীরা দলে চালকের আসন নেয়া মাত্র দলের আর্থিক ভিত্তি সবল হয়। বিস্তারিত দেখুন, Maleeha Lodhi, *Bhutto, PPP & Political Development 1967-1977*, p.203-4.

২৫. Maleeha Lodhi (1980), Ibid, p. 192

২৬. *Pakistan Times*, 23May 1970, 1 & 5; *PakistanTimes*, 3 October 1970, 10.

২৭. Maleeha Lodhi (1980), Ibid, p.198

২৮. বেনজীর তখন রাস্তার আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন। এ বিষয়ে মতদ্বৈততা পিপিপির কেন্দ্রীয় নেতাদের মাঝে একরূপ বিভক্তি তৈরি করে। জেনারেল জিয়া পিপিপিতে

মাওলানা নিয়াজী এবং গোলাম মোস্তফা জাতোই প্রমুখের নেতৃত্বাধীন অংশকে জাতীয় সরকারে অন্তর্ভুক্ত করার টোপ দেন। একই সঙ্গে জিয়া সরকার পিপিপিতে উপদলীয় সংঘাত বাঁধাতে বেনজীর ও নুসরাতকে পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাত করতে দিচ্ছিল না। তাদের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গৃহবন্দি করে রাখা হতো। বেনজীর পিপিপির নেতৃত্বে সংহত হয়ে বসার পর ১৯৮৬ সালে জাতোইকে দলের সিন্ধু শাখার প্রধানের পদ থেকে অপসারণ করেন।

২৯. জালালউদ্দীন রহিম তখন প্রতিরক্ষা উৎপাদন বিষয়ক মন্ত্রী ছিলেন।

৩০. আজিজ আহমেদকে দলে ও প্রশাসনে (প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হিসেবে) নিয়োগ নিয়েও রহিম ও ভুট্টোর মাঝে প্রবল মতদ্বৈততা দেখা যায়। এই মতদ্বৈততার চূড়ান্ত অধ্যায়টি ছিল খুব করুণ। বর্তমান লেখকের প্রকাশিতব্য বইয়ের অন্য অধ্যায়ে তার বিবরণ দেয়া হয়েছে। রহিমকে শারীরিকভাবে হয়রানি করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলাও দায়ের হয়। রহিম পরে ইউরোপে চলে যান। রহিমের মতোই মুবাশ্বির হাসানকে ১৯৭৪-এর অক্টোবরে অর্থমন্ত্রী থেকে বাদ পড়তে হয়। এই দুজনের পিপিপি ছাড়ামাত্র দলটিতে ডানপন্থীদের আধিপত্য কায়েম হয় ভালোভাবে।

৩১. তবে পার্টির এই বামধারার মাঝেও আবার উপদলীয় সংঘাত ছিল এবং তারা কোনো একক নেতৃত্ব ও পরিকল্পনা দ্বারা চালিত ছিল না। একদল চাইতেন মধ্যপন্থী অবস্থানে থাকতে। মুবাশ্বির হাসান ও হানিফ রামেকে এদের মুখপাত্র বলা যায়। অন্যদিকে রহিম, মেরাজ খালিদ প্রমুখের অবস্থান ছিল আরও বামে। বামপন্থীদের এরকম অভ্যন্তরীণ বিরোধ তাদের কোণঠাসা করতে ভুট্টো এবং দলের ডান ধারার জন্য সুবিধাজনক হয়েছে।

৩২. বামপন্থী সংগঠকরা কেন দলে ভুট্টোর হাতে ক্রমে কোণঠাসা হয়েও বিদ্রোহ করেনি তার উত্তর খুঁজে পাওয়া কঠিন ছিল না। তারা জানত ভুট্টোর পক্ষে যে-কোনো সময় আরেকটা পিপিপি বানানো কঠিন হবে না। কিন্তু তাঁদের পক্ষে ভুট্টোকে বাদ দিয়ে অনুরূপ দল গড়া কঠিন।

৩৩. ক্ষমতায় এসে ভুট্টো সামরিক আইনের বলে প্রায় ১ হাজার ৩০০ কর্মকর্তা-কর্মচারীকে 'অদক্ষতা' ও 'দুর্নীতি'র অভিযোগে বরখাস্ত করেন। এদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া হয়নি। বরখাস্তের আগে কারণ দর্শানোর নোটিশও দেয়া হয়নি। মূলত আমলাতন্ত্রে নাজুকতার বোধ তৈরির জন্য ভুট্টো এটা করেন। এর বিপরীতে 'অনুগত'দের ব্যাপকভাবে পদোন্নতি ও গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেয়া হতে থাকে। জাফর ইকবাল নামে সুপরিচিত একজন সিএসপি কর্মকর্তা তখনকার সংস্থাপন সচিবকে পদোন্নতির ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন করায় তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে বরখাস্ত করা হয়। জাফর ইকবালের অধস্তন আফজাল সাঈদ ছিলেন ভুট্টোর বিশেষ অনুগ্রহ পাওয়া গুটিকয়েক কর্মকর্তার একজন। যাকে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের প্রধান কর্মকর্তা করা হয়। ভুট্টোর আস্থাভাজন এরকম কর্মকর্তাদের মধ্যে আরও ছিলেন বকর আহমেদ

(সংস্থাপন ও মন্ত্রিপরিষদ সচিব), রাও আব্দুর রশীদ (বিশেষ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ), সাঈদ আহমেদ খান (প্রধান নিরাপত্তা উপদেষ্টা) প্রমুখ। 'বুরোক্র্যাট' শব্দের বিপরীতে এদের তখনকার পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে 'ভুট্টোক্র্যাট' বলা হতো।

৩৪. Maleeha Lodhi (1980), Ibid, p. 297

৩৫. 'Mr. Chairman Sir, Save the PPP', *Viewpoint*, 13 August, 1976, p. 7-9.

৩৬. Maleeha Lodhi (1980), Ibid, p. 208

৩৭. Maleeha Lodhi (1980), Ibid, p. 207

৩৮. দলীয় ভিন্নমতাবলম্বীদের প্রতি ভুট্টো কীরকম আচরণ করতেন তার কয়েকটি উদাহরণ ইতিমধ্যে এ লেখায় দেয়া হয়েছে। জে এ রহিম, হানিফ রামে ও মুখতার রানার নিগ্রহের কথা বলা হয়েছে। এই তালিকায় যুক্ত হতে পারে মেরাজ খালিদের ঘটনাও। করাচিতে ১৯৭২-এ শ্রমিকদের বিক্ষোভ নির্মমভাবে দমনের বিরোধিতা করেন মেরাজ। 'আপত্তিকর বক্তব্য'-এর জন্য ১৯৭৪ সালে ৪ বছর কারাদণ্ড হয় তাঁর। ভুট্টোর চাপ ছাড়া পিপিপির কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংগঠকের এরকম সাজা সম্ভব ছিল না। মেরাজ খালেদ ছিলেন করাচির ছাত্রনেতা এবং পিপিপিতে আমূল পরিবর্তনবাদীদের একজন।

৩৯. ভুট্টো দল গঠনের সময় আইয়ুব খানের কঠোর সমালোচক ছিলেন। কিন্তু তাঁর শাসনামলে অন্য কোনো দলের পক্ষে তাঁর সেরকম সমালোচনা অতি ঝুঁকিপূর্ণ ছিল।

৪০. যেহেতু ভুট্টো বেলুচ, পাখতুন– এমনকি সিন্ধুর জাতীয়তাবাদীদের আঞ্চলিক দাবি-দাওয়া পূরণেও প্রস্তুত ছিলেন না, সে কারণে এরকম রাজনীতিবিদ অনেকেই ভুট্টো সরকার দ্বারা রাষ্ট্রবিরোধী তকমা পেয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় ভুট্টোর নিজ প্রদেশ সিন্ধুতে স্থানীয় জাতীয়তাবাদী জি এম সাঈদও তাঁর 'জয় সিন্ধ' স্লোগানের জন্য গ্রেফতার হন। এই স্লোগানে বাংলাদেশের 'জয়বাংলা'র ছায়া আছে বলে সন্দেহ শুরু হয়!

৪১. Kamal Azfar, *The Waters of Lahore*, Najam printing press, Karachi, 2010, p.139.

৪২. Shahid Javed Burki, *Pakistan Under Bhutto*, 1971-1977, Macmillan, 1988, p.80-1.

৪৩. Shamim Ahmad, Foreword, *Zulfikar Ali Bhutto: The Psychodynamics of his rise and fall*, Paramount, 2018.

৪৪. জুলফিকার ভুট্টো আটক হওয়া মাত্র তাঁর পরিবারসূত্রে বলা হয়– নুসরাতকে তিনি দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিতে বলেছেন। যদিও দলের অন্যতম জ্যেষ্ঠ নেতা শেখ মোহাম্মদ রশিদের দাবি ছিল ভুট্টো চেয়ারম্যানের দায়িত্ব চালাতে তাঁর কথা বলে গেছেন। রশিদ ছিলেন দলটির নেতৃত্ব পর্যায়ের সর্বশেষ বামপন্থী। ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান পদে তাঁর দাবির যথার্থতা ছিল– কিন্তু

বন্দি-ভুট্টো হয়তো ভেবেছেন নুসরাতই দলকে 'রক্ষা' করতে পারবে।

৪৫. এই অপমৃত্যু আবার বাস্তব মৃত্যুরও কারণ ঘটিয়েছিল। যেহেতু দলীয় নির্বাচন নয়– পারিবারিক বংশধারাই দলীয় নেতৃত্বের মানদণ্ড হবে সে কারণে জুলফি ভুট্টোর মৃত্যুর পর পুত্র মুর্তাজা ভুট্টো বিদেশ থেকে ফিরে দলের নেতৃত্বের দাবিদার হিসেবে সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। এরকম সময় ১৯৯৬ সালে তিনি 'রহস্যজনকভাবে' করাচিতে নিহত হন। ভাইয়ের মৃত্যুকালে বেনজীর দেশটির প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। মুর্তাজা এ সময় 'পিপিপি (শহীদ ভুট্টো)' নামে আলাদা একটা দলের গোড়াপত্তন করেন। বেনজীর ও তাঁর স্বামী আসিফ জারদারি মুর্তাজার নতুন এই রাজনৈতিক ভূমিকায় অসুখী ছিলেন। এভাবে দীর্ঘসময় এই পরিবারে পিপিপির নেতৃত্ব নিয়ে কলহ অব্যাহত থাকে। পিপিপির ইতিহাসের এই অধ্যায়ে সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে কৌতূহল উদ্দীপক ঘটনা হলো মুর্তাজা যখন বোনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে করাচির বিভিন্ন স্থানে সভা-সমাবেশ করছিলেন তখন জনতার পক্ষ থেকে স্বতস্ফূর্ত স্লোগান উঠত: 'ভুট্টো জিন্দা হায়!' অর্থাৎ জনতার কাছে মুর্তাজা ছিলেন জুলফি ভুট্টোর প্রতীক। তারা একই সঙ্গে এ-ও স্লোগান দিত: 'যব তক সূর্য চান্দ রয়ে গা, ভুট্টো তেরা ওয়ারিশ রহে গা'। এই স্লোগানের ভেতরকার ওয়ারিশ বা 'উত্তরাধিকারে'র ধারণাটি দক্ষিণ এশিয়ার সমাজের রাজনৈতিক বোঝাপড়ায় তাৎপর্যময় এক বিষয়।

‘দেশের সম্পদ দেশেই রাখুন’ : বিজ্ঞাপনে অসহযোগ আন্দোলন

সহুল আহমদ

জাতীয়তাবাদ নির্মাণ ও স্মৃতি

জাতীয়তাবাদ তথা যে কোনো পরিচয় (আইডেন্টিটি) নির্মাণকে তিনটা উপায়ে দেখা যেতে পারে, বা দেখা হয়ে থাকে।[১] আমরা এগুলোকে বলতে পারি: আদিমতাবাদ (primordialism), নির্মাণবাদ (constructivism) এবং হাতিয়ারবাদ (Instrumentalism)। তিনটাকে সংক্ষেপে বলা যায় এভাবে, আদিমতাবাদ সামষ্টিক স্মৃতি ও পরিচয়কে রক্ত, আত্মীয়তা, ভাষা, সাধারণ ইতিহাস ইত্যাদির মধ্যকার আদিম বন্ধন হিসেবে দেখে। জাতির মতো পরিচয়কে সে সহজাত ও অন্তর্গত বলে ধরে নেয়। অন্যদিকে নির্মাণবাদ পরিচয়কে যুগ যুগ ধরে চলতে থাকা কোনো বস্তু হিসেবে না দেখে বরঞ্চ ‘উৎপাদিত’ ও সামাজিকভাবে নির্মিত হিসেবে দেখে। বর্তমানের জরুরত মেটানোর জন্য একটা পছন্দসই অতীত নির্মিত হয়। বেনেডিক্ট এন্ডারসন যেমন করে ছাপার হরফের প্রযুক্তিকে ‘কল্পিত সম্প্রদায়ে’র অন্যতম অনুষঙ্গ মনে করেন।[২] স্মৃতি বা ইতিহাস কেবল পরিবারের সদস্য, দাদা দাদি নানা নানির মুখে মুখে এসেই পৌঁছায় না; বরঞ্চ স্কুল, কলেজ, পত্রিকা, গণমাধ্যম ইত্যাদির মাধ্যমেও এসে পৌঁছায়। হাতিয়ারবাদ একটু অন্যভাবে এটাকে বিবেচনা করে। সামষ্টিক স্বার্থের জন্য অতীত ‘হাতিয়ারমাত্র’, স্মৃতির ব্যবহার হাতিয়ারসুলভ। অভিজাতরা ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে ও জনসমর্থন আদায়ে ইতিহাস, অতীত, স্মৃতিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। আধুনিক জমানার গণমাধ্যমের বাড়বাড়ন্তে ও গণতন্ত্রের গণ-স্ফুরণের কারণে যে কোনো পরিচয় কীভাবে নির্মিত হচ্ছে সেটার হদিস পেতে উপরোক্ত দ্বিতীয় উপায়কে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক বলে ধরে নিতে পারি। তৃতীয় উপায়টির কথা

অনেকেই বলতে পারেন, কিন্তু যে জটিল ক্ষমতা-সম্পর্কের মধ্য দিয়ে পরিচয়কেন্দ্রিক চিন্তার প্রচার ও প্রসার ঘটে সেটাকে তা পুরোপুরি ব্যাখ্যা করতে পারে না। অন্যদিকে নির্মাণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সেই জটিল সম্পর্ককে বুঝতে সাহায্য করে।

পরিচয়ের পাশাপাশি এটা দিয়ে স্মৃতির রাজনীতিকেও খোলাসা করা যায়। যে কোনো পরিচয় নির্মাণে যুদ্ধ ও সহিংসতার স্মৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সামাজিক পরিচয় যেমন কোনো সহিংস ঘটনার ফসল হতে পারে, তেমনি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ পরিচয় সহিংস ঘটনার জন্ম দিতে পারে। যে সমাজে বিভিন্ন গোষ্ঠী/জাতির মধ্যে যত বেশি সংঘাতের স্মৃতি ও ইতিহাস বিদ্যমান, সেই গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে ব্যক্তিকে ব্যক্তির চাইতে গোষ্ঠীর পরিচয়ে বিচার করার প্রবণতা বেশি থাকে।[৩]

আমাদের চারপাশে যে আধিপত্যশীল স্মৃতি বা ইতিহাসের বয়ান পাওয়া যায় তাতে যতটা না জনস্মৃতি (পপুলার মেমরি) থাকে তার চাইতে বেশি থাকে এক ধরনের সামাজিক ‘ইঞ্জিনিয়ারিং’; অর্থাৎ, বিভিন্ন সামাজিক ও রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠানাদির মাধ্যমে সেগুলো লিখিত, রচিত ও পুনরুৎপাদিত হয়ে থাকে। এই উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের একটা মাধ্যম হচ্ছে ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন, যা প্রচারিত হয় পত্রিকায়, বিলবোর্ডে, টিভিতে, এবং বর্তমানে ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউবের মতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পরিসরে।

বিজ্ঞাপন, মুক্তিযুদ্ধ ও জাতীয়তাবাদ

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতীয় জীবনে একদিকে ‘বিজয়ের মহিমা’, অন্যদিকে ত্রিশ লক্ষ শহিদের ‘আত্মদান’। একদিকে গৌরবের, অন্যদিকে বেদনার। যে কোনো সহিংস ও সশস্ত্র যুদ্ধের যে ধরনের স্মৃতিচারণ ‘নির্মিত’ হয়, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণও তার খুব একটা ব্যতিক্রম নয়। জনপরিসরের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমসমূহে হাজির থাকা সেই সহিংস ঘটনার স্মৃতিচারণের সাথে যেমন একটা নির্দিষ্ট ধরনের জাতি (বা কখনো রাষ্ট্র) নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা পষ্ট থাকে, তেমনি থাকে জাতীয়তাবাদকে হাজির করার নানা কলাকৌশল। কাজলী শেহরিন ইসলাম এই দিকটি তুলে ধরেছিলেন গত পাঁচ দশকে প্রচারিত বিজ্ঞাপন দিয়ে।[৪] গত পাঁচ দশকের গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দিবসে

(স্বাধীনতা ও বিজয় দিবস) প্রচারিত বিজ্ঞাপনে জাতীয়তাবাদের ব্যবহার ও রাজনৈতিক বন্দোবস্ত পরিবর্তনের সাথে সাথে বিজ্ঞাপনের ধরনের পরিবর্তন লক্ষ করেছিলেন।

কাজলী ডিসকোর্স বিশ্লেষণ—সহজভাবে বললে, ভাষার সাথে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতের সম্পর্ককে বিবেচনায় নিয়ে ছবি বা টেক্সট-এর ভাষার পরীক্ষণের মাধ্যমে এই পাঁচ দশকের (১৯৭২, ১৯৭৮, ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৮, ২০১৮) বিজ্ঞাপনকে কাটাছেঁড়া করেছেন। বাহাত্তরে তো একাত্তরের স্মৃতি সতেজ, টাটকা। সবেমাত্র নতুন রাষ্ট্র প্রাপ্তির উদযাপন ও নতুন যুগের পত্তন—এটাই বিজ্ঞাপনের মূল ভাষা। এমতাবস্থায় নিঃসন্দেহে শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তাও ছিল তুঙ্গে; বিজ্ঞাপনে তাঁর ছবি, বিখ্যাত 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' বাক্যের উপস্থিতি লক্ষণীয়। শহিদ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন, যুদ্ধ, বিজয় এবং দেশ গঠন—এইসবই ছিল বাহাত্তরের বিজ্ঞাপনের প্রধান বিষয়বস্তু। বিজ্ঞাপনে কোম্পানির নাম থাকলেও কে কোন ধরনের পণ্য বেচনেওয়ালা সে বিষয়ে ইশারা-ইঙ্গিত কম ছিল। অন্যদিকে আটাত্তর আসতে আসতে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে বিরাট পটপরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। শেখ মুজিবের সপরিবারে নিহত হওয়া এবং সেনাশাসক জিয়াউর রহমানের ক্ষমতারোহণ বাহাত্তর থেকে বেশ ভিন্ন এক পরিস্থিতি তৈয়ার করে। ফলে বাহাত্তরের বিজ্ঞাপনে যেখানে শেখ মুজিবের প্রবল উপস্থিতি ছিল, আটাত্তরে এসে সেখানে বিভিন্নভাবে সেনাবাহিনীর ভূমিকার দিকে আলো ফেলা হয়। যুদ্ধের শহিদদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জাতি গঠন ইত্যাদির দিকে মনোযোগ দেয়া হয়। যুদ্ধ শেষ হয়েছে কিন্তু লড়াই চলছে, কাজলীর মতে, এটাই ছিল সে জমানার বিজ্ঞাপনের প্রধান ভাষা। ১৯৮৮ সালেও সেনাবাহিনী ক্ষমতায় ছিল; হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ ক্ষমতায়। 'জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া' এইটা ছিল তৎকালের বিজ্ঞাপনের প্রধান প্রবণতা। দুটো সামরিক আমলেই বিজ্ঞাপনে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পোন্নয়ন প্রধান অগ্রাধিকার পেয়েছিল। শামসুর রাহমানের 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতার আদলে বলা হয়েছিল 'স্বাধীনতা তুমি শিল্পায়নের সুদৃঢ় অঙ্গীকার'। কাজলী এই সময়ের আরেকটা পর্যবেক্ষণ দিচ্ছেন যে, পূর্বে যেখানে এই গুরুত্বপূর্ণ দিবসে কোম্পানির ব্রান্ডিং করার চল ছিল, এই সময়ে সেটা পণ্যের প্রচারণার দিকে সরে যায়।

এরপরের দশকে আরও বড় পটপরিবর্তন ঘটে। একদিকে, গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বৈরাচারী সেনাশাসক এরশাদের পতনের মধ্য দিয়ে নব্বইয়ের দশক শুরু হয়। ১৯৯৮ আসতে আসতে গণতন্ত্রের সেই পথচলাতেও ক্ষমতাবদল হয়ে গিয়েছে দুবার। অন্যদিকে, এই সময়ে মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে, যার প্রভাব বাংলাদেশের রাজনীতিতে সুদূরপ্রসারী: যুদ্ধাপরাধীদের বিচার আন্দোলন ও গণআদালত। এই দুটো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা মাথায় রাখলে বোঝা যাবে কেন এই সময়ের বিজ্ঞাপনের প্রধান বিষয়বস্তু, কাজলীর মতে, 'চেতনার জন্ম'। আগে বিজ্ঞাপনে যেখানে স্মৃতিচারণ, শহিদদের স্মরণ এবং মুক্তিযুদ্ধ বা আত্মত্যাগের সাথে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নের সম্পর্ক হাজির থাকত, সেখানে এইবার মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, যুদ্ধের গৌরব ও স্বাধীনতার মূল্যবোধ হাজির হওয়া শুরু করল। এই 'চেতনা'র সাথে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায়। ফলে সে সময়ে 'যারা স্বাধীনতার বিরুদ্ধে তাদের বদলা নেব' ইত্যাদি ধরনের পোস্টারও নির্মিত হতে থাকে। আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় আসার সাথে বিজ্ঞাপনে এই 'চেতনা'র জন্ম জড়িত তা সহজেই অনুমেয়। ২০০৮ এ যখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে তখন একইভাবে এই 'চেতনা'র আরও প্রকটরূপ খেয়াল করা যায়; ১৯৯৮ সালের দিকে তখনো 'চেতনা'র বিদ্যমান প্রবল রাজনীতিকরণ দেখা যায়নি।

২০০৮ সালে এসে, কাজলীর মতে, দেখা দেয় 'কর্পোরেট জাতীয়তাবাদ'। কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো যেভাবে পণ্যের সাথে 'চেতনা' ও মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন উপাদানকে মিশিয়ে প্রদর্শন ও বিক্রিবাট্টা শুরু করল সেটা আগের দশকে লক্ষ করা যায়নি। যেমন গ্রামীণফোন সিম বের করল, নাম দিল 'অমর সিম'; তার স্লোগান: 'স্বাধীনতা অমর প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে'। আরেকটি প্রবণতা দেখা যায়; বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ব্যক্তিরাও (মানে, আওয়ামী লীগের বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতারা) স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেন। ভোগকে দেশপ্রেমীয় ও রাজনৈতিক চর্চাতে রূপান্তর করাটা এই সময়ের মূল বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়াল। পণ্যের প্রচারণার সাথে মিশে গেল দেশপ্রেম, স্বাধীনতা, শহিদ ও বিজয় নিয়ে আবেগী বক্তব্য। এই সময়ে কেবল পণ্য বিক্রিবাট্টাতে সীমাবদ্ধ না থেকে টেলিকম কোম্পানি মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রকল্পকেও মাঠে নামানো শুরু করে। ফলে বিষয়টা কেবল

দেশপ্রেম বা স্মৃতিকে স্মরণ করিয়ে পণ্য বেচাতেই সীমাবদ্ধ রইল না, বরঞ্চ খোদ কোম্পানিটাই যে দেশপ্রেমিক (এখানে 'স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি' পড়ুন) সেটাও বোঝানো গেল। ২০১৮ সালেও ক্ষমতায় আওয়ামী লীগ। এর মধ্যেও আসলে শাহবাগ আন্দোলনের মতো বিরাট ঘটনা ঘটে গিয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া এই আন্দোলনের প্রভাব ছিল বহুমাত্রিক। তন্মধ্যে দুটো হচ্ছে, এই ঘটনা একদিকে এখানকার সাংস্কৃতিক রাজনীতিতে যে বিভাজন ছিল সেটাকে একেবারে ঠেলে দুই মেরুতে নিয়ে যায়, বা কারও মতে, অস্পষ্ট বিভাজনকে স্পষ্ট করে তোলে; অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধকে একেবারে আওয়ামী বয়ানের পদতলে সমর্পণ করে দেয়। ফলস্বরূপ এই সময়ের বিজ্ঞাপনে, কাজলীর মতে, 'স্মৃতির রাজনীতির ব্যক্তিকরণ ঘটে'। অর্থাৎ, এখানে স্মৃতিসৌধ, পতাকা, গান কবিতার পাশাপাশি শেখ মুজিবের উপস্থিতি ছিল প্রবল; তবে সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, শেখ মুজিবের পাশাপাশি এইবার বিদ্যমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও হাজির হন বিজয় ও স্বাধীনতার দিবসের বিজ্ঞাপনে। মূল বয়ান হচ্ছে—যে দেশ শেখ মুজিব এনে দিয়েছেন, সেই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তাঁরই কন্যা শেখ হাসিনা।

বিজ্ঞাপনে অসহযোগ আন্দোলন ও জাতীয়তাবোধ

সংক্ষেপে কাজলীর এই প্রবন্ধ থেকে যা বোঝা গেল, এখানকার বিজ্ঞাপনে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান প্রধান উপাদানকে নিয়মিত ব্যবহার করলেও ক্ষমতাসীনদের পরিবর্তনের সাথে সাথে সেইসব উপাদানের বয়ান ও হাজিরার ধরনে পরিবর্তন ঘটে। জাতীয়তাবাদী কিছু উপাদান নির্দিষ্ট থাকলেও জাতীয়তাবাদী বয়ানে বেশ বড়সড় পরিবর্তন ঘটছে। স্রেফ কোম্পানির ব্রান্ডিং বা পণ্যের প্রচার থেকে শুরু করে খোদ প্রতিষ্ঠানকেই 'দেশপ্রেমিক' হিসেবে হাজির করার প্রচেষ্টাও এতে আছে। কাজলী কাজ শুরু করেছেন বাহাত্তর থেকে। তিনি যে ঘটনার উপস্থিতি, মানে একাত্তরকে, পাঁচ দশকের বিজ্ঞাপনে কাটাছেঁড়া করেছেন, আমি সেই সময়ের বিজ্ঞাপনকে দেখতে আগ্রহী। মানে উপরোক্ত আলাপ হচ্ছে একাত্তর-পরবর্তী কাল নিয়ে, কিন্তু কেন্দ্রে হচ্ছে একাত্তরের উপস্থাপন। আমি বরঞ্চ কাল হিসেবে একাত্তরকেই নেব। বিশেষ করে, একাত্তরের যে সময়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অভূতপূর্ব এক অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছিল, আমি সেই মার্চে প্রকাশিত কিছু বিজ্ঞাপনের দিকে

তাকাব; উদ্দেশ্য হচ্ছে কীভাবে সেই আন্দোলনের মুহূর্তে 'বাঙালি' পরিচয় ও জাতিবোধ পণ্য প্রচারণা বা কোম্পানির ব্রান্ডিং-এর অংশ হচ্ছে সেটা তুলে ধরা। পাশাপাশি কোন 'বাঙালি' পরিচয়টা মূলধারা হয়েছিল, মানে তৎকালীন ধনিক বা ব্যবসায়ী গোষ্ঠী লুফে নিয়েছিল, সেটাও তুলে ধরব। যে কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে আলাপ শুরু করার আগে সেই ঘটনা সম্পর্কে দুয়েক কথা হাজির করাটাই রেওয়াজ; মার্চের সেই অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে চর্বিতচর্বন দুটো কথা বলা যাক।

একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলন যে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য অধ্যায় তা মোটামুটি দেশ বা বিদেশের সবাই মেনে নেন। পাকিস্তান আমলের তেইশ বছরের জমানো ক্ষোভ এই ভূখণ্ডের মানুষ নানান সময়ে নানা তরিকায় প্রকাশ করে থাকলেও একাত্তরের মার্চ মাসের এক তারিখ থেকে যা ঘটেছিল তাকে সেই ক্ষোভের সর্বোচ্চ বহিঃপ্রকাশ বলা যায়। কার্যত, সেদিনের পর থেকে, অন্তত এই ভূখণ্ডে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের কবর সূচনা হয়েছিল। যদিও তখনো নামে পাকিস্তান-রাষ্ট্র ছিল, কিন্তু একটা রাষ্ট্র যে ধরনের প্রতীকী ব্যবস্থা কায়েম করে, যেমন পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত ইত্যাদি, সেগুলোর বিরুদ্ধে যাবতীয় ক্ষোভ-প্রদর্শন ও বিকল্প প্রতীকী ব্যবস্থা কায়েম তা সেই পঁচিশ দিনের মধ্যেই ঘটে গিয়েছিল। এবং সেটা হয়েছিল স্বতঃস্ফূর্ত গণ আন্দোলনের মাধ্যমে, প্রধানত অহিংস-পন্থায়, অর্থাৎ যাকে ইংরেজিতে বলা হয় নন-ভায়োলেন্ট সিভিল রেজিস্টেন্স। আইয়ুবের স্বৈরশাসন, আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন, গণ-অভ্যুত্থান, ইয়াহিয়ার আগমন, সত্তরের ঘূর্ণিঝড়, সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিশাল বিজয়, ক্ষমতা হস্তান্তরের টানাপোড়ন—এই ধারাবাহিকতায় আলোচ্য মার্চের আগমন ঘটে। ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করেন। ঘোষণার পরপর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর তরফ থেকে প্রশাসনিক উঁচু পদসমূহে নানা প্রকার রদবদল শুরু করা হয়। অন্যদিকে ঘোষণার পরপর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে অন্য ঘটনার শুরু হয়: "পরিষদ অধিবেশনের বাতিলের কথা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে রাজধানীর সকল মানুষ রাস্তায় নেমে পড়ে, বস্তুত ঢাকা শহর একটি মিছিলের নগরীতে পরিণত হয়... এ সময়ে সংগ্রামী জনতার কাফেলা চারদিক হতে বায়তুল মোকাররম ও জিন্নাহ এভিনিউর দিকে আসতে শুরু করে।... বিক্ষুব্ধ জনতা বাঁধভাঙ্গা জলরাশির ন্যায় চারিদিক থেকে স্লোগান দিতে দিতে শহরের প্রধান প্রধান সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করতে করতে থাকে... ।"[৫]

১৯৭২ সালের লিখিত একটি প্রবন্ধে জিল্লুর আর খান এই প্রতিক্রিয়াকে বলেছিলেন 'তাৎক্ষণিক', 'তীব্র' ও 'স্বতঃস্ফূর্ত'[৬]; মার্চের দুই তারিখ *দৈনিক পাকিস্তান*-এ প্রকাশিত সংবাদই এই তিনটা বিশেষণের উপস্থিতির সাক্ষ্য দিচ্ছে। মার্চের ১ তারিখ সংগ্রামী জনতার যে 'কাফেলা' রাস্তায় নেমে এসেছিল সেই কাফেলায় ডানপন্থী, বামপন্থীসহ সবাই যোগ দিয়েছিল। এমনকি জামায়াতে ইসলামী, যে দল কিনা আরও কিছু দিন পরেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গণহত্যার সহযোগী হয়ে উঠবে, তারাও প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তের নিন্দা জানিয়েছিল। রাজনৈতিক দল, ছাত্রসংগঠন, লেখক, শিল্পী, সাংবাদিক, সবাই যে যার মতো করে সামষ্টিকভাবে আন্দোলনে শরিক হয়েছিলেন। সে সময়ের রাস্তার স্লোগান এবং রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের লিফলেট ইত্যাদি সাক্ষ্য দিচ্ছে, দাবি আর 'স্বায়ত্তশাসনে' আটকে নেই, বরঞ্চ 'স্বাধীনতা'ই একমাত্র দাবি। নেতৃত্ব-স্থানীয়দের বক্তৃতা-বিবৃতিতে অধিবেশন স্থগিতকরণ এবং, পরবর্তীকালে, মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠকের দিকে আলো থাকলেও রাস্তার আন্দোলন বরঞ্চ আরও সরাসরি [ডিরেক্ট], আরও স্বতঃস্ফূর্ত। দুই মার্চেই ছাত্ররা 'স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন করে' ভাষা-শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশ, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু এবং গণতন্ত্র কায়েমের লক্ষ্য নির্ধারণ করে ফেলে।[৭] জিল্লুর আর খান মার্চের ৩-৬ তারিখের মধ্যে কয়েকজনের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন, অধিকাংশই তখন সরাসরি স্বাধীনতার পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। তাদের মত ছিল, ছয়-দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন দিয়েও এই পরিস্থিতি থেকে বের হওয়া যাবে না, দরকার পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা। এটাও উল্লেখ করে রাখি, যারা অহিংস ধারার আন্দোলন নিয়ে কাজ করেন তারা মার্চের এই ঘটনাপ্রবাহকে বেশ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন। সন্দেহ নেই, পৃথিবীর যে কোনো মুক্তির সংগ্রামে সাধারণত সশস্ত্র বা সহিংস আন্দোলন আলাপের কেন্দ্রে-যে কেবল অবস্থান করে তা-ই নয়, বরঞ্চ আধুনিক রাষ্ট্রীয় জীবনের স্মৃতিতে ও সৌধে সহিংস আন্দোলনের মাহাত্ম্যকেই প্রকাশ করা হয়ে থাকে। সহিংস আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীরা রাষ্ট্রে নায়ক হিসেবে আবির্ভূত হন। নাগরিক জীবনে বিভিন্ন ধরনের জীবনাচারে সেই নায়ক ও সহিংস ঘটনার স্মৃতি বারেবারে জীবিত হয়ে ফিরে আসে। রাষ্ট্রের জন্মপ্রক্রিয়ার পর সামরিক শৌর্য-বীর্য জাতীয়তাবাদের অন্যতম অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে। কিন্তু যারা আন্দোলনে জনসাধারণের অহিংস ধারার সম্পৃক্ততার বিষয়টিকে গুরুত্বারোপ করেন তারা পরিচয় নির্মাণে ও জাতিগঠনে অহিংস

ধারার আন্দোলন ও পদ্ধতিকে আমলে নেয়ার কথা বলেন। অহিংস-পন্থার প্রতিরোধ ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করে, ফলে এটা জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের ভিত্তি তৈরি করে দেয়। একইভাবে ইশতিয়াক হোসেন বাংলাদেশের ইতিহাসে বায়ান্ন-র ভাষা আন্দোলন ও একাত্তরের মার্চের অসহযোগ আন্দোলনকে আলোচনা করেন।[৮] তার মতে, ভাষা আন্দোলন ছিল অহিংস-ধারার নাগরিক আন্দোলন। আন্দোলনের পদ্ধতি, মিছিল, সমাবেশ, লিফলেট, দশজন দশজন করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ এইসব অহিংস পদ্ধতিরই স্মারক। এই আন্দোলনই পরবর্তীতে সামগ্রিক পরিচয় নির্মাণে ভূমিকা রাখছে। পাকিস্তান আমল জুড়ে বিভিন্ন আন্দোলনে বারেবারে বায়ান্ন-র ভাষা আন্দোলন ফিরে ফিরে এসেছে। তখন এই ঘটনাই পরবর্তী আন্দোলনের পদ্ধতি নির্মাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। এমনকি, ১৯৭১ সালের মার্চের অসহযোগ আন্দোলনে যে অহিংস-ধারার পদ্ধতিগুলো নেয়া হয়েছিল সেখানেও এই সামগ্রিক পরিচয় নির্মাণের চেষ্টা লক্ষণীয়।

অসহযোগ আন্দোলনের ২৫ দিনে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের জন্য আমি *দৈনিক ইত্তেফাক*, *মর্নিং নিউজ*, *আজাদ ও পাকিস্তান অবজার্ভার* দেখেছি। প্রায় ৫৭টি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত/প্রচারিত হয়েছে। বিজ্ঞাপন আরও বেশি প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু আমরা কেবল সেগুলো নিয়েছি যেগুলোতে আসলে তৎকালীন আন্দোলন ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপস্থিতি ছিল। বিজ্ঞাপনগুলোর মধ্যে ৫৬ শতাংশ ছিল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের (যেমন ব্যাঙ্ক বা বীমা), ১৯ শতাংশ হচ্ছে বিভিন্ন শিল্প বা ইন্ডাস্ট্রির এবং বাকিগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের কর্পোরেশনের। এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত বিজ্ঞাপনগুলো উপরোক্ত চারটি পত্রিকায় ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। যেহেতু প্রতিটি বিজ্ঞাপন একের অধিক পত্রিকায় এবং একের অধিকবার প্রকাশিত হয়েছিল সেহেতু কোনো ছবিরই নির্দিষ্ট তারিখ ও পত্রিকার নাম এতে উল্লেখ করা হয়নি। আন্দোলন মার্চের এক তারিখ থেকে শুরু হলেও বিজ্ঞাপনে আন্দোলনের প্রভাব পাওয়া যায় মাসের প্রথম দশদিনের পর। ১১ তারিখে *ইত্তেফাকে* 'দি ঢাকা আরবান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড'-এর বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। সেখানে কোনো ধরনের নকশা বা চিত্রের ব্যবহার ছিল না। ছোট করে প্রকাশিত সেই বিজ্ঞাপনে মোটা হরফে স্পষ্ট করে লেখা ছিল: 'দেশের সম্পদ দেশেই রাখুন।' এর ঠিক নিচের লাইনে তুলনামূলকভাবে ছোট হরফে লেখা: 'বাংলার স্বাধিকার অর্জনের পথে সাহায্যকারী একমাত্র

ব্যাঙ্ক'। এরপর যত দিন গড়িয়েছে বিজ্ঞাপনের ভাষায় পরিবর্তন এসেছে। মার্চের মাঝামাঝির পর প্রায় সকল বিজ্ঞাপনেই বিভিন্নভাবে ঘুরেফিরে আন্দোলন ও সম্ভাব্য স্বায়ত্তশাসন অথবা স্বাধিকারপ্রাপ্তি ঘুরেফিরে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল থেকে শুরু করে বিভিন্ন জনের লেখা দেশাত্মবোধক গান/কবিতা বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা হয়েছে। আর্থিক বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের পণ্যের বিজ্ঞাপনের চেয়ে কেবল ব্রান্ডিংটাই ছিল প্রধান প্রবণতা। কোনো ধরনের পণ্যের নাম ব্যবহার না করে পোস্টারে কেবল কবিতা/গান/স্লোগান ব্যবহার করা হয়েছে, নিচে কোম্পানি বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম দেয়া হয়েছে।

বাঙলার ধন বাঙলায়... এবং দুই অর্থনীতি

বিজ্ঞাপনের ভাষাতে কিছু সাধারণ বিষয়বস্তুর উপস্থিতি লক্ষণীয়। প্রধান যে বিষয়বস্তু, পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে, প্রায় সকল বিজ্ঞাপনে ছিল সেটা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে 'মুসলিম ইনসিওরেন্স কোং লিঃ' এর বিজ্ঞাপনে: 'বাঙলার ধন বাঙলায়...'। বিজ্ঞাপনের বক্তব্য হচ্ছে: 'মুসলিম বাঙলাদেশের আদি বীমাপ্রতিষ্ঠান। বাঙলার সেবাই মুসলিমের মূল লক্ষ্য। বাঙলার মূলধন ও লভ্যাংশই মুসলিমের পবিত্র পুঁজি। বাঙলার ধন বাঙলায়: এই মুসলিমের মূল বক্তব্য'। এই বক্তব্য আরও স্পষ্টভাবে হাজির হয়েছিল 'রোক্সানা ইন্ডাস্ট্রিজ' এবং 'সানসাইন সোপ এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানি'র বিজ্ঞাপন-দ্বয়ে; তাদের বক্তব্য প্রায় একই ছিল। যথাক্রমে 'বাংলা দেশের সম্পদ বাংলা দেশেই রাখুন' ও 'বাঙলা দেশের অর্থ বাংলা দেশেই রাখুন'। আবার কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান দেশের অর্থ দেশে রাখার আহ্বান জানানোর পাশাপাশি 'দেশীয় পণ্য ব্যবহার' করার আর্তিও জানিয়েছে। বাঙলার ধন বাঙলায় রাখার খায়েশটাও তৎকালের রাজনীতির প্রধানতম অর্থনৈতিক দাবি হিসেবে জনপ্রিয় ছিল। রেহমান সোবহান, নুরুল ইসলামসহ পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অর্থনীতিবিদরা 'দুই অর্থনীতি' নামে যে অর্থনৈতিক তত্ত্ব হাজির করেছিলেন, সেটাই রচনা করেছিল ছয়দফার অর্থনৈতিক ভিত্তি। সে তত্ত্বের অন্যতম প্রবক্তা নুরুল ইসলাম জানিয়েছিলেন, 'দুই অর্থনীতির তত্ত্বের মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদদের মধ্যে চিন্তার সূত্রপাত হয়, কীভাবে সে অঞ্চলের অর্থনৈতিক অধিকার রক্ষা করা যায় এবং অর্থনীতির শ্লথ প্রবৃদ্ধির চাকা উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়।'[৯] পাকিস্তানে যে আদতে দুই অর্থনীতি চলছে এই ধারণার সূত্রপাত ১৯৫৬ সালের দিকে। একাত্তরের অসহযোগ

আন্দোলনে আসার পূর্বে এই তত্ত্ব বেশ কতক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক যাত্রা সম্পন্ন করে ফেলেছে। সে পথচলার একেবারে চূড়ার বিন্দুতে পূর্ব পাকিস্তানের ব্যবসায়িক বা ধনিক বা বুর্জোয়া গোষ্ঠী তাদের প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনে দারুণ সংক্ষেপিত ভাবে বাঙলার ধন বাঙলায় রাখার ঘোষণা করছেন। এই ধরনের ভাষা মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের বিজ্ঞাপনেও দেখা যায়। 'একটি পবিত্র আমানত' শিরোনামের বিজ্ঞাপনের ভেতরের টেক্সট হচ্ছে: '...এর পূর্বাঞ্চলের যাবতীয় সম্পদ বাঙলাদেশের মধ্যেই সুনিয়ন্ত্রিত।' ইস্টার্ণ ফেডারেল ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স কোম্পানি তাদের বিজ্ঞাপনে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চাওয়া-পাওয়াকে একসূত্রে মিলিয়ে উপস্থাপন করেছে। মূল টেক্সট বলছে, 'বাঙলা দেশের মানুষের নিরাপত্তাশীল ভবিষ্যতের প্রতীক হিসেবে বাঙলার সম্পদ বাঙলা দেশের সেবায় আমরা নিয়োগ করে আসছি'। শিরোনামে বোল্ড করে খোদাই করা হয়েছে শেখ মুজিবের উক্তি: 'বাঙলাকে অবশ্যই বাঙলার ভাগ্য নিয়ন্তা হতে হবে'। মূলভাব এমন যে, বাংলাকে যদি নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্তা হতে হয় তাহলে দেশের সম্পদ বা পুঁজি দেশেই রাখতে হবে। এই ভাবের হদিস সহজেই পাওয়া যেতে পারে পূর্ব পাকিস্তানের বেসরকারি খাতে অবাঙালিদের প্রাধান্য এবং সেই প্রাধান্য থেকে বর্ধিষ্ণু বাঙালি ব্যবসায়ী শিল্পপতিদের মুক্তিলাভের সুযোগ ও ক্রমাগত প্রচেষ্টার মধ্যে।

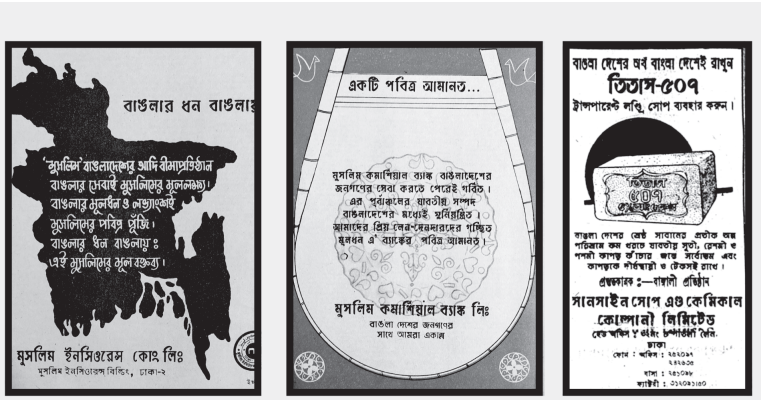

স্বাধিকারের ঘোষণা ও চেতনা

এই বিষয়বস্তুর প্রায় সমান্তরালে এসেছে স্বাধীকারের ঘোষণা। স্বাধিকারের প্রসঙ্গ এসেছে জনগণের 'চেতনা'র হাজিরা হিসেবে। অর্থাৎ, অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণ যে প্রতিবাদী চেতনা দেখিয়ে যাচ্ছেন সেটা 'নতুন চেতনা' এবং 'স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার চেতনা'। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক স্পষ্টভাবে বলেছে, 'বাঙলাদেশ আজ এক নতুন চেতনায় উদ্বেলিত। এ চেতনা নিজেকে নতুন করে জানার চেতনা। স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার চেতনা।' তাদের বিজ্ঞাপনে দুটো ছবি পাশাপাশি, একদিকে একজন কৃষকের ঊর্ধ্বে তুলে ধরা মুষ্টিবদ্ধ হাত, অন্যদিকে মিছিলরত জনতার ছবি। পাশে বড় করে লেখা 'একটি চেতনা একটি প্রত্যয়'। ইস্টার্ণ ব্যাংকিং কর্পোরেশন তাদের বিজ্ঞাপনে বড় করে লিখেছে শেখ মুজিবের উদ্ধৃতি, 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম'। মূল টেক্সটে লেখা আছে: 'বাংলা দেশের মানুষ আজ নতুন করে আবিষ্কার করেছে নিজের দেশকে। আবিষ্কার করেছে নিজেকে। পরিচয়ের প্রথম প্রহরেই তাই বাংলার মানুষের কণ্ঠে রক্ত নিনাদ ঘোষণা — স্বাধীকার'। এখানে যে পরিচয়ের কথা বলা হচ্ছে সেই পরিচয় হচ্ছে নিজেকে খুঁজে পাওয়া। নিজেকে খুঁজে পেয়েছে নিজের দেশকে 'আবিষ্কার' করার মাধ্যমে। পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রকাঠামোর মতাদর্শিক জগত থেকে বের হয়ে স্বতন্ত্র পরিচয় খোঁজার যে তাড়না ছিল তৎকালে, তার খুল্লামখুল্লা বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এই বিজ্ঞাপনের ভাষায়। নিজেদের অধিকার বিষয়ে সচেতনতার মাধ্যমেই যেন এই দেশ ও দশের বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠা। এশিয়াটিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ মুষ্টিবদ্ধ হাতের

ছবিওয়ালা বিজ্ঞাপনে এই পরিচয়কে অধিকারের সাথে জড়িয়ে তুলে ধরেছে: 'আত্মপরিচয় আমাদের জন্মগত অধিকার'। উপরে উল্লেখ করা হয়েছে দি ঢাকা আরবান কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিমিটেডের বিজ্ঞাপনের কথা। বক্তব্যমূলক সে বিজ্ঞাপনে সরাসরি দেশের সম্পদ দেশের রাখার কথা বলার পাশাপাশি নিজেদেরকে 'বাংলার স্বাধিকার অর্জনের পথে' সাহায্যকারী ব্যাংক হিসেবে ঘোষণা করেছে। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক লিমিটেড বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করেছে: 'আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বাধীকার দাবির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করি'।

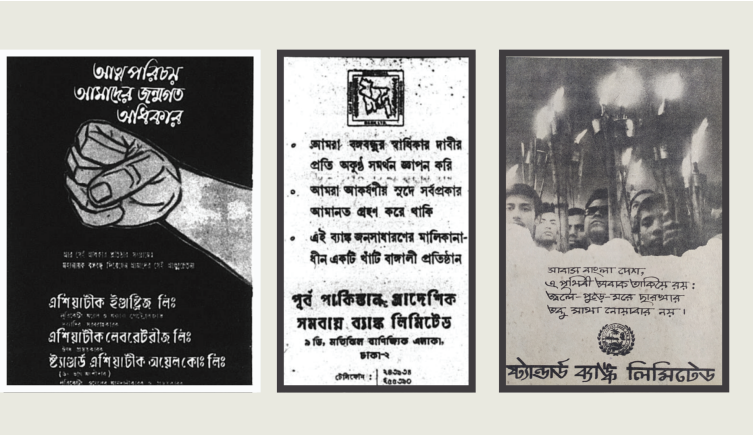

বিস্ময়কর লড়াই ও নব প্রভাতের ছটা

অধিকার আদায়ের এই সংগ্রাম যেন বিস্ময় তৈরি করছে। স্ট্যান্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড একটি মিছিলরত জনতার ছবির নিচে উদ্ধৃত করেছে সুকান্তের কবিতা: 'সাবাশ বাংলাদেশ/ এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়/ জ্বলে পুড়ে মরে ছারখার। তবু মাথা নোয়াবার নয়।' ফার্মাপাক একইভাবে উচ্চকিত বিস্ময় প্রকাশ করেছে; অভিনন্দন জানিয়েছে 'সাড়ে সাত কোটী বাঙালীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইকে'। হাবিব ব্যাঙ্ক জনগণের এই জেগে ওঠাকে কেন্দ্র করে বিজ্ঞাপন ছাপিয়েছে: 'যে জাতি অধিকার আদায়ের সংগ্রামে রক্ত পিচ্ছিল পথে এগিয়ে চলেছে আমরা তাদেরই সেবায় উৎসর্গীকৃত'। স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড স্বাধিকার আন্দোলনের 'সাফল্য কামনা'র পাশাপাশি এই 'স্বাধিকার আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছেন' তাদের 'আত্মার কল্যাণ কামনা' করেছে। পাকিস্তান টোবাকো কোম্পানি লিমিটেড মিছিলরত জনতার কয়েকটি ছবির নিচে লিখেছে: 'সব প্রেরণার মাঝেই নিহিত রয়েছে এক একটি বিরাট সম্ভাবনা'। নাভানা মিলনার্স এক দীর্ঘ বিজ্ঞাপনের শেষে এই জাগ্রত জনগণের মাঝে প্রেরণা খুঁজে পাওয়ার কথা উল্লেখ করেছে: 'জাগ্রত জনতার শক্তি আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছে নতুন প্রেরণায়। জয় জনতার জয়। জয় বাংলার জয়।' জনগণের জোয়ারকে কোনো বিজ্ঞাপন 'নতুন সূর্য' বলে প্রচার করেছে, কোনো বিজ্ঞাপন বলেছে 'নব প্রভাত ছটা..'। যেমন জুট মিল কেবল একটি সূর্যোদয়ের ছবি দিয়ে মোটা হরফে লিখেছে: 'ঐ পোহাইল তিমির রাত্রি পূর্ব গগণে দেখা দিল নব প্রভাতের ছটা..'। হাবিব ব্যাঙ্ক বাংলাদেশের মানচিত্রের ওপর সূর্যোদয়ের ছবির পাশে লিখেছে: 'কোটী প্রাণ একসাথে জেগেছে অন্ধরাতে/নূতন সূর্য ওঠার এই তো সময়'। এলিট কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ বিজ্ঞাপনে লিখেছে: 'রক্তে আনো লাল/রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে ছিড়ে আনো ফুটন্ত সকাল/উদ্ধত প্রাণের বেগে উন্মুখ আমার এ দেশ/ আমার বিধ্বস্ত প্রাণে দৃঢ়তার এসেছে নির্দেশ'। উল্লেখ্য, বিজ্ঞাপনে 'স্বাধিকার' থাকলেও 'স্বাধীনতা'র উপস্থিতি নাই বললেই চলে।

বঞ্চনাবোধ ও সোনার বাংলা

যে কারণে এত সংগ্রাম, জনগণের 'জেগে ওঠা' সেই লাঞ্ছনা-বঞ্চনা-বৈষম্য-না পাওয়ার বেদনা এগুলো ক্ষণে ক্ষণে এসেছে বিজ্ঞাপনে। কখনো বিখ্যাত কোনো কবির জবানে, কখনো-বা সহজ-সরল বক্তব্যে। বাংলা মায়ের

চেহারা যে মলিন হয়েছে, দীর্ঘদিন শোষিত হয়েছে, লাঞ্ছনার শিকার হয়েছে এবার সবকিছুর জবাব ফিরিয়ে দেওয়ার পালা। উপরোক্ত দুই অর্থনীতি, ছয় দফাসহ তৎকালের যাবতীয় রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার পটভূমি হিসেবে সক্রিয় ছিল পাকিস্তানের দুই অংশের ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের ছবি। পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তো ঘোষণা দিয়েছেই, এমনকি এই বৈষম্যকে খোদ পাকিস্তানের অনেক বিশ্লেষক 'ঔপনিবেশিক' বলে রায় দিয়েছেন।[১০] ষাটের দশকে বাঙালির যে জাতীয়তাবোধ তৈরি হয়েছিল তার পেছনে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন যেমন ভূমিকা পালন করেছে তেমনি এই বঞ্চনাবোধও সমানভাবে কার্যকর ছিল। রেহমান সোবহান বাঙালি জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি খুঁজতে গিয়ে বারেবারে এই বৈষম্যের কথা বলেছেন : যেমন, 'বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূলে ছিল আপেক্ষিক অর্থনৈতিক বঞ্চনার অনুভূতি...'।[১১] বৈষম্যবোধ বা বঞ্চনাবোধ কতটা প্রবল ছিল তার একটা আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন' পোস্টারের তুমুল জনপ্রিয়তায়। এই পোস্টারে বিভিন্ন খাতে পাকিস্তানের দুই অংশের বিবরণ উল্লেখ ছিল। অর্থাৎ, বাঙালি যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিপীড়ন, বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার হচ্ছে, তা ছিল সে সময়ের শক্তিশালী ভাবনা। যাবতীয় পরিসংখ্যানও তেমন পরিস্থিতির জানান দিচ্ছিল। বিজ্ঞাপনেও এই ভাবনার হাজিরা তাই স্বাভাবিক। নাভানা মিলনার্স একেবারে সরাসরিই সেই বক্তব্য পেশ করছে তাদের বিজ্ঞাপনে: 'আঘাতে আঘাতে জর্জরিত আমার সোনার বাংলা দেশ।

আঘাত এসেছে বাংলা ভাষার উপর। এসেছে সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ আর শিল্পের উপর। কিন্তু, রক্তাক্ত দেহে বাংলার বীর জনতা প্রতিহত করেছে সব আঘাত..'। জুট ট্রেডিং কর্পোরেশন বিজ্ঞাপনে সেই 'হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি'কে তুলে ধরেছে: 'সোনার বাংলা, সবুজ ক্ষেত, সোনালী আঁশ, কিষাণের হাসি... সব যেন হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি'। পূর্ব পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন তাদের বিজ্ঞাপনে মোটা হরফে 'সোনার বাংলা' লিখে মূল টেক্সটে সেই বঞ্চনার কথা বলেছে: 'গোলাভরা ধান পুকুর ভরা মাছ আজ কল্পকথা মাত্র। দারিদ্র্য ও ক্ষুধার গ্লানি ও কালিমায় বাংলা আজ বিবর্ণ, মলিন'। ইউনাইটেড ব্যাংকের বিজ্ঞাপনে সেই প্রশ্ন ছিল: 'কেন গো মা তোর ধুলায় আসন, কেন গো মা তোর মলিন বেশ?' পাকিস্তান ন্যাশনাল অয়েলস বিজ্ঞাপনে 'বাঙলার সোনালী দিনগুলো ফিরিয়ে' আনার কথা বলেছে। শোষণ ও বঞ্চনার অভিজ্ঞতার সাথে এই 'সোনার বাংলা' ধারণার সম্পর্ক ওতপ্রোত। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যাঁতাকলে নিষ্পেষিত বাঙালির চিন্তায় এই 'সোনার বাংলা' ধারণা চাউর হয়েছিল। এটা হারিয়ে যাওয়া এক উর্বরকালকে ইঙ্গিত প্রদান করে। ১৮৬২ সালে প্রকাশিত *হুতোম প্যাঁচার নকশায়* বলা হয়েছে, 'হ্যানো সোনার বাংলা খান, পুড়ালো নীল হনুমান'। নীল বিদ্রোহের লোকগীতির একটি চরণেও পাওয়া যায়, 'নীল বাঁদরে সোনার বাংলা করলে ছারখার'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা'ও লেখা হয়েছিল এক বিদ্রোহের কালে।[১২] পাকিস্তান জমানায় ঔপনিবেশিক কায়দায় শোষিত হওয়ার অভিজ্ঞতা ও বঞ্চনাবোধ 'সোনার বাংলা'কে সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক রেটরিকে রূপান্তরিত করেছিল। কিন্তু মার্চের এই জাগরণ যেন আবারও সোনালী দিন নিয়ে আসার অঙ্গীকার। যে স্মৃতি হারিয়ে গিয়েছিল, 'বাংলা দেশের জনতার জাগরণ দেখলে মনে হয় আমরা ফিরে পেয়েছি আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের সত্তা'। এই 'পচা অতীত'কে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে প্রিমিয়ার ইন্সুরেন্স কোম্পানি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা উদ্ধৃত করছে : 'আমরা চলিব পশ্চাতে ফেলি পচা অতীত/ গিরি-গুহা ছাড়ি খোলা প্রান্তরে গাহিব গীত।' যে বিবর্ণ, শুষ্ক ও মলিন চেহারা হয়েছে বাঙালির, সেখানে হাসি ফোটানোই যেন এই আন্দোলনের ব্রত, অঙ্গীকার। মুনলাইট সিলক মিলস রীতিমতো হুঙ্কার ছাড়ছে শত্রুর প্রতি, 'বন্ধু, তোমার ছাড় উদ্বেগ, সুতীক্ষ্ণ কর চিত্ত/ বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাটি, বুঝে নিক দুর্বৃত্ত... '। এই 'দুর্বৃত্ত' কে তা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা না হলেও তৎকালের

পরিস্থিতিতে দুর্বৃত্তের পরিচয় পাওয়া আমাদের জন্য দুষ্কর নয়।

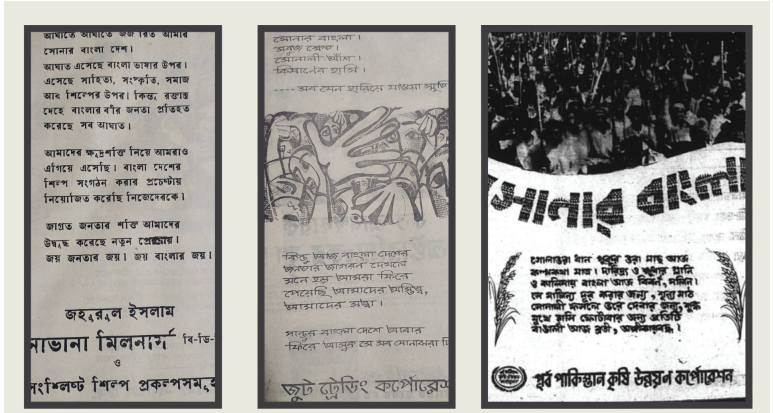

দেশ এর কল্পনা

অনেকগুলো বিজ্ঞাপনে এমন কোনো বক্তব্য হাজির না করে বরঞ্চ দেশাত্ববোধক গান বা কবিতা তুলে ধরেছে। এখানে 'দেশ' আর পাকিস্তান নয়, যদিও রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান বহাল আছে তখনো। এই দেশ, এই সৌন্দর্যবোধ, 'সকল দেশের সেরা' বলে ঘোষণা সব আসলে এমন এক দেশকে কল্পনা করে রাষ্ট্র হিসেবে যার আবির্ভাব হবে কি না তা তখনো কেউ নিশ্চিত নয়। রাজনৈতিক গতিপথ কোনদিকে যাবে তা নিয়ে খোদ রাজনৈতিক মহলই ছিলেন ধোঁয়াশাচ্ছন্ন। কিন্তু কবিতার ভাষা দিয়ে বিজ্ঞাপনে

মোটামুটি সেই আসন্ন দেশ কল্পনাতে হাজির করেছে। সেখানে বাংলাদেশের মানচিত্র এবং বাংলাকে নিয়ে রচিত বিভিন্ন গান-কবিতা এটার প্রধান অনুষঙ্গ ছিল। যেমন, ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক তাদের বিজ্ঞাপনে কখনো দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'ধনধান্য পুষ্পভরা', কখনো কাজী নজরুল ইসলামের 'কাণ্ডারি হুঁশিয়ার', 'খাটি সোনার চেয়ে খাঁটি' কবিতা প্রকাশ করেছে। পূবালী জুট মিলস, হোমল্যান্ড ইনসিওরেন্স কোঃ লিঃ, ফার্মাপাক, দাউদ গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ, মুসলিম ইনসিওরেন্স কোং লি:, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিমিটেড, হাবিব ব্যাঙ্ক, মুনলাইট সিলক মিলস, বাটা তাদের বিজ্ঞাপনে মানচিত্র ব্যবহার করেছে। বাটা তাদের বিজ্ঞাপনে মানচিত্রের ওপর এক লম্বা কবিতা ছেপেছিল। কবিতায় উপরোক্ত সবগুলো বক্তব্যই ছিল, নতুন 'সূর্য উঠেছে', 'বর্গী'দের তাড়াতে হবে', 'দস্যুগুলো পালিয়ে গেছে আঁধার হয়েছে ক্ষয়'। পাশাপাশি, 'পদ্মা, মেঘনা, যমুনা' হয়ে উঠেছে 'মুক্তিধারা সীমানা'। উল্লেখ্য, 'পদ্মা মেঘনা যমুনা, তোমার আমার ঠিকানা' তৎকালের এক জনপ্রিয় স্লোগান। ঠিকানা বা সীমানা যে পাকিস্তানের পশ্চিম অংশ ছেড়ে পূবের অংশেই থিতু হচ্ছে তার নিশানা যেন ধরা পড়ছিল স্লোগান ও বিজ্ঞাপনে। পূর্ব পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন তাদের বিজ্ঞাপনে উপস্থিত দেশের কল্পনা তৈরি করেছে: 'গ্রাম বাংলার স্বপ্ন, মাঠ ভরা ফসল, পুকুর ভরা মাছ আর গোয়াল ভরা গরু'। কিন্তু যেহেতু তাদের কেবল গ্রামে হবে না, আধুনিক উন্নয়ন দরকার, সেহেতু বিজ্ঞাপনের দ্বিতীয়াংশে বলেছে, 'সাত কোটির কল্পনা কারখানার সাইরেন, চিমনীর ধোঁয়া আর কলকব্জার শব্দ।' এই স্বপ্ন ও কল্পনাকে রূপ দিতে চান তারা। ইস্টার্ণ ব্যাংকিং করপোরেশন লিমিটেড বিজ্ঞাপনে ছেপেছে: 'এ দেশ আমার গর্ব, এ মাটি আমার চোখের সোনা/ আমি করি তারই জন্মবৃত্তান্ত ঘোষণা'। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিমিটেড বিজ্ঞাপনে লিখেছে: 'বাঙলার মাটি, বাঙলার জল/ বাঙলার বায়ু, বাঙলার ফল ধন্য হোক, ধন্য হোক...'।

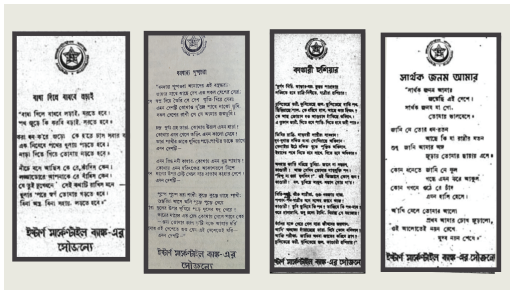

শহিদদের স্মরণ

একদিকে মার্চের জাগরণ বিভিন্ন 'বিস্ময়'রূপে হাজির হচ্ছিল বিজ্ঞাপনে, অন্যদিকে কিছু কিছু বিজ্ঞাপন এই সময়ে স্মরণ করছিল প্রাক্তন সংগ্রামের শহিদদের। সে সময়ে বাঙালি চেতনার সবচেয়ে প্রভাবশালী ঘটনা ছিল বায়ান্ন-র ভাষা আন্দোলন। একাত্তরের ফেব্রুয়ারি মাসে বিভিন্ন কোম্পানি বায়ান্নকে স্মরণ করে বিজ্ঞাপন ছেপেছিল। মার্চে এসে বায়ান্নের সংগ্রামের সাথে চলতি সংগ্রামের যোগসূত্র টানা হচ্ছে। ব্যতিক্রমী এমন বিজ্ঞাপন ছাপায় বাটা। শহিদ মিনারের ছবি সম্বলিত বিজ্ঞাপনে মোটা হরফে লেখা ছিল 'মুক্তির শহীদ'। মূল টেক্সট হচ্ছে: 'বাংলা দেশের যে সব নাম না জানা বীর বুকের রক্ত দিয়ে আমাদের মুক্তির সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, আজ নতুন সূর্যোদয়ের প্রথম প্রহরে তাদের আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি'। ছবিটাও তাৎপর্যপূর্ণ: শিকলে বাঁধা শহিদ মিনার, কিন্তু শিকল ছিঁড়ে যাচ্ছে। ছবিতে শহিদ মিনার ব্যবহার করলেও স্মরণ করা হয়েছে পাকিস্তান জমানার বিভিন্ন সংগ্রামে প্রাণ হারানো লড়াকুদের। তবে ভাষার সাথে বাঙালি জাতীয়তাবোধের এমন সম্পর্ক ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিমিটেডের বিজ্ঞাপনে ফুটে উঠেছে। মোটা হরফে বাংলা অক্ষর, নিচে লেখা: 'একটি বাঙলা অক্ষর: একটি বাঙালীর জীবন'।

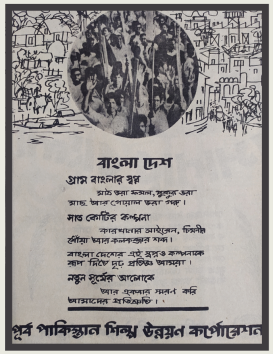

শেখ মুজিবের প্রতি সমর্থন

মার্চের এই জাগরণ যে 'ঐতিহাসিক', এই জাগরণে 'হাতে হাতে ফেরে দেনা পাওনার খাতা', এই জাগরণ যে 'রোমাঞ্চকর', 'প্রেরণাদায়ক' ও 'সম্ভাবনাময়' এমন বক্তব্য প্রায় অধিকাংশ বিজ্ঞাপনে ছিল। আদমজী ইন্সুরেন্স কোম্পানি বিজ্ঞাপনে বলছে, 'বাংলা দেশ জুড়ে আজ যে সংগ্রাম, তার চরম লক্ষ্য নিরাপত্তা আর নিশ্চয়তা।' কিছু কিছু বিজ্ঞাপনে শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি ছিল। যেমন পূবালী জুট মিল শেখ মুজিবের ছবি ব্যবহার করে মোটা হরফে লিখেছে: 'আমরা তোমার পিছনে'। কিছু কিছু বিজ্ঞাপনে শেখ মুজিবের বক্তৃতা উদ্ধৃত করেছে। মুজিবের জনপ্রিয়তা তখন প্রায় সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। এমনকি সত্তরের বিজয়ের পরও তাঁকে নিয়ে বেশ কিছু বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়েছে। ফেব্রুয়ারিতে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বেশ কিছু বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়েছে *ইত্তেফাকে*। সেখানে তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' 'বাংলার মুক্তিকামী মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক', 'স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার অগ্রণীসেনা', 'গণতন্ত্রের অতন্দ্র-প্রহরী', 'নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের মুক্তির দূত' ইত্যাদিতে ভূষিত করা হতো। তবে বিজ্ঞাপনের ভাষায় স্বাধিকার আন্দোলন নিয়ে এত স্পষ্ট অভিব্যক্তি মার্চের পূর্বে দেখা যায় না।

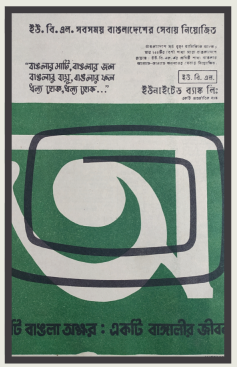

শেষ কথা

মার্চের বিজ্ঞাপনগুলোতে দেখা যায়, কোনো কোম্পানি তাদের পণ্য প্রচার করছে না। অর্থাৎ, কে কী পণ্য বিক্রি করেন সেটার উল্লেখ নাই, বরঞ্চ আছে কেবল ব্রান্ডিং। দেখা যাচ্ছে, বিজ্ঞাপনে কেবল একটা কবিতা আছে, সাথে রয়েছে কোম্পানির নাম। আর কিছুই নেই। কোম্পানির ধরনের সাথে মিলিয়ে জাগরণ ও স্বাধিকারের চেতনাকে হাজির করা হতো। দেশের সম্পদ দেশে রাখা, বা দেশীয় পণ্য ব্যবহার করার অনুরোধ জানানোর পাশাপাশি আরেকটি প্রবণতা চোখে পড়ার মতো; কোম্পানি যে 'খাঁটি বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান', 'বাংলার সব মানুষের সঙ্গে এক হয়ে কাজ করছে', 'বাংলা দেশের সেবায়' নিয়োজিত, 'বাঙলাদেশের প্রতিষ্ঠান/ব্যাঙ্ক', 'জনতার সাথে এগিয়ে চলছে' এসব প্রায় সকল বিজ্ঞাপনেই উল্লেখ থাকত। মার্চ মাসে যত সময় গড়িয়েছে ততই বিজ্ঞাপন প্রকাশের হার বেড়ে গিয়েছে। বিজ্ঞাপনের ভাষাতেও তৎকালের জাতীয়তাবোধের সবচেয়ে আধিপত্যশীল বয়ানের উপস্থিতি। যে বাংলাদেশের কল্পনা নির্মিত হচ্ছিল সেটা বাঙালিদের নিয়েই। এই বাঙালির পরিচয়ের অন্যতম উপাদান ছিল বাংলা ভাষা। অন্য কোনো জাতিসত্তার উপস্থিতি এই বৃহৎ-বয়ানে থাকার কথাও নয়, ছিলও না। মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও পূর্ব পাকিস্তানের ব্যবসায়িক গোষ্ঠী (বা বামপন্থী রেটরিকে বলা যায় বুর্জোয়া) এই বয়ানে খুব স্বাচ্ছন্দ্যেই এঁটে গিয়েছিল। আওয়ামীলীগ ও শেখ মুজিবের প্রতি তাদের যে পূর্ণ সমর্থন ছিল সেটাও পরিষ্কার। তদপুরি দুটো বিষয় নজর এড়ায় না। এক, বিজ্ঞাপনের ভাষাতে আন্দোলনের উপস্থিতি আসলে মার্চের

প্রথম দশদিনের পর। এর মধ্যে ৭-ই মার্চে শেখ মুজিবের ভাষণ হয়ে গিয়েছে, ৯-ই মার্চে ভাসানীও ভাষণ দিয়ে দিয়েছেন। শেখ মুজিবের নির্দেশেই তখন আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছিল। অর্থাৎ, ব্যবসায়িক/ধনিক গোষ্ঠী এত খুল্লামখুল্লা ভাবে স্বাধিকার ও জনগণের জাগরণের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন তুঙ্গে ওঠার পর। দুই, স্বাধিকার ও বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে সকল রাজনৈতিক মহলের দাবিদাওয়াতে স্পষ্ট উচ্চারণ থাকলেও মার্চের এই সময়ে আসন্ন পরিস্থিতি নিয়ে মূলধারার নেতাদের মধ্যে প্রচুর ধোঁয়াশা ছিল। কিন্তু ব্যবসায়িক গোষ্ঠী অন্তত এটা নিশ্চিত হয়ে যায় যে, পরিস্থিতি যেখানে গিয়েছে সেখান থেকে আর পেছনে ফিরে আসা যাবে না। স্বাধিকার বা এমন কোনো একটা গন্তব্য যে অনিবার্য সেটা তাদের বিজ্ঞাপনের ভাষার দ্ব্যর্থহীনতা থেকে স্পষ্ট।

তথ্যনির্দেশ :

১. দেখুন, Zheng Wang, *Memory Politics, Identity and Conflict: Historical Memory as a Variable*, Palgrave Macmillan, 2018; Philip Spencer and Howard Wollman, *Nationalism: A Critical Introduction*, Sage Publications, 2002

২. Benedict Anderson, *Imagined Community*, Verso, 1991

৩. স্মৃতির জন্য দেখা যেতে পারে Zheng Wang, 2018; দেশভাগ ও সহিংসতার স্মৃতি কীভাবে ভারতে পরিচয় নির্মাণে ভূমিকা পালন করেছে তার দুর্দান্ত বিবরণ রয়েছে জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডের বইতে। Gyanendra Pandey, *Remembering Partition: Violence, Nationalism and History in India*, Cambridge: Cambridge University Press, 2001. আরও দেখা যেতে পারে, Dan Stone, 'Genocide and Memory', *The Oxford Handbook of Genocide Studies*, Edited by Donald Bloxham and A. Dirk Moses, Oxford University Press, 2010

৪. Shehreen Islam K. "Advertising nationalism: Commemorating the liberation war in Bangladeshi print advertisements." *Media, War & Conflict*. September 2020. doi:10.1177/1750635220950365

৫. উদ্ধৃতি: আবুল কাসেম ফজলুল হক, *মুক্তিসংগ্রাম*, আগামী প্রকাশনী, ১৯৭২, পৃ. ১৯৪

৬. Zillur R. Khan, "March Movement Of Bangladesh : Bengali Struggle For Political Power", *The Indian Journal of Political Science*, Vol. 33, No. 3, July-Sept., 1972, pp. 291-322

৭. ১৯৭১ সালের মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিদিনের বিবরণ নিয়ে বিস্তর গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে, রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, *৭১-এর দশমাস*, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৮; বিভাগভিত্তিক বিবরণীর জন্য দেখতে পারেন, হোসনে আরা খানম, *১৯৭১: অসহযোগ আন্দোলনের কালপঞ্জি* , গণহত্যা জাদুঘর, ২০২০; হোসনে আরা খানম, *একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলন*, সময় প্রকাশনী, ২০২১।

৮. Ishtiaq Hossain, 'Bangladesh: civil resistance in the struggle for independence, 1948-1971', Maciej Bartkowski (ed.), *Recovering Nonviolent History: Civil Resistance in Liberation Struggles*, Viva Books, 2013, p. 199-216

৯. নুরুল ইসলাম, 'ছয় দফা ও দুই অর্থনীতি', *প্রতিচিন্তা*, ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৭। নুরুল ইসলাম ও রেহমান সোবহানের লেখাপত্রে দুই অর্থনীতি নিয়ে বিস্তর আলাপ আলোচনা রয়েছে। পাশাপাশি, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যে কোনো বইতেই এ সংক্রান্ত আলাপ থাকে। দুটো উল্লেখযোগ্য বই হচ্ছে: Nurul Islam, *Making of a Nation Bangladesh: An Economist's Tale*, The University Press Limited (UPL), 2013; রেহমান সোবহান, *বাংলাদেশের অভ্যুদয়: একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য*, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮

১০. তারিক আলী, *পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ: জান্তা না জনতা*, (অনুবাদ মাহফুজ উল্লাহ), বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭, মূল গ্রন্থ: ১৯৭০

১১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য রেহমান সোবহানের বই দ্রষ্টব্য।

১২. এই উদ্ধৃতিগুলো নিয়েছি আকবর আলি খানের বই থেকে। *দারিদ্র্যের অর্থনীতি: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ*, প্রথমা, ২০২০

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

দৈনিক ইত্তেফাক এর জন্য মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ এর প্রতি কৃতজ্ঞতা। *মর্নিং নিউজ*, *আজাদ* ও *পাকিস্তান অবজার্ভার* ব্যবহার করতে দেয়ার জন্য খুলনাস্থ গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘরের প্রতি কৃতজ্ঞতা।

মদিনার সঙ্কট: মদিনার রহমত

আবীর আহমেদ

১

মানুষ যদি কেবল রাজনৈতিক জীব হয় তাহলে মাটির দুনিয়ার রাজনৈতিক অবতার 'রাষ্ট্র' এবং সেই রাষ্ট্রের মধ্যে মানব জীবনের রাজনৈতিক অবতার 'নাগরিক' নামক বর্গের বাইরে শুদ্ধ মানুষ বলে কি কিছু আছে? রাষ্ট্রের মধ্যে নাগরিক পরিচয়ের বাইরে কেবল মানুষ হিসেবেই কোনো জীবনকে কি আঁটানো যায়? এ ধরনের প্রশ্নগুলো দীর্ঘকাল যাবত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলাপের অংশ হয়েছে। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে-পরে বিভিন্ন জাতিরাষ্ট্র থেকে নাগরিক পরিচয় হারানো মানুষের ঢল এবং তারই পরিণতিতে ঐ সময়টাতে সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাগুলো নিয়ে ব্যাপক তোড়জোড় দেখা গেছে। এই ঘোষণাগুলোতে মূলত নাগরিক পরিচয়ের বাইরে শুদ্ধ মানুষ পরিচয়কে স্বীকৃতি দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে—প্রত্যেক মানুষ জন্মগতভাবে কিছু অবিচ্ছেদ্য ও অহস্তান্তরযোগ্য অধিকার পাওয়ার অধিকারী বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এই অধিকার নিশ্চিত করার জিম্মাদার করা হয়েছে আধুনিক রাষ্ট্র নামক সেই প্রতিষ্ঠানকেই যার সার্বভৌম ক্ষমতার বলি হয়ে মানুষ নাগরিক পরিচয় হারিয়ে শুদ্ধ মানুষে পরিণত হয়েছিল। রাষ্ট্র নামক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, যা কি না নাগরিক পরিচয়ের বাইরে আর কোনো জীবনের অধিকার স্বীকার করতে বাধ্য নয়, তার হাতেই নাগরিক অধিকার হারানো মানুষের জীবন তুলে দেয়ার মধ্যে যে সংকট হাজির আছে তার বিচার গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক চিন্তার সিলসিলা বহন করে।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তিগুলোতে আধুনিক জাতিরাষ্ট্রগুলো ঈমান আনলেও এই চুক্তিগুলো শুদ্ধ মানুষের অধিকার নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রকে বাধ্য

করতে পারে না। অর্থাৎ নাগরিক নয় এমন যে-কোনো জীবন এ সমস্ত রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে নিপীড়নের শিকার হলে তার প্রতিকার করা সেই রাষ্ট্রের একান্ত ইচ্ছাধীন ব্যাপার। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে কিছু উপায়ে চাপ সৃষ্টি করা ছাড়া এক্ষেত্রে কারও বিশেষ কিছু করার নাই। নাগরিক অধিকার হারানো এই সমস্ত মানুষ নিজেরা সংগঠিত হয়ে অধিকার আদায়ে সোচ্চার হবে সেটুকু রাজনৈতিক অধিকারের আস্তরণ পর্যন্ত এমন নগ্ন শরীরে থাকে না। জার্মান দার্শনিক হান্না আরেন্ট, যিনি নিজেও নাজি জার্মানি থেকে বিতাড়িত হয়ে শরণার্থী জীবন যাপনে বাধ্য হয়েছিলেন, উপলব্ধি করেছেন যে, রাজনৈতিক অধিকারবঞ্চিত মানুষের 'অধিকার চাওয়ার অধিকার'ই থাকে না। 'অধিকার চাওয়ার অধিকার' থাকার জন্য তাদের প্রথমে কোনো না কোনো রাজনৈতিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত হতে হয় (অরিজিনস, ২৯৬)। যেমন নাগরিকত্ব হারানো রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অধিকার চাওয়ার অধিকার নাই। যেমন নুরেমবার্গ আইনের (১৯৩৫) আওতায় জার্মানির একটা বিশাল জনগোষ্ঠী নাগরিকত্ব হারিয়ে শুদ্ধ জীবনে পরিণত হওয়ার পরে নিজেদের ওপর হওয়া অন্যায়ের বিচার চাওয়ার অধিকার তাদের ছিল না। এমন জীবনের কোনো আইনি অধিকার না থাকায় এর ওপর হওয়া সহিংসতার প্রতিকার চেয়ে কোনো আইন, কোনো আদালতে বিচার চাওয়া যায় না। বলা যায়, উন্মুক্ত জীবনের ওপর সংঘটিত অন্যায় আর আইনত অন্যায় থাকে না। রাজনৈতিক অধিকার হারানো মানুষ চূড়ান্ত রাজনৈতিক ক্ষমতার হাতে এমন এক পশু চরিত্রে পরিণত হয় যার জন্য ন্যায়-অন্যায়ের মতো ধারণাগুলো মিলেমিশে একাকার হয়ে অর্থহীনতার জগতে প্রবেশ করে। এমন মানুষের জীবন শুদ্ধ জীবের জীবন। সমস্ত ধরনের অধিকারের আবরণবিহীন নগ্ন জীবন। এমন জীবনের সাথে যা ইচ্ছা তাই করা যায়। তাকে দাস বানানো যায়, কেনা-বেচা করা যায়, প্রয়োজন কিংবা অপ্রয়োজনে হত্যা করা যায়। এ সমস্ত অন্যায়ের কিছুই অন্যায় বলে বিবেচিত হয় না; কারণ যে জীবনের ওপর এই সহিংসতা চলমান সে নিজেই আইনের বাইরে—রাজনৈতিক অধিকারের বাইরে—এক পশুতুল্য চরিত্র।

তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হলো, রাজনৈতিক পরিচয় হারানো এই জীবের জীবন প্রবলভাবে রাজনৈতিক, কারণ রাজনৈতিক ক্ষমতার উত্তাপ তার নগ্ন শরীরের চেয়ে বেশি কে আর আঁচ করতে পারে? নাগরিক জীবনের মতো এখানে চূড়ান্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা (সার্বভৌম ক্ষমতা) আর শুদ্ধ জীবনের মাঝে এমন

কোনো পর্দা নাই, এমন কোনো তাবিজ নাই যা সার্বভৌমত্বের মতো অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার উত্তাপ থেকে তার শরীরকে রক্ষা করতে পারে। শুদ্ধ জীবের জীবন সার্বভৌম ক্ষমতার সামনে পুরোপুরি উন্মোচিত এক জীবন। রাজনৈতিক অধিকারহীন হওয়ার কারণেই চূড়ান্ত রাজনৈতিক এই জীবন। তাই এই নগ্ন জীবনকে জর্জো আগামবেন যখন 'রাজনীতি নিরপেক্ষ' জীবন বলে মত দেন, তখন *মদিনা*র লেখক পারভেজ আলম এর বিরোধিতা করেন। আগামবেনের মতে, আগের কালে যে জীবের জীবন (মানুষ নামক জীব) বা উন্মুক্ত জীবন ছিল একান্তই আল্লাহর অধীন ও রাজনীতি নিরপেক্ষ জীবন—আধুনিক অধিকারের দলিলগুলো সেই জীবনকে জাতিরাষ্ট্রের আইনি-রাজনৈতিক অনুশাসনের মধ্যে অন্তর্ভুক্তিরই প্রতিনিধিত্ব করে (মদিনা ৭৫)। আগামবেনের এই বক্তব্য *মদিনা*র লেখককে রীতিমতো বিভ্রান্ত করেছে। ঐ প্রবন্ধের পরের অনুচ্ছেদেই দেখা যায় তিনি আগামবেনের আরেক বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন যেখানে আগামবেন উন্মুক্ত জীবের জীবনকে উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে 'রাজনৈতিক' বলে মত দিচ্ছেন। পারভেজ আলম ধরে নিয়েছেন যে, এমন জীবনের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যকে বিশেষ জোর দিয়ে বোঝাবার প্রয়োজন থেকেই আগামবেন শব্দটাকে উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে বন্দী করেছেন। সেক্ষেত্রে আগামবেনের বক্তব্য কেবল যে সাংঘর্ষিক তাই নয়; পারভেজের মনে হয়েছে যে, এতে করে "মানুষের জীবের জীবন বা উন্মুক্ত জীবনের রাজনৈতিক সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক এলাকা আগামবেনের ঐতিহাসিক চেতনার দিগন্তে অনুপস্থিত অথবা ঝাপসা থেকে গেছে"। *মদিনা*র লেখকের এই উপলব্ধিগুলো মূল্যবান; এবং আমরা এই উপলব্ধিগুলো বিচার করে দেখতে আগ্রহী। কারণ, এই উপলব্ধিগুলোর বিচার জর্জো আগামবেন কিংবা পারভেজ আলমকে ছাপিয়ে জীবন ও রাজনীতির এক জটিল অথচ বাস্তব দুনিয়া আমাদের সামনে মেলে ধরে, যেখানে আমরা প্রত্যেক 'আধুনিক মানুষ' নিজেকে দেখতে পারব। বর্তমান প্রবন্ধ সেই দুনিয়ারই বিচার।

২

'মদিনা' শব্দটির অর্থ নগর। পলিটিকস শব্দটি যে গ্রিক শব্দ পোলিস (polis) থেকে এসেছে তার অর্থও নগর। এই নগরের জীবনই নাগরিক তথা রাজনৈতিক তথা আইনের অধীন জীবন। সহজ বিপরীত অর্থ জুড়ে নিয়ে

আমরা ধারণা করতে পারি যে, নগর বা সমষ্টি বা রাজনীতি বা আইনের বাইরে মানুষের যে জীবন আছে (যদি থেকে থাকে) তা ব্যক্তিগত জীবন, ঘরের জীবন, অরাজনৈতিক জীবন। দশজন মানুষ একসাথে থাকার প্রয়োজনে গঠিত সামষ্টিক ব্যবস্থায় কিছু বিধিবিধান যুক্ত করা হয় যা প্রত্যেকে মেনে চলবে বলে চুক্তি হয়। সাথে সাথে, এই চুক্তির অধীন যে নগরভুক্ত জীবন, সেই নাগরিক জীবন নগর কর্তৃক কিছু অধিকার প্রাপ্ত হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় আইন এমন একটি ধারণা যা কেবল মাত্র নগর ও নাগরিক জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। স্বাভাবিক অবস্থায় জীবনের ব্যাপক কলেবর স্বভাবতই আইনের বাইরে থাকতে পারে। কিন্তু সমস্যা হলো কিছু নিয়ম কেবল নিয়ম মাত্র নয়—সার্বভৌম নিয়ম। সার্বভৌম নিয়ম নিয়মের সীমানা অতিক্রম করে স্বাভাবিক অবস্থায় যা নিয়মের ব্যতিক্রম তাকে নিয়মের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেই সার্বভৌম হয়। তাই আগামবেন বলেন, সার্বভৌমত্ব হলো আইনের বাইরের আইন (হোমো স্যাকের, ৫৯)। আইনের স্বাভাবিক সীমানার মধ্যে যা করা সম্ভব নয়, আইনের চূড়ান্ত রূপ সার্বভৌম ক্ষমতার মধ্যে তা সম্ভব।

সার্বভৌম গুণ লাভ করে আইন তার সীমানা (নাগরিক/রাজনৈতিক জীবনের সীমানা) অতিক্রম করে মানুষের জীবনে (অরাজনৈতিক/শুদ্ধ জীবন) প্রবেশ করে। সার্বভৌম ব্যবস্থা স্বাভাবিক ব্যবস্থার মতো কেবল মানুষের সামষ্টিক জীবন নিয়ে কাজ করে না; বরং সেই স্বাভাবিক ব্যবস্থাকে বাতিল করে। স্বাভাবিক কাঠামোর পক্ষে যে সীমানা (বিধিবদ্ধ জীবনের সীমানা) অতিক্রম করা সম্ভব হয় না, সার্বভৌম ক্ষমতায় সেই সীমানা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। অর্থাৎ, সার্বভৌম এলাকায় নিয়ম ও ব্যতিক্রম, আইন ও জীবন তাদের স্বাভাবিক সীমানা হারিয়ে একাকার হয়ে যায়। রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক উভয় জীবনকে নিজের মধ্যে ধারণ করে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনের ধারণা হাজির করে যার বাইরে আর কোনো জীবনের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। এমন এলাকায় কাঠামো ও জীবন সমার্থক ধারণা। জার্মান দার্শনিক কার্ল স্মিটের ভাষায়, এরকম একটি অবস্থানে দাঁড়িয়েই সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করে—আমি, সার্বভৌম ক্ষমতা, যার অবস্থান আইনের বাইরে, ঘোষণা করছি যে, আইনের বাইরে কিছু নাই (স্মিট, পলিটিকাল থিওলজি, ১৩)।

এভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় সামষ্টিক নিয়মের বাইরের জীবন, সার্বভৌম ক্ষমতার এলাকায় নিয়মের মধ্যে পুরোপুরি উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক

অধিকারের আবরণহীন এই নগ্ন শরীরে এমন কিছু থাকে না যা তাকে ক্ষমতার সহিংসতা থেকে রক্ষা করতে পারে। সার্বভৌম আইন, আইনি পথে, এমন জীবনের সাথে যে কোনো কিছু করতে পারে যা বে-আইনি বলে সাব্যস্ত হবে না। এমন ব্যবস্থার মধ্যে আইন তার চূড়ান্ত সীমায় দাঁড়িয়ে দাবি করতে পারে যে, আইনের বাইরে কোনো অধিকার নাই; আইনের বাইরে ন্যায়ের অন্য কোনো ধারণা নাই, আইনের বাইরে মানুষের কোনো জীবন নাই। এজন্যই আগামবেন আধুনিক সার্বভৌম রাষ্ট্রকে ক্যাম্প হিসেবে বিচার করতে চান। চূড়ান্ত রাজনৈতিক স্পেস হিসেবে ক্যাম্প আইনের বাইরে কোনো জীবন থাকতে পারে বলে স্বীকার করে না। ক্যাম্পে আটকা পড়া জীবনে যা কিছুই ঘটুক না কেন তাকে আইনত অন্যায় বলে বিচার করার সুযোগ থাকে না। ক্যাম্পের জীবন আইন বহির্ভূত জীবন শুধু নয়; বরং আইনের চূড়ান্ত ক্ষমতার মধ্যে আটকা পড়া এক জীবন। সার্বভৌম এলাকায় রাজনৈতিক অধিকার বিহীন মানুষ যে আইন থেকে বহিস্কৃত হয়েছে সে-ই আবার আটকা পড়েছে সেই বহিষ্কারের মধ্যে।

নাজিবাদী আইন বিশেষজ্ঞ কার্ল স্মিট তার সময়ের জার্মানিতে বার বার ঘোষিত হওয়া জরুরি অবস্থাকে একটা শক্ত আইনি ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোর প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। জরুরি অবস্থা হলো আইনের ব্যতিক্রম অবস্থা— যে অবস্থায় আইন বাতিল হয়ে যায়। অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় আইনত যা ঘটার কথা জরুরি অবস্থায় সেটি ঘটে না। যেমন বাংলাদেশের সংবিধানে নাগরিকের মত প্রকাশ, চিন্তা, চলাফেরার অধিকারসহ আরও কিছু অধিকারকে মৌলিক অধিকার বলে আইনি সুরক্ষা দেয়া আছে। স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো নাগরিক এ সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে তাকে অন্যায় বলার সুযোগ আছে; এই অন্যায়ের বিচার চাওয়ার জন্য আইন-আদালত আছে। কিন্তু জরুরি অবস্থায়, যখন আইন বাতিল হয়ে যায়, তখন নাগরিকেরা স্বাভাবিক অবস্থার মতো এই সমস্ত অধিকার পাওয়ার অধিকারী থাকে না। আমরা দেখেছি 'অধিকার পাওয়ার অধিকার' না থাকা, নগ্ন জীবনের বৈশিষ্ট্য, জরুরি অবস্থায় যা প্রত্যেক জীবনের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। অর্থাৎ জরুরি অবস্থায় নাগরিক জীবন ও শুদ্ধ মানব জীবনের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। স্মিট যে ব্যাপারটি প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছিলেন তা হলো, জরুরি অবস্থা আইনের ব্যতিক্রম অবস্থা হলেও আইনের বাইরের বিষয় নয়। তার মতে, জরুরি অবস্থায় আইন বাতিল হয়ে গেলেও তা আইনেরই

বিষয় যেহেতু আইন তখন সার্বভৌম আইনের স্বভাব ধারণ করে। সার্বভৌম ক্ষমতা যেহেতু আইনি ভিত্তিতেই আইন বাতিল করতে পারে তাই এটি আইনের বাইরের বিষয় নয়; বরং আইনের আদি ভিত্তি (আগামবেন, 'মেসায়াহ', ১৬২)। স্মিট জরুরি অবস্থাকে আইনি বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে জরুরি অবস্থাকে আইনের স্বাভাবিক আচরণ বলে রূপ দিয়েছিলেন। তার মতে, সার্বভৌম ক্ষমতা কেবল নাগরিক জীবন আর খালি জীবনের সীমানাই নির্দেশ করে না, সেই সীমানা অতিক্রমও করতে পারে; বরং সীমানা অতিক্রম করে বাহিরকে নিজের মধ্যে দাখিল করেই এটি সার্বভৌম হয়। আইন এভাবে আইনের বাইরে মানুষের জীবনে ভিত্তি গড়া স্বাভাবিক অবস্থার ব্যতিক্রম হলেও এটি আইনের বাইরের বিষয় নয়; বরং তার চূড়ান্ত বিকাশ।

জরুরি অবস্থা ও সার্বভৌমত্বের এমন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের বিচার করেই স্মিটের সমসাময়িক দার্শনিক ওয়াল্টার বেনিয়ামিন বুঝতে চেয়েছিলেন, আইনের সীমানা অতিক্রম করে ব্যতিক্রমকে স্বাভাবিক করাই যদি সার্বভৌমত্বের স্বভাব হয়ে থাকে তাহলে সার্বভৌম ব্যবস্থার মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থা ও জরুরি অবস্থার মধ্যে পার্থক্য কোথায়? তার প্রশ্ন ছিল সার্বভৌম ব্যবস্থায় নিয়ম ও ব্যতিক্রমের মধ্যে আদৌ কোনো পার্থক্য আছে কি না? এমন প্রশ্নের বিচার থেকেই বেনিয়ামিন তার বিখ্যাত 'ইতিহাসের ধারণা প্রসঙ্গে' নামক প্রবন্ধের আট নম্বর থিসিসে লিখেছেন, "মজলুমের ঐতিহ্য আমাদের শিখিয়েছে, যে 'জরুরি অবস্থার' মধ্যে আমরা বাস করছি তা নিয়মের ব্যতিক্রম নয়, নিয়ম মাত্র।" বেনিয়ামিন এই 'স্বাভাবিক জরুরি অবস্থা' ধারণাটির বিপরীতে 'আসল জরুরি অবস্থা'র ধারণা গড়ে তুলতে চেয়েছেন। অষ্টম থিসেসেই তিনি লিখেছেন— "ইতিহাসের এমন ধারণায় আমাদের পৌঁছাতে হবে যা মজলুম ঐতিহ্যের সাথে খাপ খায়। আর তাহলেই আমরা দেখতে পাব যে, আমাদের কাজ হচ্ছে একটা আসল জরুরি অবস্থা হাজির করা যার ফলে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থার উন্নতি ঘটবে" ('ইতিহাসের' ৩৯২)।

এখানে স্মিটের 'স্বাভাবিক জরুরি অবস্থা'র বিপরীতে বেনিয়ামিন যে 'আসল জরুরি অবস্থা'র ধারণা হাজির করেছেন তা আসলে স্বাভাবিক জরুরি অবস্থার উন্মোচন মাত্র। জরুরি অবস্থা-যে সার্বভৌম ক্ষমতা ছাড়া আর কিছুই নয় বা

সার্বভৌম ক্ষমতা, যার মধ্যে আমরা বাস করি তা যে জরুরি অবস্থা ছাড়া কিছুই নয়; এই সত্য যেখানে উন্মোচিত হয় সেটিই আসল জরুরি অবস্থা – সার্বভৌম ক্ষমতার স্বরূপ উন্মোচন। সার্বভৌম ক্ষমতা, জরুরি অবস্থার মতো 'ব্যতিক্রম অবস্থা'তে শুধু নয় 'স্বাভাবিক অবস্থা'তেই আইনের সীমানা অতিক্রম করতে পারে। যে সীমানা সমাজের মানুষেরা ঘর-নগর সীমারেখা দিয়ে চিহ্নিত করেছিল আধুনিক সার্বভৌম এলাকায় সেই সীমানা ধূলিসাৎ হয়ে অরাজনৈতিক জীবন কাঠামোর চূড়ান্ত ক্ষমতার সামনে উন্মোচিত হয়ে পড়ে। এই এলাকায় জীবন আর কাঠামোর মধ্যকার স্বাভাবিক ফারাক আর থাকে না। রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক জীবন এখানে এমন এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে বাঁধা পড়ে যেখানে প্রত্যেকেই চূড়ান্ত ক্ষমতার সামনে উন্মোচিত একটি জীবন।

সার্বভৌম গুণ এমনই, কোনো জিনিসকে আমূল পাল্টে দেয়। যেমন ভাষা ও সার্বভৌম ভাষার মধ্যে পার্থক্য বিশাল। ভাষা যোগাযোগের মাধ্যম। ভাষার বাইরের একজন মানুষ যেখানে অব্যক্ত, সার্বভৌম ভাষার মধ্যে সেই মানুষ পাগল, যার চিকিৎসা দরকার। স্বাভাবিক অবস্থায় ব্যতিক্রম যেমন স্বাভাবিক, সার্বভৌমত্বের স্বাভাবিক জরুরি অবস্থায় সেই ব্যতিক্রম হয়ে ওঠে অপরাধ। তাই আধুনিক জাতিরাষ্ট্রগুলোর আর আলাদা করে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে হয় না। নিজেদের সার্বভৌম দাবি করার মাধ্যমে– জীবন ও রাজনীতির স্বাভাবিক সীমানা ধূলিসাৎ করে ফেলার মাধ্যমে, এটি নিজেই স্বাভাবিক জরুরি অবস্থা হিসেবে টিকে থাকে। এই জরুরি অবস্থা আর নিয়মের ব্যতিক্রম নয়; বরং ব্যতিক্রমই এখানে নিয়মে পরিণত হয়েছে। এটিই মজলুমের ঐতিহ্য। শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণি মজলুম বলতে যেমন মাঠের কৃষক, কারখানার শ্রমিক, দিনমজুর কিংবা রাষ্ট্র হারানো রোহিঙ্গা জীবন বোঝে এই মজলুম চরিত্রটি সেরকম 'সীমানার' ধারণা নয়। মজলুম ঐতিহ্যের অংশীদার এমন প্রত্যেকটি মানুষ যার ঘর এবং নগরের সীমানা হারিয়ে গেছে; যার ঘর নগরের হাতে লুণ্ঠিত হয়েছে। এই জীবন আইনের এমন এক এলাকায় আটকা পড়েছে যেখানে আইন আর জীবনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। মজলুমের বাস 'স্বাভাবিক জরুরি অবস্থা'য় যেখানে নগরের ভেতর ও বাহির, আইন ও বে-আইন, রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক, নাগরিক ও শুদ্ধ জীবনের মতো দ্বান্দ্বিক ধারণাগুলো একে অপরে মিলিয়ে গেছে। এই মজলুম চরিত্র আমরা প্রত্যেকে, কারণ আমাদের প্রত্যেকের জীবনের ওপর—

জীবনকে বাতিল হিসেবে নিজের মধ্যে দাখিল করেই রাষ্ট্র তার সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে। সাধারণত জরুরি অবস্থাকে কোনো সাংবিধানিক বিধান বা কোনো বিশেষ আইনের মধ্যে খুঁজতে যাওয়া হয় বলে বলে মজলুম চরিত্রটি দূরের কোনো সীমানা চরিত্র বলে মনে হয়। আদতে, জরুরি অবস্থা কোনো বিশেষ বিধান, কোনো বিশেষ বাহিনীর কার্যক্রম কিংবা কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর ওপর চাপানো সহিংসতা নয়; বরং ক্ষমতা ব্যবস্থার স্বাভাবিক ও চূড়ান্ত রূপ— যার মধ্যে আমরা সবাই বসবাস করছি।

আধুনিক সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্রকে এরকম একটা ক্রিটিক্যাল অবস্থান থেকে বিচার করেই আরেন্ট ও আগামবেনের মতো চিন্তকেরা মানবাধিকারের ঘোষণাগুলোকে পাঠ করতে চেয়েছেন। নেশন শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যে জন্ম তথা জীবের জীবন, তা আগামবেন আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। উল্লেখ্য বাংলা ভাষায় জাতি বা জাত শব্দের অর্থও তাই– জন্ম (মদিনা, ৭০)। অর্থাৎ আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের চিন্তা ও কর্মসূচির কেন্দ্রেই রয়েছে জন্ম তথা জীবের জীবন। সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্রের কাছে কেউ হয় জন্মগতভাবে সেই জাতিরাষ্ট্রের সদস্য (বিধায় তার জীবনের প্রতিটা ব্যাপারই রাষ্ট্রের ব্যাপার; তার জীবনে ঘর বা অরাজনৈতিক বলে কিছু নাই; জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি তা রাজনৈতিক – নগরের আগ্রাসনভুক্ত) অথবা সে এক হত্যাযোগ্য পশু। জীবনের ওপর প্রতিষ্ঠিত জাতিরাষ্ট্রকে ফরাসি বিপ্লবের সময়কার নাগরিক ও মানুষের অধিকারের দলিলে (*Declaration of the rights of men and citizen, 1789*) সার্বভৌমত্বের ভিত্তি বলে স্বীকার করা হয়েছে (আগামবেন, 'মানবাধিকার' ২৫)। আর তাই মানুষ ও নাগরিক নামের বর্গগুলো স্বাভাবিক কোনো অবস্থায় যদি আলাদা দুটি বস্তু হয়েও থাকে, জাতিরাষ্ট্রের সার্বভৌম এলাকায় তাদের মধ্যকার সেই স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় পার্থক্য আর থাকে না। মানুষ ও নাগরিকের মধ্যে পার্থক্য জাতিরাষ্ট্র স্বীকার করতে পারে না – কথাটির অর্থ এমন নয় যে, জাতিরাষ্ট্রের মধ্যে মানুষ মাত্রই নাগরিক; বরং তার উল্টো – নাগরিক না হলে সে মানুষ নয় – হত্যাযোগ্য পশু। এই শুদ্ধ জীবন নিঃসন্দেহে অরাজনৈতিক, যা চূড়ান্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা সার্বভৌমত্বের সামনে উন্মোচিত হয়ে পড়ায় চূড়ান্ত 'রাজনৈতিক' চরিত্রে পরিণত হয়। সার্বভৌম কাঠামোর মধ্যে মানুষ ও বিশেষ মানুষ তৎক্ষণাৎ একে অপরে লীন হয়ে যায়। যেখানে মানুষের বিশেষ জীবন আর পশুর জীবনের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না সেখানে কার্যত প্রত্যেকেই পশুর জীবন – কারও ক্ষেত্রে এই

সত্য উন্মোচিত হয়েছে আর কারও ক্ষেত্রে তা উন্মোচনের অপেক্ষায়, বড় জোর এতটুকু তফাত।

তাই পারভেজ আলম যখন দাবি করেন যে, 'জীবের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, এমন রাজনৈতিক জীবনের খোঁজ করা আগামবেনের রাজনৈতিক দর্শনের অন্যতম লক্ষ্য', তখন তার দাবি সঠিক। তবে সেটি এই অর্থে নয় যে, আগামবেন জীবন ও রাজনীতির মধ্যকার পার্থক্য বাতিল করে জীবনকে আপাদমস্তক রাজনীতি দিয়ে মুড়ে দিতে চান। বরং সেটি এই অর্থে যে, আগামবেন জীবন ও রাজনীতির মধ্যকার বাতিল হয়ে যাওয়া পার্থক্য প্রতিষ্ঠার রাজনীতিকে মজলুমের জীবন ঘনিষ্ঠ রাজনীতি বলে প্রচার করতে সচেষ্ট। অরাজনৈতিক জীবন প্রবলভাবে 'রাজনৈতিক' কেবল মাত্র এই কারণে যে এই অরাজনৈতিক জীবনের ওপরেই, একে আত্মসাৎ করেই কোনো কাঠামো নিজের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে। মানুষের রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক জীবনের এমন দ্বান্দ্বিক সম্পর্কই রাজনীতি। যেখানে জালিম রাজনীতি হলো এই দ্বন্দ্বকে অস্বীকার করে উভয়কে এক অঙ্গে একীভূত করে স্বাভাবিক জরুরি অবস্থা জারি রাখা, আর মজলুমের জীবন ঘনিষ্ঠ রাজনীতি হলো এই দ্বান্দ্বিক ধারণাগুলোর হারিয়ে যাওয়া সীমানা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। পুঁজিবাদ, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মতন্ত্র, কিংবা সেক্যুলারতন্ত্র – যে নামেই রাষ্ট্র নিজেকে গঠন করুক না কেন, যদি তাদের প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থায় সার্বভৌম ইচ্ছায় নির্মিত বিশেষ জীবনের বাইরে আর কোনো অধিকার সম্বলিত জীবনের অস্তিত্ব না থাকে, যদি জীবন মানেই বিশেষ জীবন হয়, যদি আর বাকি সব জীবন সার্বভৌম সহিংসতার সামনে উন্মোচিত পশুর জীবন হয়, তাহলে এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন নামের মতাদর্শের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। ততক্ষণ পর্যন্ত এরা প্রত্যেকে মজলুম উৎপাদনের ভিন্ন ভিন্ন দরজা মাত্র।

৩

যেমনটা আমরা দেখেছি, আগামবেন নগ্ন জীবনকে 'রাজনীতি নিরপেক্ষ' এবং 'খোদার অধীন জীবন' বলেছেন। 'খোদার অধীন জীবন' ধারণাটির একটা বিশেষ ইতিহাস আছে। বিশেষত দর্শনের এলাকায় এই ধারণাটি এত ব্যাপক যে, এর কোনো সাধারণ নাম নাই। স্বাভাবিকভাবেই সেই ব্যাপক আলোচনা বর্তমান লেখায় তুলে আনা সম্ভব নয়। আপাতত আমরা যেটুকু বলতে চাই তা

হলো – খোদার অধীন জীবন মানে জীবের সাধারণ জীবন। প্রতিপালক, যিনি কোনো বিশেষ জীবনের জিম্মাদার নন; বরং সমস্ত জীবনের প্রতিপালক; যেখানে প্রত্যেকের— প্রথমত এবং যদি আর কিছু না হয় তবে অন্তত— বেঁচে থাকার অধিকার আছে, নিঃশ্বাস নেয়ার অধিকার আছে। এমন একটা প্রেক্ষাপটে আমরা আগামবেনের দর্শনের সবচেয়ে আলোচিত 'হোমো স্যাকের' নামক চরিত্রের সাথে পরিচিত হতে চাই।

'হোমো স্যাকের' শব্দের আক্ষরিক অর্থ পবিত্র মানুষ। ইংরেজি স্যাক্রেড শব্দটি ল্যাটিন স্যাকার থেকে এসেছে। স্যাকার শব্দটির অস্পষ্টতা এবং পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক চিন্তায় এর তাৎপর্য নিয়ে আগামবেন এবং তার আগে-পরে অনেকে লিখেছেন। 'আধুনিকতা'র আগে স্যাকের শব্দটি দিয়ে ধর্মতন্ত্রে ব্যবহৃত 'পবিত্র' শব্দটির মতো কোনো ধারণা বোঝাত না। তালাল আসাদ আমাদের জানিয়েছেন যে, মধ্যযুগীয় ইংরেজিতে স্যাকের শব্দটি দিয়ে ব্যক্তিগত কোনো কিছুকে বোঝানো হতো – যেমন ব্যক্তিগত অভ্যাস, বাক্তিগত বিশ্বাস বা ধ্যান-ধারণা। এই ব্যক্তিগত জীবন মানুষের স্বভাব। উল্লেখ্য, গ্রিক শব্দ zoe, যেটি দিয়ে আইনের বাইরে, ঘরের অরাজনৈতিক জীবন বোঝাত, সেই গ্রিকে সেই শব্দেরও কোনো বহুবচন নাই। অর্থাৎ এই শব্দটি দিয়েও একান্ত নিজি একটি জীবনের ধরণা প্রকাশ করা হতো। আবার, আগামবেন আমাদের জানিয়েছেন যে, নগ্ন জীবন বা বেয়ার লাইফ (bare life) শব্দটির ' বেয়ার' গ্রিক 'haplos' ধারণাটির সাথে সম্পর্কিত; অর্থাৎ এটিও ব্যক্তিগত জীবন নির্দেশক একটি ধারণা (হোমো, ১০২)। এখানে তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার এই যে, এই শব্দগুলো সমষ্টির বাইরে, নিয়মের বাইরে— ব্যতিক্রম কোনো কিছুর ধারণা দেয়। এই শব্দগুলো এমন এক জীবনের ধারণা প্রকাশ করে যেটি একক, নিতান্ত ব্যক্তিগত এবং স্বভাবতই সমষ্টির ধারণাকে মোকাবিলা করার মাধ্যমে সমষ্টির সাথে তফাত সৃষ্টি করেই এই ধারণা ফুটে থাকে।

যেহেতু সমষ্টির প্রতিষ্ঠিত ধারণাকে প্রশ্ন করে – তার থেকে বিচ্ছিন্নভাবে নিজেকে অনুধাবন করেই এমন ব্যক্তি জীবনের ধারণা পাওয়া যায় তাই স্বাভাবিকভাবেই এই জীবন নগরের বাইরের জীবন; আর তাই আইন এই জীবনের কোনো দায়ভার স্বীকার করে না। ব্যক্তির নিজস্ব এই জীবনের অধিকার নগর স্বীকৃত কোনো বিশেষ জীবনে আরোপিত অধিকার নয়। এই

জীবন আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জীবনের অধিকার। এই জীবন মানুষের স্ব-ভাবগত, অর্থাৎ 'যা নিজের মতো' – নিজের ধর্ম। মানুষের এই ধর্ম, আজকে আমরা ইংরেজি 'রিলিজিওন' (religion) শব্দটি দিয়ে যেমন ধারণা বুঝি তার মতো নয়। রবীন্দ্রনাথ দাবি করেছিলেন, ইউরোপে রিলিজিওন বলে যে শব্দ আছে ভারতবর্ষীয় ভাষায় তার অনুবাদ অসম্ভব। ইংরেজির সাথে যদি মিলিয়ে পড়তেই হয়, তাহলে ধর্ম শব্দটি রিলিজিওন নয়; বরং 'নেচার' (nature) ধারণাটির কাছাকাছি। রিলিজন শব্দটি ধর্ম নয়; বরং ধর্মতন্ত্র ধারণাটির সাথে বেশি জড়িত। ধর্ম শব্দটি কীভাবে মানুষের একান্ত জীবন বাচক একটি ধারণা থেকে সামষ্টিক ধর্মতন্ত্র হয়ে উঠল, তালাল আসাদ তার উত্তর খোঁজ করেছেন। তার প্রস্তাবের মূলভাব যা বোঝা যায় তা হলো, ইউরোপীয় শক্তিগুলো দেশে দেশে তাদের কলোনিগুলোতে পৌঁছে নানা রকম মানুষের নানা রকম ব্যক্তিগত জীবনকে একটি সাধারণ নামে ডাকার প্রয়োজন থেকে 'রিলিজিওন' বর্গটি গড়ে তুলেছিল। আর এভাবে বর্গীকরণ করতে গিয়ে কলোনিয়াল প্রভুরা এমন একটা জিনিসের সামষ্টিক নাম দিয়ে ফেলেছে যা স্বভাবতই সমষ্টির বাইরের অস্তিত্ব।

তবে 'রিলিজিওন' বর্গটি কলোনিয়াল প্রভুদের হাতে শুধু গড়েই ওঠেনি, ধারণাটি তাদের হাতে নির্যাতিত একটি বর্গও বটে। কলোনিয়াল প্রভুরা 'রিলিজিওন' নাম দিয়েই এক বিশাল সংখ্যক মানুষের ঐতিহ্যকে কুসংস্কার, অসত্য, অসভ্য কিংবা কেবলই মানসিক দশা বলে অপমান করতে পেরেছিল। রিলিজিওনের বিপরীতে পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের একটি বিশেষ জীবনকে 'উন্নত জীবন' ও 'আলোকিত জীবন' – এবং কালক্রমে 'মানবের একমাত্র জীবন' হিসেবে মানুষের ওপর চাপানোর প্রকল্প সাজাতে পেরেছিল; যে প্রক্রিয়া আজকের মতো জৈবরাজনৈতিক সময়ে আরও প্রচণ্ড হয়ে আমাদের ঘর ও নগরের সীমানা মিলিয়ে দিয়েছে। কলোনিয়াল মাস্টারদের হাতে গড়ে ওঠা 'উন্নত জীবন' নিজেকে 'বৈজ্ঞানিক সত্যের' মতো স্বতঃসিদ্ধ ও সর্বজনীন দাবি করে আমাদের প্রত্যেকের জীবনকে স্বাভাবিক জরুরি অবস্থার মধ্যে আটকে ফেলেছে যেখানে খাওয়া-পরা-চিন্তা থেকে শুরু করে জীবনের সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপার হয়ে উঠেছে সকলের ব্যাপার ও ক্ষমতা কাঠামোর সামনে উন্মুক্ত।

ইউরোপীয় আধুনিকতার মতো ধর্মতন্ত্রও এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে একটি বিশেষ জীবনের বাইরে আর কোনো অধিকারসম্পন্ন মানব জীবনের ধারণা

নাই, যেখানে খোদা একটা বিশেষ জীবনের খোদা, সকল প্রাণের প্রতিপালক নন। ধর্মতন্ত্র মানুষের সাথে তার প্রতিপালকের সবচেয়ে প্রাকৃতিক সম্পর্কের পথ রুদ্ধ করে তার পরিবর্তে একটি বিশেষ শ্রেণির সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এদিক থেকে ধর্মতন্ত্র মানুষের ধর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত একটি ধারণা। ধর্মতন্ত্র মানুষের স্বভাবগত-সাধারণ জীবনের প্রতিপালক রবের পরিবর্তে, মানুষের জীবন বিচ্ছিন্ন কৃত্রিম এক দেবতার শাসনের ধারণা দেয়। আল্লাহর অধীন জীবন, যেখানে মানুষের অন্তত জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার আছে – জীবন ও ধর্মের এমন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আইনের হাতে গড়ে ওঠা ধর্মের ধারণাতে থাকা অসম্ভব।

সার্বভৌম কাঠামোর অধীন জীবনে একটি বিশেষ জীবন (নাগরিক জীবন, ভোক্তার জীবন) প্রত্যেকের সাধারণ জীবনের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়। এই বিশেষ জীবনকে সমস্ত অধিকারের বাহক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার মাধ্যমে – আর সকল জীবনকে হত্যাযোগ্য পশুর জীবনে পরিণত করা হয়। সমস্ত অধিকার সম্বলিত এই বিশেষ জীবন তৈরি হয় একটা বিশেষ শ্রেণির হাতে – মালিকদের হাতে। যেমন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে পুঁজিবাদ নির্মিত বিশেষ জীবনের বাইরে খাওয়া-পরা, শিক্ষা কিংবা তথ্য পাওয়ার মতো মৌলিক অধিকারগুলো আর জনসাধারণের অধিকারে থাকে না। এই অধিকারগুলো মৌলিক অধিকার হিসেবে আইনে স্বীকৃত হলেও, জরুরি অবস্থার মতো তা স্থগিত হয়ে থাকে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এ অধিকারগুলো তারই প্রাপ্য যে এগুলো কিনতে পারে – তারাই পারে যারা বাজার স্বীকৃত বিশেষ জীবনভুক্ত। আর সকল জীবন অধিকার পাওয়ার অযোগ্য হিসেবে বাজারের চূড়ান্ত ক্ষমতার সামনে উন্মোচিত হয়ে পড়ে। এই বিশেষ জীবন যেহেতু একমাত্র অধিকার সম্বলিত জীবন, আর সব নগ্ন জীবন, তাই এই অধিকার সম্বলিত জীবনের মূলা ঝুলিয়ে তারা মানুষের জীবনের খুঁটিনাটি সমস্ত ঠিক করে দেয়ার 'অধিকার' অর্জন করে। মানুষের খাওয়া-পরা, ওঠা-বসা থেকে শুরু করে চিন্তা পর্যন্ত যা কিছু স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষের ঘরের বিষয় ছিল, তাই সার্বভৌম ক্ষমতার ভিত্তিরূপে নগরের বিষয় হয়ে ওঠে। এমন ব্যবস্থায় বাজার, আইন আর জীবনের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না এবং বাজারের বাইরে কোনো অধিকার, কোনো জীবন থাকে না।

বর্তমান সময়ে দেশে দেশে ধর্মতন্ত্র কিংবা জাতীয়তাবাদী রাজনীতির যে

উত্থান দেখা যাচ্ছে, যেখানে এসব মতাদর্শের লোকেরা 'পশ্চিমা আগ্রাসনের' বিপরীতে নিজেদেরকে বিপ্লবী সমাধান হিসেবে হাজির করতে চায় – আদতে তারা সেই একই 'আগ্রাসন' নীতির চ্যালাচামুণ্ডা। এই আগ্রাসী নীতি পশ্চিমা রাজনৈতিক চিন্তার একটা বিশেষ ধারণা, যেখানে জীবনের একটি রূপের বাইরে মানুষের সাধারণ জীবনের অধিকারকে স্বীকার করা হয় না। ভিন্ন ভিন্ন নামে আর সকল রাজনৈতিক মতাদর্শও পশ্চিমের 'আধুনিক' প্রকল্পের মতো সবার ঘর গুঁড়িয়ে দিয়ে, সবার খোদা কেড়ে নিয়ে, সবাইকে 'এক' করতে চায়। এমন একটি বাস্তবতায় প্রত্যেক মানুষ ধর্মহীন – এখানে প্রত্যেক স্বাভাবিক জীবনের প্রতিপালক ঈশ্বর, নগরের হাতে তৈরি জড় ঈশ্বর দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়েছে। সার্বভৌম ক্ষমতায় আটকে পড়া সাধারণ মানুষ অনেক সময় স্বেচ্ছায় নিজের ধর্ম ত্যাগ করে নিজের ঘরে নগরের দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করে। প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হয় কারণ এমন ব্যবস্থায় সমস্ত অধিকার নগর দেবতার হাতে কুক্ষিগত।

এমন একটা প্রেক্ষাপট থেকে হোমো স্যাকের চরিত্রটির দিকে নজর দেয়া দরকার। প্রাচীন রোমান আইনের এই চরিত্রটি এমন এক জীবনের ধারণা দেয়, যাকে উৎসর্গ করা যায় না তবে হত্যা করা যায় এবং যাকে হত্যা করলে হত্যাকাণ্ডের অপরাধ হয় না। আগামবেন হোমো স্যাকের চরিত্রটি নিয়ে ব্যাপক কাজ করেছেন যা স্বাভাবিকভাবেই এখানে আলোচ্য বিষয় নয়। আপাতত এর যে বৈশিষ্ট্যটি আমরা বুঝতে চেষ্টা করব তা হলো, হোমো স্যাকের একইসাথে দুনিয়ার আইন ও খোদার আইনের বাইরের জীবন। হোমো স্যাকের জীবনকে উৎসর্গ করা যায় না – কারণ, উৎসর্গ একটা বিধিবদ্ধ অনুষ্ঠান (ritual)। যেমন, বিধি মোতাবেক কেউ অপরাধ করলে তাকে বিধি মোতাবেক শাস্তি দেয়া। কিন্তু হোমো স্যাকেরের জীবন আইন অনুযায়ী অপরাধ নয়; বরং তা আইনের বাইরের জীবন। তাই তাকে আইনের মধ্যে থেকে হত্যা (উৎসর্গ) করা যায় না; কিন্তু রাষ্ট্র বা সমাজ বা ব্যক্তির সার্বভৌম ইচ্ছায় আইন বহির্ভূতভাবে হত্যা করা যায় এবং এ কারণে এমন হত্যাকাণ্ডে অপরাধ হয় না। হোমো স্যাকের জীবনের উৎসর্গ হতে না পারাকে আগামবেন এভাবেই দেখেছেন। তবে ব্যাপারটি বোঝার আরেকটি দিক থাকতে পারে, যার ইঙ্গিত পারভেজ আলমের *মদিনা* কেতাবটিতে আছে।

একজন হোমো স্যাকেরকে কেবল দুনিয়ার আইন নয়, খোদার আইনেরও বাইরের জীবন বলে প্রচার করা হয়। পারভেজ আলম মনে করেছেন, যেহেতু

এমন জীবন আল্লাহর আইনের বাইরের জীবন তাই হোমো স্যাকেরকে হত্যা করলে তার মৃত্যু শহিদের মৃত্যু হয় না। অর্থাৎ তার মৃত্যুকে অন্যায় বলে সাক্ষ্য দেয়া যায় না (আরবি শাহাদাহ থেকে শহিদ শব্দটি এসেছে যার অর্থ সাক্ষ্য দেয়া)। এর অর্থ হতে পারে – হোমো স্যাকের যেহেতু খোদার আইনের বাইরের জীবন হিসেবে সাব্যস্ত তাই তার ওপর হওয়া জুলুমের সাক্ষ্য নেয়ার জন্য কোনো মাবুদ নাই। আমরা দেখেছি ইউরোপীয় রাষ্ট্রচিন্তা কীভাবে মানুষের সাধারণ ধর্মকে বাতিল করে তাকে বিশেষ কিছু দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে চায়। তাই সেদিক থেকে, আধুনিক সার্বভৌম কাঠামোর মধ্যে আমরা প্রত্যেকে এমন মাবুদহীন-ধর্মহীন জীবন, একেকজন হোমো স্যাকের। হোমো স্যাকের যে প্রতিপালকের আইন থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে সেই প্রতিপালক সাধারণ জীবনের জিম্মাদার নয় – বিশেষ গোষ্ঠীর হাতে তৈরি বিশেষ জীবনের বিধাতা। যে বা যারা একজন হোমো স্যাকেরকে রাষ্ট্রের আইনের বাইরে বলে ঠিক করে দিচ্ছে, সেই তারাই তাকে আল্লাহর আইনেরও বাইরে বলে ঘোষণা করতে পারছে। অর্থাৎ, এমন ব্যবস্থায় রাজার আইন আর রবের আইন এক – রাজা ও রবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। হোমো স্যাকের যেহেতু সার্বভৌম এলাকায় আটকা পড়া জীবন, যেখানে আইনের বাইরে ন্যায়ের/জীবনের আর কোনো ধারণা নাই, তাই সে তার ওপর হওয়া অন্যায়কে অন্যায় বলে সাক্ষ্য দিতে পারে না। হোমো স্যাকেরের ওপর হওয়া জুলুমকে দুনিয়ার নিয়মে জুলুম বলে সাক্ষ্য দেয়ার কোনো উপায় নাই; উপরন্তু তার জুলুমের সাক্ষ্য নেয়ার জন্য তার কোনো মাবুদও নাই। সার্বভৌম ক্ষেত্রের মধ্যে, যেখানে আইনের বাইরে জীবনের কোনো অস্তিত্ব নাই, সেখানে আইনকে অন্যায় বলতে পারার কোনো উপায় থাকে না। 'অন্যায় আইন' ধারণাটি সেখানেই সম্ভব যেখানে আইন ন্যায়ের ধারণাটিকে পুরোপুরি আত্মসাৎ করেনি। যেখানে কাঠামোর বাইরে ন্যায়, অধিকার এবং জীবনের স্বাভাবিক অস্তিত্ব বজায় আছে। এই ধারণাগুলো মজলুম ঐতিহ্যে ভালোভাবেই সংরক্ষিত আছে।

যেমন, মুসা নবী ও ফেরাউনের কাহিনি। ফেরাউন নিজেকে আল্লাহ দাবি করত, নিজেকে আইন ও ন্যায়ের একমাত্র উৎস ও মানদণ্ড বলে ঘোষণা করত। ফেরাউনের শাসনে আল্লাহর আইন আর তার আইনের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। অর্থাৎ আইনের বাইরে ইনসাফের অন্য কোনো মানদণ্ড ছিল না। এ সময় মুসা ও তার সহযোদ্ধারা নগরের হাতে তৈরি আইনের বাইরে

জীবনের স্বাভাবিক অস্তিত্বের কথা প্রচার করা শুরু করলেন। তারা ফেরাউনের রব – যা বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে তৈরি বিশেষ জীবনের দেবতা, তার বিপরীতে মানব স্বভাবের প্রতিপালক, যে কোনো জীবনের জিম্মাদার রবের ধারণা প্রচার করতে লাগলেন। ফেরাউনের আইনের মধ্যে নিঃশেষিত জীবনের বিপরীতে, সাধারণ জীবনের প্রতিপালক আল্লাহর ওপর ভর করে তারা ফেরাউনের শাসনকে 'অন্যায় শাসন' বলতে পারতেন। আল্লাহর বাণী প্রচার করার মাধ্যমে তারা আইনের মধ্যে ন্যায় বা জীবনের মতো ধারণাগুলোর নিঃশেষিত হতে না পারার সক্ষমতা প্রচার করতে পারতেন। তাই 'অন্যায় আইন' ধারণাটি মজলুম ঐতিহ্যের সবচেয়ে বড় সম্পদ।

আইনের বাইরে ন্যায়ের একটি ধারণাতে বিশ্বাস করার মাধ্যমে মজলুম তার রবের প্রতি ঈমানের সাক্ষ্য দেয়। এভাবে অন্যায় শাসনের সাথে লড়তে গিয়ে যদি তার মৃত্যুও হয় তাহলে সেই মৃত্যুকে অন্যায় বলে সাক্ষ্য দেয়ার উপায় থাকে। এজন্যই দেখা যায় 'অন্যায় আইন' আর শহিদের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বার বার মজলুমের ঐক্য গড়ে উঠেছে। আর তাই ফেরাউন সৃষ্ট খোদা মানুষের স্বাভাবিক জীবনের প্রতিপালকের বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠে। মুসা ও তার সাথীদের জীবন ফেরাউনের সার্বভৌম ক্ষমতার সামনে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে; তারা হিজরত করতে বাধ্য হন। মজলুম ঐতিহ্যের এই দশায় এসে নগরের মালিকের কাছে মুসার মালিককে কিছুটা যেন অসহায় মনে হয়। সম্ভবত এই ধারণাটিকে ভুল প্রমাণ করতেই মজলুমের জীবনী-সাহিত্যের এ পর্যায়ে আমরা আল্লাহর রহমত নাজিল হতে দেখি। আমরা হিজরতরত মুসা নবীর খোদার রহমতে নীল নদের পানিকে দুইভাগ হয়ে যেতে দেখি। আরও দেখি, নগর থেকে বহিষ্কৃত শিশু ইসমাইলের পায়ের আঘাতে বিরান মরুভূমির বুক চিরে পানির ফোয়ারা ছুটতে, মা হাজেরার আল্লাহর রহমতে। একইভাবে আমরা সওর গুহায় আল্লাহর রহমতের অপেক্ষায় থাকা নবী মোহাম্মদ ও আবু বকরের ওপর রহমত পৌঁছে যেতে দেখি, যখন তারা মক্কা নগরীর কুরাইশদের খোদার নিয়মে হত্যাযোগ্য খালি জীবনে পরিণত হয়ে হিজরতরত ছিলেন।

মজলুমের একতায়, খালি জীবনের প্রতিপালকের রহমতে, আরব মরুভূমিতে যে মদিনা গড়ে উঠেছিল, সেটি আইনের বাইরে শুদ্ধ মানুষের সম্ভাবনাকে স্বীকার করেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তখনকার আরবে গোত্রগুলোই ছিল আইন;

মানুষের সকল অধিকার তার গোত্র কর্তৃক প্রদত্ত অধিকার ছিল। গোত্রের বাইরে কোনো আইন, কোনো অধিকারের ধারণা ছিল না। তাই গোত্র বিচ্যুত কোনো মানুষ অধিকারবিহীন খালি জীবনে পরিণত হতো, যাকে হত্যা করা যায় এবং যার হত্যাকাণ্ডে কোনো অপরাধ হয় না। এমন গোত্র বিচ্যুত খালি জীবনের হাতেই মদিনা সনদ লেখা হয়েছিল যেখানে গোত্রের বাইরে (আইনের বাইরে) জীবনের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়। মদিনা সনদে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য কারও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হয় নাই। গোত্রের বাইরে অধিকারবিহীন মানুষের জীবনের অধিকারের ধারণাতে ঈমান এনে (এবং আল্লাহর নবীকে এই সনদের জিম্মাদার মেনে) যে কারোর মদিনার উম্মাহ ভুক্ত হওয়ার সুযোগ ছিল। এমনই ঘর হারানো মানুষের আল্লাহর রহমতেই একাত্তর সালে গঠিত হয়েছিল বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি। যেখানে মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাপত্রে মানুষের জীবন ও তাদের অধিকার (মানবিক মর্যাদা) রক্ষার জন্য একটি নতুন রাষ্ট্র গঠনের সংকল্প ব্যক্ত করা হয়েছে।

৪

আরবি রহমত শব্দটির একটি অর্থ 'গর্ভ' বা 'শুদ্ধ সম্ভাবনা' (pure potentiality)। শুদ্ধ সম্ভাবনা এমন একটা ধারণা যাকে কোনোভাবেই নিয়মের মধ্যে পুরোপুরি বেঁধে ফেলা যায় না। রহমতের ধারণাও তো তাই – নিয়মের বাইরের সদা বর্তমান হাজিরা, যা বাস্তবতায় ফুরিয়ে যায় না। মানুষের ধর্ম এমনই রহমত, যা নিয়মের মধ্যে মানুষের সমস্ত অস্তিত্বকে পুরোপুরি নিঃশেষিত হতে না দিতে সক্ষম (potential not to be)। মানুষের স্বভাব ধর্ম এতটাই ব্যক্তিগত যে তা ভাষায় ব্যক্ত হয় না। এই 'অব্যক্ত ভাষা' – শুদ্ধ স্বর, এক রহমত, সম্ভাবনাময় গর্ভ – যা মানব সত্তার সমস্ত সম্ভাবনা ভাষার হাতে নিঃশেষিত হওয়া থেকে তাকে হেফাজত করে। আগামবেনের রচনায় দেখা যায় তিনি বারবার তার রাজনৈতিক আলোচনাকে ভাষা ও জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনার সাথে যুক্ত করেছেন। তার মতে, চিহ্ন ও ভাব কখনো একে অপরে পুরোপুরি নিঃশেষিত হয় না, একটা প্রয়োজনীয় ফারাক থাকে সেখানে, যে ফারাক জ্ঞান উৎপাদনের বীজতলা স্বরূপ ('সিগনেচার', ৫৯)। যেমন – মানুষ (অরাজনৈতিক মানুষ) ও নাগরিকের (রাজনৈতিক মানুষ) ধারণার মধ্যে প্রয়োজনীয় ফারাক এক লাওহে মাহফুজ, যেখানে 'মানুষ' নামক ধারণাটির জ্ঞান সংরক্ষিত আছে। জরুরি অবস্থায় এই দ্বান্দ্বিক

ধারণাগুলোর মধ্যে এই স্বাভাবিক ফারাকটুকু মিলিয়ে যায়।

সুরা বাকারায় দেখা যায়, আল্লাহ ফেরেশতাদের বললেন, "আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে যাচ্ছি"; সর্বদা আল্লাহর অনুগত ফেরেশতারা তখন প্রশ্ন করলেন, "আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে অশান্তি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরাই প্রতিনিয়ত আপনার পবিত্র মহিমা ঘোষণা করি"। তিনি বললেন, "আমি যা জানি তোমরা তা জানো না" (৩০)। এরপরের দুটি আয়াতে দেখা যায় আল্লাহ আদমকে নাম শিক্ষা দিলেন, তারপর ফেরেশতাদের সামনে সেগুলো উপস্থাপন করে বললেন, "এইসবের নাম আমাকে বলে দাও যদি তোমারা সত্যবাদী হও"। ফেরেশতারা নাম বলতে পারল না, কিন্তু আদম পারলেন; যেহেতু আল্লাহ আদমকে নাম শিক্ষা দিয়েছেন আর ফেরেশতাদের দেন নাই। এরপরই আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন আদমকে সিজদা করার আর তখন সবাই সিজদা করল – ইবলিশ ছাড়া (৩৪)। ইবলিশ মানতে পারে নাই যে, ফেরেশতারা পুরোপুরি নিয়মের বাধ্যগত সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও মানুষ – যে নিয়ম মানতেও পারে আবার না-ও মানতে পারে, যে একই সাথে নিয়মের ভিতরে ও বাইরে বাস করে – কীভাবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ও মর্যাদার অধিকারী হলো। ইবলিশের চিন্তায়, আল্লাহর জ্ঞান ও রহমত নিয়মের মধ্যে নিঃশেষিত ফেরেশতাদেরই প্রাপ্য। কিন্তু আল্লাহর রহমত এমন একটি ধারণা যা কখনোই কেবল কাঠামোর মধ্যে ফুরিয়ে যেতে পারে না। আর তাই, নিয়মের মধ্যে থেকেও নিয়মে ফুরিয়ে না যাওয়ার ক্ষমতা মানুষকে স্থান করে দেয় সকল সৃষ্টির ওপরে।

যেখানে নিয়ম ও নিয়মের বাইরের জীবনের মধ্যে স্বাভাবিক পার্থক্য নাই হয়ে গেছে, সেখানে জ্ঞান ও রহমতের কোনো ধারণা থাকতে পারে না। সোনার মদিনা তখনই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব যখন নগরকে মানুষের ঘর থেকে আলাদা রাখা যাবে। নিজের অরাজনৈতিক জীবনকে রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা করার রাজনীতি ছাড়া মজলুমের মুক্তির আর কোনো পথ আছে কি? এর জন্য মানুষকে তার অরাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে হবে। আজকের সময়ে মানুষ তার অরাজনৈতিক অস্তিত্ব সম্পর্কে যত বেশি অজ্ঞ থাকবে, তার জীবন ততই বেশি রাজনৈতিক – অন্যের হাতে শোষিত হওয়ার জন্য ততই বেশি উন্মুক্ত। মানুষকে তার অরাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে অন্ধকারে রাখা বুর্জোয়া ব্যবস্থার অন্যতম প্রকল্প। কারণ এভাবে খুব সহজে

মানুষের ঘরকে নগর, বাজার বা তাদের হাতে তৈরি অন্য কোনো খোদা দিয়ে দখল করা যায়। তাই, যে মজলুম আমরা প্রত্যেকে, তার মুক্তির জন্য অরাজনৈতিক জীবন প্রতিষ্ঠার রাজনীতি হয়ে উঠতে পারে সেই কেয়ামত, যার আবির্ভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে সেই স্বাভাবিক জরুরি অবস্থা যার মধ্যে আমরা বাস করি। আর সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে হাজির হবে সোনার মদিনা— যেখানে রাষ্ট্র মানুষের ওপরে নয়, মানুষের পাশে থাকবে।

[আবীর আহমেদের বর্তমান রচনাটির খসড়া রূপ প্রকাশিত হয়েছিল *রাষ্ট্রচিন্তা* ব্লগে–২০২০ সালের আগস্টে। বর্তমান রচনাটি তারই পরিমার্জিত-পরিবর্ধিত রূপ। এই প্রবন্ধটি লেখকের তিন পর্বের প্রবন্ধ সিরিজের প্রথম পর্ব। 'রূহানি রাজনীতি' ও 'প্রেমের ইশতেহার' শিরোনামের দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে মোহাম্মদ আজম সম্পাদিত চিন্তামূলক ত্রৈমাসিক কাগজ *তত্ত্বতালাশ*-এর যথাক্রমে দ্বিতীয় ও চতুর্থ সংখ্যায়।-সম্পাদক]

গ্রন্থপঞ্জি

[আগামবেন] Agamben, Giorgio. *Homo sacer: Sovereign power and bare life.* Stanford University Press, 1998

[আগামবেন] Agamben, Giorgio. 'Beyond Human Rights', *Means without end: Notes on Politics.* University of Minnesota, 2000

[আগামবেন] Agamben, Giorgio. *Signature of All Things*. Zone books, New York, 2009

[আরেন্ট] Arendt, Hannah. *The Origins of Totalitarianism.* New edition. San diego/New York/London: Harcourt, 1968

[আসাদ] Asad, Talal. *Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity.* Stanford University Press, 2003

[বেনিয়ামিন] Benjamin, Walter. "On the Concept of History". *Selected writings, Volume 4*, 1938-1940. Howard University press, 1996

[স্মিট] Schmitt, Carl. *Political theology, Four Chapters on Sovereignty.* University of Chicago Press, 2005

আলম, পারভেজ, *মদিনা*, আদর্শ, ২০২০

নির্ভরশীলতা তত্ত্ব, রুশদেশের অবস্থান এবং ইউক্রেন যুদ্ধ

মুহাম্মদ তানিম নওশাদ

সারসংক্ষেপ:

২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি রুশ সামরিক বহর ইউক্রেন আক্রমণ করে এবং ক্রমে পশ্চিমা দেশগুলোর সহায়তার কারণে ইউক্রেন তার বিরুদ্ধে কিছুটা কার্যকর প্রতিরোধও গড়ে তোলে। ফলে এই যুদ্ধে রুশদেশ অনেকটা সফলতা লাভ করলেও ইউক্রেনীয় বাহিনীর প্রতিরোধের ফলে তা একটি দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের রূপ নিতে শুরু করেছে। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর বর্তমান রুশ ফেডারেশন আদতে কোনো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নয়। ফলে ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসনকে সমাজতন্ত্রের বিস্তৃতির প্রচেষ্টা জ্ঞান করলে ভুল হবে। আবার রুশদেশকে পশ্চিমের আর দশটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের দলে ফেললেও তা তার প্রতি সুবিচার করা হবে না। দীর্ঘদিন ধরে রুশ ফেডারেশনের ক্ষমতায় বসে থাকা ভ্লাদিমির পুতিনের চিন্তায়ও কালে কালে পরিবর্তন এসেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন উত্তর পূর্ব-ইউরোপে স্লাভিক জাতীয়তাবাদে আবার জোয়ার এসেছে। রুশ জাতীয়তাবাদ মূলত স্লাভিক জাতীয়তাবাদেরই একটি স্থানীয় সংস্করণ। আবার রুশদেশকে অকার্যকর ও ধ্বংস করতে ন্যাটো জোট তার পরিধি বিস্তৃত করতে শুরু করেছে। একদা সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ ইউক্রেনও ন্যাটো জোটের অন্তর্ভুক্ত হতে আগ্রহী। ফলে রুশদেশকে বেকায়দায় ফেলতে ইউক্রেনকে কব্জা করতে আগ্রহী আমেরিকার নেতৃত্বাধীন ন্যাটো। এক্ষেত্রে ন্যাটোকে প্রতিরোধ করতে রুশদেশও বসে নাই। নির্ভরশীলতা তত্ত্ব যে প্রবল শক্তিশালী ও দুর্বলের মধ্যকার সম্পর্কে নির্ধারণ করে বলে বলা হয়, ইউক্রেন যুদ্ধে এর সত্যতা বুঝতে আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশারদদের প্রবলভাবেই মাথা ঘামাতে হচ্ছে।

কারণ ইউক্রেন বিত্ত ও সামরিক শক্তিতে কোনোভাবেই অতি দুর্বল রাষ্ট্র নয়। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে আমরা ইউক্রেন যুদ্ধের বাস্তবতায় নির্ভরশীলতা তত্ত্বকে পর্যালোচনা ও পুনর্মূল্যায়ন করব। রুশদেশে যে রুশ জাতীয়তাবাদ ও রুশদেশীয় অর্থোডক্স খৃষ্টান জাতীয়তাবাদের জোয়ার এসেছে এবং পূর্ব ইউরোপে অর্থোডক্স খৃষ্টধর্মের একটি কেন্দ্র হয়েও রুশদেশ বিরাজ করছে, যা প্রচলিত কেন্দ্র-পরিধির গতানুগতিক চিন্তার বাইরে তারও একটি পর্যালোচনা এই প্রবন্ধে হাজির করা হয়েছে।

১.

শুরুতে আমরা নির্ভরশীলতা তত্ত্ব (Dependency Theory বা Dependency School) নিয়ে কিছুটা আলোচনা সারব ইউক্রেন যুদ্ধকে পর্যালোচনার নিরিখে। আমরা জানি যে, নির্ভরশীলতা তত্ত্বের মতাদর্শীরা বিশ্বব্যবস্থাকে (World System) দু'ভাগে ভাগ করেন। যেসব রাষ্ট্র অর্থ ও ক্ষমতার বলে পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং বৈশ্বিক ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত প্রণয়নে মুখ্য ভূমিকা রাখে, তারা এই ব্যবস্থার কেন্দ্র (Core বা Center) এবং এই রাষ্ট্রগুলোকে বলা হয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র (Core Countries) । আর যেসব রাষ্ট্র শক্তি ও বিত্তে দুর্বল এবং অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদি নানা বিষয়ে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রগুলোর ওপর নির্ভরশীল, সেইসাথে বৈশ্বিক ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত প্রণয়নে যাদের ভূমিকা যথেষ্ট কম, তাদের এই ব্যবস্থায় পরিধি (Periphery) বলা হয়, আর এই রাষ্ট্রগুলোকে বলা হয় পরিধিস্থ রাষ্ট্র (periphery countries)। এই পরিধিস্থ রাষ্ট্রগুলোকে তাদের নির্ভরশীলতার সুবাদে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রগুলোর চারপাশে নিয়ত অবস্থান করতে হয় বলে এদের উপগ্রহ রাষ্ট্রও (satellite state) বলা হয়। মূলত এই পরিধিস্থ রাষ্ট্রগুলোকে আপাত স্বাধীন মনে হলেও, এরা বৃহৎ শক্তিগুলোর ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল এবং তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এদের বেশিরভাগই স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে ঊনবিংশ শতাব্দীতে, যারা দীর্ঘকাল পশ্চিমের ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর (Colonial Powers) পদানত থেকেছে। মূলত দুর্বল ও দরিদ্র দেশগুলোর এই শক্তিমানদের ওপর নির্ভরশীলতা নিয়ত টিকিয়ে রাখার জন্য শক্তিমানরা যে বিশ্বব্যবস্থা তৈরি করেছেন তা তত্ত্ব আকারে উপস্থাপন করেন রাউল প্রেবিশ (Raúl Prebisch, 1901-1986) নামক একজন আর্জেন্টাইন অর্থনীতিবিদ।

প্রেবিশ দেখান যে, পশ্চিমের ধনী ও শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো এমন এক বিশ্বব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক বাজার গড়ে তুলেছে, যেখানে অনুন্নত, দরিদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলো সস্তায় কাঁচামাল ও শ্রমিক যোগাচ্ছে, আর ধনী ও শক্তিমান দেশগুলো সেগুলোর মাধ্যমে সৃষ্ট তৈরি পণ্যসমূহ (finished goods) সেই অনুন্নত, দরিদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলোতে বেশি দামে বিক্রি করছে। আবার বেশিদামে পণ্য ক্রয় করার কারণে রাষ্ট্রীয় পুঁজি বিদেশে চলে যাওয়াতে তারা নিজ দেশে শিল্পায়ন ঘটাতে পারছে না এবং তাদের উৎপাদিকা শক্তিকেও (productive capacity) কাজে লাগাতে পারছে না। আর এই অবস্থা এমন এক দুষ্টু চক্রের জন্ম দিয়েছে, যা পুরো বিশ্বব্যবস্থাকে পরিবর্তন না করতে পারলে এই অলাতচক্র থেকে বের হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। বোঝাই যাচ্ছে যে, এই তত্ত্ব মার্কসবাদ ও লেনিনীয় তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু এই তত্ত্ব অস্তিত্ববাদ, মনোবিশ্লেষণ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানসহ আরও অনেক কিছুকে সম্পৃক্ত করে বলে এটি মার্কসবাদের সম্প্রসারিত রূপ বা নব্য-মার্কসবাদ (Neo-Marxism) হিসেবেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এই তত্ত্বের একটি উদারনৈতিক ধারাও আছে। যারা বৈপ্লবিক উপায়ে সমাজ পরিবর্তন না করেও নির্ভরশীলতা কমানোর উপায় বাতলান। এই ধারায় ব্রাজিলের এক সময়কার রাষ্ট্রপতি ফার্নান্দো হেনরিক কার্ডোসোকে (Fernando Henrique Cardoso) পাই, এরা উদারনৈতিক রক্ষণশীল তত্ত্ব (Liberal Conservetism) দ্বারা পরিচালিত। উদারনৈতিক রক্ষণশীল ধারা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে এবং বাজারে ব্যক্তির অনুপ্রবেশ ও তার মারফত সম্পদ সৃষ্টিতে নূন্যতম বাধা দেয়। যাহোক এর র‍্যাডিকেল ধারাতে আমরা পাই জর্মন-মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী ও অর্থনীতি বিষয়ক ইতিহাসবিদ আন্দ্রে গুন্ডার ফ্রাঙ্ক (Andre Gunder Frank, 1929-2005), জর্মন-ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ হান্স সিঙ্গার (Hans Wolfgang Singer, ১৯১০-২০০৬), মার্কিন অর্থনীতিবিদ পল এ. বারান (Paul Alexander Baran, 1909-1964), পল সয়েজী (Paul Marlor Sweezy, 1910-2004), গিনির মার্কসবাদী ঐতিহাসিক ওয়াল্টার রডনি (Walter Rodney, 1942- 1980) এবং মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদ সামির আমিনকে (Samir Amin, 1931-2018) । ১৯৪৮ সালে দক্ষিণ আমেরিকাতে গড়ে ওঠা ইউনাইটেড নেশন্স কমিশন ফর ল্যাটিন আমেরিকা (UNCLA) নির্ভরশীলতা তত্ত্ব এবং দরিদ্র দেশে তার প্রভাব নিয়ে প্রভূত কাজ করেছে। তবে অর্থনৈতিক তত্ত্ব আকারে একে প্রথম

হাজির করেন রাউল প্রেবিশ ও হান্স সিঙ্গার, যা প্রেবিশ-সিঙ্গার প্রকল্প বা প্রেবিশ-সিঙ্গার তত্ত্ব নামে পরিচিত। এই তত্ত্বেই তারা দেখান যে, প্রাথমিক পণ্যসমূহের (Primary Commodities) দাম তৈরি পণ্যসমূহের সাপেক্ষে বেশি পতনশীল হয় এবং তাদের মূল্যবৃদ্ধি হয় কম । কারণ আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে তৈরি পণ্যসমূহের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পায় চাহিদার আয়-স্থিতিস্থাপকতার কারণে। আর প্রাথমিক পণ্যসমূহের চাহিদার মূল্য-স্থিতিস্থাপকতা কম। কারণ সময়ের পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে এদের দামের খুব একটা ব্যত্যয় ঘটে না। যেমন: লোহা কাঁচামাল আকারে যতটা না মহার্ঘ্য, লৌহজাত পণ্য তার তুলনায় অনেক বেশি মহার্ঘ্য এবং দামও লোহার তুলনায় ক্রমেই ঊর্ধ্বমুখী। যে-কারণে এই তত্ত্বের অনুসারীরা ও অগ্রগামীরা আমদানিকে নিরুৎসাহিত করে স্থানীয় উৎপাদনকে প্রয়োজনে ভর্তুকি দিয়ে হলেও কার্যকর করতে আগ্রহী, যাকে বলা হয় আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন (Import substitution industrialization, ISI)। আর বিদেশী পণ্যের অনুপ্রবেশ রুখতে তারা সুরক্ষাবাদ যেমন: প্রয়োজন মাফিক শুল্ক বাধা কার্যকর করার পক্ষপাতী। কারণ হিসাবে ইনগ্রিড কভানগ্রাভেন (Ingrid Harvold Kvangraven) সামির আমিনের বরাতে লিখেছিলেন-যে, আমিন দেখিয়েছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কঙ্গোর শ্রমের উৎপাদিকা শক্তির অনুপাত ১:৫ । অথচ শ্রম বাজারে তাদের শ্রমশক্তির দামের অনুপাত ১:২০ । আর মুক্ত বাজার এই বৈষম্যকেই ত্বরান্বিত করে।

> In Amin's analysis, the main characteristics of the worldwide law of value is that the price of the labour force is distributed in a much more unequal way than are the productivities of social labour. There are differences in the productivity of labour, of course, but the differences in productivity are smaller than the differences in the price of labour. For example, while the difference in productivity between the US and Congo is 1:5, the difference in the price of the labour force may be 1:20. With free trade and relatively open borders allowing multinationals to move to where they can find the cheapest labour, the law of value operates at the global level to allow the extraction of the value produced in the peripheries to the benefit of the monopoly capital of the centres. Unequal exploitation is thus manifested in unequal

exchange, in Amin's framework. (Kvangraven: 2017: 12-13)

কেন্দ্র-পরিধি তত্ত্বের অনুগামীরা মনে করেন যে, সুরক্ষাবাদ প্রক্রিয়ায় ধনী দেশগুলোর ওপর থেকে তারা তাদের নির্ভরশীলতা কমাতে পারবেন। মূলত এইসব চিন্তার আলোকে পল বারান ১৯৫৭ সালে নির্ভরশীলতার বয়ানসমূহকে একটি তত্ত্বের রূপ দেন তার বই *The Political Economy of Growth* এ। এই ধারার সব তাত্ত্বিক ও অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে, মুক্ত বাজার অর্থনীতি দরিদ্র দেশগুলোকে শোষণ ও বঞ্চিত করার হাতিয়ার। যেমন: *Dialogues on Development* এর প্রথম ভল্যুমে লাতিন আমেরিকার প্রেক্ষাপটে লেখা হয়েছে,

> Dependency theory grew influential in Latin America in the 1960s and 1970s, largely in reaction to modernisation theory and free trade policies, which originated in the West. The proponents of modernization theory claimed that underdeveloped countries were held back by certain cultural characteristics, or their lack of adherence to specific economic policies that followed given "stages of growth". While a variety of perspectives existed within the broad school of dependency theory, they all rejected modernization theory's ahistorical approach to development and criticised its failure to account for the importance of the role of global economic and political structures. (Ushehwedu Kufakurinani et al: 2017: vi)

আর সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে এই মতাদর্শ প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে যে, পরিধিস্থ রাষ্ট্রসমূহ সম্পর্কে প্রায়ই শোনা যায়, দক্ষিণের এই রাষ্ট্রগুলোর মানুষ বঞ্চিত তাদের রাষ্ট্রসমূহের নীতিগত ভুলের কারণে, কিন্তু উত্তরের রাষ্ট্রগুলো যে নানা কাঠামো তৈরি করে তাদের শোষণ করছে, তা তারা বলতে নারাজ।

> Dependency theorists argue that, beyond the end of formal colonialism, the value transfers of profits have continued to flow from the Global South to the North. This implies that the "core countries" of the North continue to benefit from their extraction of wealth from the "peripheral countries" of the South. Within such a framework, the underdevelopment of countries in the South can be explained via their continued exploitation at the hands of the North, rather than only by way of internal policy failures. (Ushehwedu Kufakurinani et al: 2017: vi)

সামির আমিন স্পষ্ট করেই তার মনোভাব ব্যক্ত করেছেন যে, কেন্দ্র-পরিধি ব্যবস্থা উচ্চকিত হয়েছে মার্কেন্টিলিস্ট পর্বের আগমনের পর। আর আমরা জানি যে, ১৬শ থেকে ১৮শ শতাব্দীতে এই মার্কেন্টিলিস্ট ধারা পল্লবিত হয় যখন ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো তাদের অর্থনীতিকে বেগবান রাখতে সচেষ্ট হন তাদের শক্তি বৃদ্ধি করতে এবং তার জন্য তারা সক্রিয় হন তাদের উপনিবেশ কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রগুলোর অর্থনীতিকে বলি দিতে কিংবা যথেচ্ছ ব্যবহার করতে (https://www.britannica.com/topic/mercantilism)। সামির আমিনের মন্তব্য এই যে, এই মার্কেন্টিলিস্ট ধারায় প্রচলিত বুর্জোয়া চেতনা 'পৃথিবী'কে শুধু একটি বাজার হিসেবেই বিবেচনা করে।

> The question we must ask is quite simply whether the new industries represented a qualitative jump in the underlying organisation of the system. Convinced as I am that this was in fact the case, I would draw two conclusions from my central opinions. The first is that the core–periphery system particular to advanced capitalism is different by its very nature from that which characterised the mercantilist transition. The second is that to view the intermediate level after 1800 as a system of exchange inevitably flattens, impoverishes and reduces analysis to the point where, whether one likes it or not, it becomes equivalent to the conventional bourgeois vision of 'the world seen as a market'. (Amin: 2011: 82)

যাহোক রাশিয়া ও চীন এই পশ্চিমা কেন্দ্র-পরিধির বাইরে থেকে তাদের অর্থনীতি ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সমন্বিত রেখে তাদের নিজস্ব বর্গ ও পরিধিস্থ রাষ্ট্রসমূহকে নিয়ে অগ্রসর হতে চায়। ফলে তারাও কেন্দ্র-পরিধির লড়াইতে কেন্দ্রের জায়গায় অবস্থান করে। অতীতেও রাশিয়া ও চীনের কিছু উপনিবেশ ছিল। জার আমলে উত্তর আমেরিকাতে ১৭৩২ থেকে ১৮৬৭ পর্যন্ত রাশিয়ার উপনিবেশ ছিল। আলাস্কা পুরাটাই ছিল রুশ উপনিবেশ। কম্যুনিস্ট আমলেও তাদের পরিধিস্থ রাষ্ট্র ছিল, যেমন এখনো আছে। এখন তারা ইউক্রেনকেও তাদের পরিধিতে রাখতে চাইছে তার বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ ও কৃষিজমিকে

করায়ত্ত করতে। আর ইউক্রেনের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বও অসীম। অন্যদিকে চীনের উপনিবেশ ছিল লাওস, কম্বোডিয়া, ফিলিপাইন, মালায়েশিয়া ইত্যাদিতে। এখন তার পরিধিতে আছে মায়ানমার, উত্তর কোরিয়া, মালয়েশিয়া, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম ইত্যাদি।

আন্দ্রে গুন্ডার ফ্রাঙ্ক লিখেছেন, ১৪০০ -১৮০০ সাল থেকে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার সব দেশই কোনো না কোনো কেন্দ্র-পরিধির সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল (Frank: 1998: 34)।

২.

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কারণে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি কমে যাওয়াতে এবং তাদের চেইন অফ কমান্ড ভেঙ্গে পড়লে তারা উপনিবেশিত রাষ্ট্রগুলোকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়। এছাড়া সেইসময় আরও একটি বিষয়ও এই রাষ্ট্রগুলোর স্বাধীনতা অর্জনে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। সেসময় এশিয়া ও আফ্রিকার উপনিবেশিত দেশ ও জনপদের মানুষ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হয়; যাকে আমরা বলি আফ্রো-এশীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন (Afro-Asian Nationalist Movement)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সেই পালে আরও হাওয়া সঞ্চালন করে। কিন্তু এই দেশগুলো আপাত দৃষ্টিতে স্বাধীন হলেও পূর্বের পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো তাদের বিত্ত ও কাঁচামালের যোগানদার রাষ্ট্রগুলোকে তাদের কব্জায় রাখার জন্য নতুন বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলে। এই ব্যবস্থায় তারা যে পরোক্ষ উপনিবেশবাদের প্রবর্তন করেন, তাকে নাম দেওয়া হয়েছে নব্য উপনিবেশবাদ। পশ্চিমের আধিপত্যবাদ ও লুণ্ঠন বজায় রাখতে তারা বিষয়গুলোকে কাঠামোবদ্ধ করতে নতুন প্রতিষ্ঠান ও বিধিব্যবস্থাও গড়ে তোলে। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৪৪ সালে গড়ে উঠে *দ্য ব্রেটনউডস ইনস্টিটিউশনস*। এরই হাত ধরে জন্ম গ্রহণ করে বিশ্ব ব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এবং গ্যাট (The General Agreement on Tariffs and Trade)। অবশ্য গত শতকের নব্বইয়ের দশকে গ্যাট আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থাতে (International Trade Organization) রূপান্তরিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মূল কাজ আমরা কমবেশি জানি। মূলত ডলারের (সেইসাথে কিছুটা পাউন্ড ও ইউরোর) কর্তৃত্ব এবং আন্তর্জাতিক বাজার ব্যবস্থা ও লেনদেন প্রক্রিয়া পশ্চিমের অনুকূলে ধরে রাখাই এই প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজ। অবশ্য শুরু থেকেই রাশিয়া, জার্মানি ও

ফ্রান্সসহ বেশ কিছু দেশের এ বিষয়ে আপত্তি ছিল। যে কারণে পরে ইউরোপে ইউরোর পদার্পণ ঘটে। তবে ব্রিটেন তার পাউন্ডেই অটল থাকে। আর রাশিয়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য না হওয়াতে সে রুবলকে শক্তিশালী করার দিকেই মনোযোগী হয়। ন্যাটোভুক্ত দেশগুলো ইউরোকে খুব বেশি শক্তিশালী করতে পারেনি, যেহেতু তারা প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল। সিএসআইএস (Center for Strategic and International Studies, CSIS)-এর এন্থনী এইচ. কোরডেসম্যান (Anthony H. Cordesman) তার একটি লেখায় বলছেন যে, আমেরিকা একাই ন্যাটোর প্রায় ৭০% ব্যয় বহন করে (https://www.csis.org/analysis/nato-and-claim-us-bears-70-burden-false-and-dysfunctional approach-burdensharing)। মুদ্রা ব্যবস্থা ছাড়াও আরেকটি বিষয় বিশ্বরাজনীতির কেন্দ্র তা হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদ। এই প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো তেল ও গ্যাস। যে কারণে ওপেকভুক্ত দেশের প্রধান সৌদি আরবকে আমেরিকা পেট্রোডলারের ব্যবস্থা করে খুশি রেখেছিল। কারণ ১ ডলারের বিপরীতে ৩.৭৫ সৌদি রিয়াল সব সময়ের জন্য বেঁধে দেওয়াতে কোনো সঙ্কট আর রাজপরিবারকে পোহাতে হয়নি। সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় রাশিয়া। এই দেশটিও তেল ও গ্যাসে সুসমৃদ্ধ। একে এটি এক পরাশক্তি এবং দ্বিতীয়ত এটি ওপেকের (The Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC) কোর সদস্য নয় বলে পশ্চিমা নিয়ন্ত্রণের বাইরে। যে বিষয়টি আমরা ইউক্রেন যুদ্ধে ভালোমতো দেখতে পাচ্ছি।

৩.

বৈশ্বিক মুদ্রা কি হবে তা নিয়ে ঔপনিবেশিক যুগের আগে থেকেই দ্বন্দ্ব সংঘাত চলছিল। মার্কেন্টাইল (Mercantilism) বা বুলিয়ন (bullionism) অর্থনীতির কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আঠারো শতক থেকেই সোনা ও রুপা মজুদ শুরু করে। এই ধারায় যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনসহ বেশ কিছু দেশ রপ্তানি সর্বোচ্চ পরিমাণে বাড়িয়ে ও আমদানি সর্বোচ্চ কমিয়ে বেশি করে সোনা ও রুপা সংগ্রহে আগ্রহী হয়। আর বৈশ্বিক মুদ্রা হিসেবে সোনা পরিগণিত হলে নিশ্চিতভাবেই আমেরিকা ও ইউরোপে সোনা সমৃদ্ধ দেশগুলো বিত্ত-বৈভবে বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলো থেকে এগিয়ে যায়। বিশ্বমুদ্রা হিসেবে সোনা

ব্যবহারের অন্যতম কারণ হলো, এর চাহিদা প্রায় অপরিবর্তনশীল এবং এর দাম খুব বেশি স্থিতিস্থাপক নয়। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আমেরিকা প্রভূত অস্ত্র, কাঁচামাল ও অন্যান্য সামগ্রী বিক্রি করে বিশ্বের সর্বোচ্চ সোনার মজুদদার হয়ে ওঠে। ১৯২০ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৩২ সাল পর্যন্ত সোনা আন্তর্জাতিক মুদ্রা বা বিনিময় মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতো। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একাই বিশ্বের বিনিময় মাধ্যম সোনার ৭৫% এর মজুদদার হয়ে ওঠে। তখন আমেরিকার মুদ্রা ডলারকে বিশ্বের প্রধান আন্তর্জাতিক মুদ্রা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। কারণ প্রতি ৩৫ ডলারের বিপরীতে এক আউন্স পরিমাণে সোনা ধরলে বিশ্বের সমস্ত ডলার ক্রয় করার মতো সোনা আমেরিকায় মজুদ ছিল। সমস্যা তৈরি করল ভিয়েতনাম যুদ্ধ। ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল ব্যাপী দীর্ঘ দু'দশকের এই যুদ্ধে মার্কিন অর্থনীতি প্রায় ভেঙ্গে পড়ে। ফলে আমেরিকা তার জাতীয় রিজার্ভ থেকে প্রচুর সোনা বিক্রি করে দেয়। লিন্ডন জনসন (Lyndon Baines Johnson, 1908-1973) ঘোষণা দেন যে, প্রতি ৩৫ ডলারের বিপরীতে এক আউন্স পরিমাণে সোনা আর তাদের রিজার্ভে নেই। তারপরেও ডলার বৈশ্বিক মুদ্রা থাকাতে অনেক দেশই নাখোশ হয়। আর ডলার হয়ে ওঠে মানবেতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী হুকমি মুদ্রা (Fiat money)। হুকমি মুদ্রার প্রতি অনাস্থার কতগুলো কারণ আছে। হুকমি মুদ্রার পেছনে কোনো পণ্য বা মূল্যবান ধাতু যেমন: সোনা বা রুপা থাকে না। হুকমি মুদ্রা সম্পর্কে অর্থনীতিবিদ ড্রর গোল্ডবের্গের মন্তব্য,

> In monetary economics, fiat money is an intrinsically valueless object or record that is accepted widely as a means of payment. (Goldberg: 2005)

অন্যদিকে এই কাগুজে নোটের বা ধাতব মুদ্রার দাম তাতে ব্যবহৃত কাগজ বা ধাতব মুদ্রার দাম অপেক্ষা অনেক বেশি। ফলে ডলারের দৌরাত্ম্য থেকে রুবল ও ইউয়ানকে অবমুক্তকরণের প্রচেষ্টাও আছে ইউক্রেন যুদ্ধে। সবশেষে রুশ শক্তি নির্ভর কেন্দ্র-পরিধির সম্পর্ক গড়ে উঠবে রুবলকেন্দ্রিক, এই প্রত্যাশাও বর্তমান রুশদেশের।

৪.

২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি রুশ-বাহিনী ইউক্রেন সীমান্ত অতিক্রম করে

সেই দেশে তাদের সামরিক হস্তক্ষপ নিশ্চিত করে। এর বেশ আগে থেকেই ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলাদেমির জেলেন্সকিকে রুশ ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির ভ্লাদিমিরোভিচ পুতিন এবং রাশিয়ার গণমাধ্যম পশ্চিমের পুতুল ও অবাঞ্ছিত রাষ্ট্রপ্রধান বলে ঘোষণা করে আসছিল। তার বিরুদ্ধে রুশরা ভোটে কারচুপি এবং দোনবাসে অবস্থিত দোনেস্ক ও লুহানস্ক অঞ্চল দু'টিতে রুশ জাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ উত্থাপন করেছে। রুশ ফেডারেশন এবং দোনবাস অঞ্চলের রুশ জাতিগোষ্ঠীর অভিযোগ, পশ্চিমের যোগসাজশে প্রেসিডেন্ট জেলেন্সকি এই কাজ করেছেন। তারা এ-ও বলছেন যে, রুশদের ধ্বংস করতেই পশ্চিমারা তাকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। কারণ পশ্চিমের বল্গা যদি কেউ টেনে ধরতে পারে, তবে রুশ জাতিই তা পারবে। ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর রুশ জগতের প্রতাপ অস্তাচলে গিয়েছিল। বিশ্ব হয়ে গিয়েছিল একমেরুকেন্দ্রিক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো বাহিনীর কর্তৃত্ব হয়ে উঠেছিল লাগামহীন। প্রাক্তন কেজিবি কর্মকর্তা ভ্লাদিমির পুতিন প্রায় ধ্বংসস্তুপ থেকে রুশদের গৌরব পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হন। আর বিশ্বে শক্তির ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করতে বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের বেশিরভাগ দেশই রাশিয়াকে পূর্ব গৌরবে আসীন দেখতে আগ্রহী। রুশ জাতিগোষ্ঠীও অপেক্ষা করছিল এক মহান জাতীয়তাবাদী নেতার, যিনি রুশদেশ এবং বিশ্ব রাজনীতি সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত। অনেক আল্ট্রা-রুশ জাতীয়তাবাদীর মতে ভ্লাদিমির পুতিন সেই বহুল আকাঙ্ক্ষিত নেতা। অন্যদিকে ইরান ও সিরিয়াকে সার্বিক সহায়তা দিয়ে পশ্চিমের আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে তাদের টিকিয়ে রাখার কারণে মুসলিম বিশ্বের একাংশের মধ্যেও তার জনপ্রিয়তা প্রবল। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সহায়তা দেওয়ার কারণে বাংলাদেশেও রাশিয়ার বেশ জনপ্রিয়তা আছে। অবশ্য রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ ঘর গোছানোর কাজটি পুতিন বেশ সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন। চেচনিয়া, দাগেস্তানসহ মুসলিম অধ্যুষিত যে অঞ্চলগুলোতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে রুশ জাতিগোষ্ঠীর বিবাদ লেগে থাকত, সেখানে মুসলমানদের জন্য প্রচুর কাজের সমাহার এবং প্রচুর বাণিজ্যিক বিনিয়োগ ঘটিয়ে তিনি মুসলমানদের মন জয় করেছেন। এসব জায়গায় তিনি প্রচুর মসজিদও নির্মাণ করেছেন। যার প্রমাণ এই যুদ্ধে চেচেন নেতা রমজান কাদিরোভ ও তার দলবল এবং ষোল হাজার সিরীয় মার্সেনারীর পুতিনের পক্ষে যুদ্ধে যোগদান (নওশাদ: ২০২২)। অবশ্য চেচনিয়াতে একদা

পুতিন বাহিনী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে চেচেনদের দমন করেছিল। মোদ্দাকথা রাশিয়ার ভেতরে থেকেই ভিন্ন মত নিয়েও কাদিরোভ গোষ্ঠী ও চেচেন প্রজাতন্ত্র রুশ ফেডারেশনের পরিধিতে স্থান নিয়েছে। আর বাইরে রাশিয়ার উপগ্রহ হয়ে আছে বেলারুশ প্রজাতন্ত্র, কাজাকিস্তান, তাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান, হাঙ্গেরি, সার্বিয়া, ক্রোয়েশিয়া, স্লোভেনিয়া ইত্যাদি।

৫.

প্রশ্ন উঠতে পারে রুশদেশের পুনরুজ্জীবনবাদের মন্ত্র কী? পুতিন কি স্লাভিক জাতীয়তাবাদী ও স্লাভিক জনগোষ্ঠীর পরিত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন? কারণ সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরস্থ মুসলমান বেশিরভাগই ছিলেন প্রায় স্লাভিক জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বা মিশ্র । আর রুশরা তো স্লাভিক গোষ্ঠী বটেই, তা বলাই বাহুল্য। অনুমান করা যায় যে, যেহেতু সোভিয়েত ইউনিয়নকে পুনরুজ্জীবিত করা পুতিনের পক্ষে কঠিন, বর্তমান রুশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি প্রাচ্যদেশীয় অর্থোডক্স খৃষ্টধর্ম ও স্লাভিক জাতীয়তাবাদকে বেছে নিয়েছেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরস্থ মুসলিমদের তিনি প্রায় স্লাভিক বর্গে ফেলেছেন, যারা বহুকাল ধরে রুশ সংস্কৃতি এবং ভাষাতেও অভ্যস্থ। আর সোভিয়েত যুগে দীর্ঘ সাত দশক তারা রুশ সংস্কৃতির সাথে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে ছিলেন। রুশ জীবনাচরণের অনেক কিছুই তারা আত্মস্থ করে নিয়েছেন। এই কারণে ১৯৯৮-৯৯ সালের কসোভো যুদ্ধে মুসলমান বসনীয়দের বিরুদ্ধে তিনি উগ্র স্লাভিক জাতীয়তাবাদীদের অর্থাৎ সার্ব ও ক্রোয়াটদের সমর্থন দিয়েছিলেন। এখন অবশ্য তিনি বসনীয়দের পক্ষে, কারণ বসনীয় ও হার্জেগোবিনীয়রাও বৃহৎবর্গে স্লাভিক জাতিগোষ্ঠীভুক্ত। আর একারণেই বেশিরভাগ স্লাভিক জাতি যেমন: চেক, সার্ব, ক্রোয়েট, স্লোভেনীয়, মেসেডোনীয়রা ইউক্রেন যুদ্ধে খুব শক্তভাবে পুতিনের বিপক্ষে যাননি। মজার ব্যাপার হলো ইউক্রেনীয়রাও পূর্বস্লাভিক জাতিগোষ্ঠীভুক্ত। কিন্তু ইদানীং তারা পশ্চিমাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেদের স্লাভিক পরিচয়ের ঊর্ধ্বে ইউক্রেনীয় পরিচয়কেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। তারা মনে করেন যে, রুশদের তুলনায় ইউক্রেনীয়রা উন্নততর জাতি এবং সভ্যতার দিক থেকেও এগিয়ে। এমনকি হালে ইউক্রেনের উগ্র জাতীয়তাবাদীরা রুশদের ওপর নানা স্থানে চড়াও হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে দোনেস্ক ও লুহান্সকে গণহত্যার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। রুশ জনগোষ্ঠীর

ওপর ইউক্রেনীয় জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা সৃষ্ট বিপদে পুতিন বসে থাকতে পারেননি। ইউক্রেনের নব্য-নাৎসী ও উগ্র জাতীয়তাবাদী আজভ ব্যাটালিয়নের রুশ জাতিগোষ্ঠী ও মুসলমানসহ অন্যসব ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ওপর নির্যাতন-নিপীড়নের বিষয়টি সম্পর্কে পুতিন-প্রশাসন সম্যকভাবে অবহিত। সরকারের ছত্রছায়ায় তারা এগুলো করছে বলেও অনেকে মনে করেন। আজভ ব্যাটালিয়নের প্রতিষ্ঠাতা আন্দ্রিই বিলেটস্কি (Andriy Yevheniyovych Biletsky), যিনি প্রবল শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদী ও দক্ষিণপন্থী, তার মধ্যে রুশবিরোধী প্রবণতা তীব্র। অথচ ইউক্রেনে তিনি প্রবল জনপ্রিয় এবং তিনি একজন সংসদ সদস্য। ২০১৪ সালের নির্বাচনে তার দল ৩৩.৭৫% ভোট জয় করে। ইউক্রেন যুদ্ধেও প্রমাণিত হয়েছে ইউক্রেনে শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদ তীব্র। যুদ্ধের শুরুতে যখন আফ্রিকা ও ভারতীয় লোকজন ইউক্রেন ত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী পোল্যান্ড, রুমানিয়া বা হাঙ্গেরি যাওয়ার চেষ্টা করছিল, তখন ইউক্রেনের সীমান্তরক্ষী ও পুলিশ-বাহিনী তাদের দেশত্যাগে বাধা দেয় এবং নানারকম দুর্ব্যবহার করে। ইরাকের বিরুদ্ধে আমেরিকার অনৈতিক যুদ্ধেও ইউক্রেন পাঁচ হাজারেরও বেশি সৈন্য প্রেরণ করেছিল। যে যুদ্ধে পরে প্রমাণিত হয়েছিল যে, ইরাকে কোনো গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র (Weapons of Mass Destruction, WMD) নেই। যাহোক রুশ প্রাচ্যদেশীয় অর্থোডক্স খৃষ্টধর্মের যাজকরা মনে করেন, রাশিয়ার উচিত বেলারুশ প্রজাতন্ত্র ও ইউক্রেনকে তার সাথে যুক্ত করে বৃহৎ রুশ তথা স্লাভিক ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা করা (নওশাদ: ২০২২)। এদের মধ্যে যদি কারও কারও বিশ্বাস থাকে যে, পশ্চিমারা বিভ্রান্ত ও তারা ইহুদীদের দাসে পরিণত হয়েছে, আর যিশুখৃষ্ট স্লাভিকদের মাধ্যমেই তার ঐশীরাজত্ব্য প্রতিষ্ঠা করবে— তাতেও অবাক হবার কিছু নেই। কারণ তাদের প্রবল এ্যান্টিসেমিটিজমের কারণে সোভিয়েত যুগেও রুশ সরকার প্রাচ্যদেশীয় অর্থোডক্স খৃষ্টধর্মের যাজকদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখত। ফলে একটি বিষয় পরিস্কার যে, কেন্দ্র-পরিধির নির্ণায়ক প্রথমত অর্থনৈতিক কারণ। কিন্তু এই নির্ণায়কের পেছনে আদর্শবাদ, জাতীয়তাবাদ (সে ধর্ম, ভাষা ইত্যাদি কেন্দ্রিকও হতে পারে) ইত্যাদিও কাজ করে। ইউক্রেনের রুশ আগ্রাসনে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট। রুশদেশের ইউক্রেন অভিযানের পেছনে বহু বিষয় থাকলেও দোনবাসে বিশেষত দোনেস্ক ও লুহানস্কে যে পীড়িত রুশ জাতিগোষ্ঠীর উদ্ধারও একটি অনুষঙ্গ তা সবার কাছে পরিস্কার। আর পুতিন এই দুই অঞ্চলের স্বাধীনতার

ঘোষণা দিয়েছেন এ বছরের ২১ ফেব্রুয়ারিতে । ফলে রুশ দেশ চেষ্টা করছে এই দু'টো জনপদে তার পরিধি সম্প্রসারণ করতে। রুশ জাতীয়তাবাদ বৃহৎ অর্থে স্লাভিক জাতীয়তাবাদের একটি স্থানীয় ধারা। পুতিনের সাথে স্লাভোনিক গির্জার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। আর এই গির্জা স্লাভিক গির্জা (Church Slavic) নামেও পরিচিত। এই গির্জার রুশ ধারা যাকে বলা হয় রুশ অর্থোডক্স গির্জা (The Russian Orthodox Church), তার প্যাট্রিয়ার্ক ভ্লাদিমির মিখাইলোভিচ গুনদিয়ায়েভ (Владимир Михайлович Гундяев), যার ধর্মীয় পদাধিকারে প্রাপ্ত নাম কিরিল (Kirill, লাতিনে Cyril), এবং যিনি The Holy Synod of the Russian Orthodox Church-এর একজন স্থায়ী সদস্য, তার সাথে রাষ্ট্রপতি পুতিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

৬.

পুতিনের যুদ্ধের একটি ন্যায্য দিক হলো, ন্যাটো দোনেস্ক ও লুহানস্কের রুশ জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে না। অন্যদিকে ইউক্রেন যখন ন্যাটোতে যুক্ত হতে ইচ্ছা পোষণ করল, ন্যাটো তা বিবেচনার প্রতিশ্রুতি দিল। সঙ্গত কারণেই এটি ছিল রুশ ফেডারেশনের নিরাপত্তার জন্য একটি সুস্পষ্ট হুমকি। ইতিমধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রিত ওয়ারশ জোটের অনেকেই ন্যাটোর সাথে যুক্ত হওয়াতে তা রাশিয়ার অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই যুদ্ধে পশ্চিমাদের সাথে সাথে তারাও ইউক্রেনকে অস্ত্র ও সেনা প্রশিক্ষণ দিয়ে সহায়তা করছে। পোল্যান্ডে খোলা হয়েছে ইউক্রেনের যুদ্ধকালীন সরকার। অন্যদিকে রাশিয়ার পাশে যারা আছে তাদের মধ্যে আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কোর বেলারুশ প্রজাতন্ত্র ছাড়া কেউ সরাসরি রাশিয়ার সাহায্যে নামেনি। অবশ্য দোনেস্ক ও লুহানস্কের বিদ্রোহীরা যুদ্ধে সরব আছেন। তাহলে এই যুদ্ধে পুতিন কোন সাহসে নামলেন, যখন রাশিয়ার ওপর পশ্চিমারা স্মরণকালের সবচেয়ে ভয়াবহতম অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করেছে? সুইফট থেকে রাশিয়াকে বের করে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য বিকল্প হিসেবে রাশিয়া তার মিত্র চীনের সিআইপিএস দ্বারা তার আন্তর্জাতিক লেনদেনগুলো করতে পারবে। কিন্তু আপাতত বাংলাদেশও রুপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য রাশিয়াকে অর্থ যোগাতে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছে। রাশিয়া কি শুধু পারমাণবিক অস্ত্রের শক্তির বিষয়টি মাথায় রেখেই যুদ্ধে

এতদূর এগিয়েছে? মনে হয় না। পুতিন ও শি জিনপিং এই দু'জনই চাচ্ছেন বিশ্বে ডলারের আধিপত্য ক্ষুণ্ন করতে। সেক্ষেত্রে বিকল্প মুদ্রা হিসেবে তারা রুবল বা ইউয়ানকে বৈশ্বিক মুদ্রা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। এক্ষেত্রে ইউয়ানই হতে পারে সম্ভাব্য বিকল্প মুদ্রা, কারণ চীনের বাণিজ্যিক ক্ষেত্র রাশিয়ার চেয়ে প্রসারিত। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইউরোকে বাজারে এনেছিল ডলারের বিকল্প হিসেবে। কিন্তু ন্যাটোভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর অতিরিক্ত মার্কিন নির্ভরশীলতার কারণে ইউরোকে যথেষ্ট শক্তিশালী মুদ্রা হিসেবে তারা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। সাম্প্রতিক পশ্চিমা অর্থনৈতিক অবরোধের কারণে রুশ জ্বালানী তেলের মূল্য আকস্মিকভাবে নেমে আসাতে ভারত রুশ তেল ব্যাপক হারে (প্রাথমিকভাবে তা ১৫ মিলিয়ন ব্যারেল ছিল) মজুদ করতে আগ্রহী হয়েছে। এর সমুদয় অর্থ ভারত সিআইপিএস দ্বারা ইউয়ানে পরিশোধে আগ্রহী। আর সৌদি আরব ব্যাপক অস্ত্র চীন থেকে ক্রয় করতে চাচ্ছে, সেই অর্থও সে প্রদান করবে ইউয়ানে। অন্যদিকে রাশিয়াও সিপিএফএস নামক তার নিজস্ব আন্তর্জাতিক লেনদেন-ব্যবস্থা শুরু করতে যাচ্ছে। ইরান, উত্তর কোরিয়া, ভেনেজুয়েলা, ব্রাজিল প্রভৃতি দেশে ডলার বিরোধী মনোভাব তুঙ্গে। ফলে বিশ্বে ডলার মহাযুগের পরিসমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে বলে অনেকে মনে করছেন (নওশাদ: ২০২২)।

৭.

রুশ প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির ভ্লাদিমিরোভিচ পুতিনের মস্তিষ্ক জ্ঞান করা হয় আলেকসান্দর গেলিয়েভিচ দুগিনকে (Александр Гельевич Дугин)। তিনি মস্কো প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়ের (Московский государственный университет) রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রাজনৈতিক দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি রুশদেশের ভবিষ্যতের জন্য যে দার্শনিক বয়ান হাজির করেছেন তা কেন্দ্র-পরিধির তত্ত্বকেই পুনর্প্রতিষ্ঠা করে। তিনি তার বক্তৃতায় বলেছেন, যারা ইউক্রেন যুদ্ধে পশ্চিমাদের ও ন্যাটোর পক্ষে, তারা এই যুদ্ধের সবকিছুকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখছেন; কারণ তাদের চিন্তা কাঠামোবদ্ধ (structural)। আর এর বাইরে তারা চিন্তাও করতে চান না। দুগিন বলছেন যে, চিন্তার এই বিভাজন (dichotomy) মানুষের বোধগম্যতা ও ভাষাকে দু ভাগে ভাগ করেছে; যার একটি রুশ ভাষা, অপরটি পশ্চিমের সমষ্টিগত ভাষা। আর তারা রুশ ভাষা ও

রুশী চিন্তা বুঝতেও অনাগ্রহী। এই ধারাবাহিকতায় তাদের চোখে ও তাদের মানদণ্ডে রুশী সভ্যতা কোনো সভ্যতাই নয়। যে-কারণে গত শতকের নব্বই এর দশকে সামুয়েল পি. হান্টিংটন যে সভ্যতার সংঘর্ষকেন্দ্রিক বইটি লেখেন (*The Clash of civilizations and the remaking of World Order*), যাতে তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন উত্তর পৃথিবীতে দেশগুলো ধর্ম ও সংস্কৃতি কেন্দ্রিক সংঘর্ষে আরও জড়িয়ে পড়বে। দুগিন তার এই মতামতকে পুরোদস্তর সমর্থন করেছেন। বরং ফ্রান্সিস ফুকোয়ামার তত্ত্ব যে সোভিয়েত ইউনিয়ন উত্তর দুনিয়ায় পশ্চিমের আর কোনো কঠিন শত্রু থাকবে না, নিওলিবারেলিজম ও মুক্ত বাজার পুঁজিবাদ দুনিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করবে, কারণ ইতিহাসের যে পর্বে এ সবের বিরোধিতা ছিল তার সমাপ্তি ঘটেছে বলে তিনি তার বয়ান হাজির করেছেন তার একটি বইতে (*The End of History and the Last Man*)। দুগিন এই তত্ত্বকে চূড়ান্ত ভুল বলে আখ্যায়িত করেছেন। দুগিন বলেছেন পশ্চিম মনে করে তার কাছেই শুধু civilization (সভ্যতা) আছে, কিন্তু আদতে Civilization-এর সাথে s যুক্ত করে পড়তে হবে civilizations। এই s হবে বড় s অর্থাৎ S। দুগিন বলেন যে, তিন দশক আগে তিনিই রাশিয়াতে ভূরাজনীতি (geopolitics) প্রথম পড়াতে শুরু করেন। তখন রুশদেশ পশ্চিমের অনেক ধ্যান-ধারণা গ্রহণও করেছিল। দুগিন আরও বলেন যে, বৈশ্বিক মানবতাবাদ (global humanity) আমরা গ্রহণ করি। জার ও সোভিয়েত আমলের অনেক ধ্যান-ধারণাও আমরা কাটিয়ে উঠি। সেইসাথে দুগিন বলেছেন যে, আমরা পশ্চিমা দুনিয়ার ভাষাতেও কথা বলতে চেয়েছি, তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি। যেকারণে আমরা আর্থ-সামাজিক মতবাদ বা মতাদর্শ আকারে নিওলিবারেলিজম বা কম্যুনিজম কোনোটিকেই আর গ্রহণ করিনি । কিন্তু এই আলোচনায় দুগিন "হৃদয়-ভূমি তত্ত্বের" (heartland theory) যে বয়ান হাজির করেছেন, তা ঊনবিংশ শতাব্দীর ভূরাজনীতি ও ভূগোল বিশেষজ্ঞ হ্যালফোর্ড জে. ম্যাককিন্ডারের (Sir Halford John Mackinder, 1861-1947) তত্ত্বের ওপর দুগিনের পর্যালোচনার ফসল। ম্যাককিন্ডার মনে করতেন যে, যে দেশ ইউরেশিয়ার ভূমি (Eurasian landmass) নিয়ন্ত্রণ করবে, সে-ই বিশ্ব-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। এই ইউরেশিয়ার ভূমিই হৃদয়-ভূমি। ম্যাককিন্ডারের এই তত্ত্ব ইতিহাসের ভৌগলিক কেন্দ্র (The Geographical Pivot of History) নামেও পরিচিত। আর এই তত্ত্বের

ওপর ভিত্তি করে দুগিন যে ইউরেশীয় ভূ-রাজনৈতিক তত্ত্বের (The Eurasian Geopolitical School) অবতারণা করেছেন তা-ও রুশদেশকে কেন্দ্রে রেখে পরিধি সম্প্রসারণের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত। দুগিন স্মৃতিচারণ করেছেন যে, ২০০৫ সালে দুগিনকে ভূতপূর্ব মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা স্বিগনিউ ব্রেজরেজিনস্কি (Zbigniew Kazimierz Brzeziński, 1928-2017) ওয়াশিংটনে বলেছিলেন, ইউক্রেন দখল না করলে রাশিয়া ইউরেশিয়াতে তার কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে পারবে না। তার মতে এই খেলায় দল দু'টি; একটি পশ্চিম, আর অন্যটি অপর (other)। আর ব্রেজরেজিনস্কি তার বই *দ্য গ্র্যান্ড চেজবোর্ডে* তা লিখেও গিয়েছেন। দুগিন মনে করেন যে, ভ্লাদিমির পুতিনের পদক্ষেপসমূহ ভূরাজনীতির ও ভূঅর্থনীতির (Geoeconomics) সাথে সম্পর্কিত। এর সাথে আদর্শ বা বিশেষ চেতনাগত কোনো সম্পর্ক নেই বলেই দুগিন মন্তব্য করেছেন (https://www.youtube.com/watch?v=NXNlNsOXqsM&t=1062s)। আমাদের পূর্বের আলোচনার সাথে তুলনা করলে বলতে হবে, পুতিন অংশত দুগিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; আর তা ভূরাজনৈতিক কৌশলের জায়গায়। হৃদয়ভূমি নিয়ন্ত্রণে ব্রিটেন সফল হয়েছিল তার নৌবাহিনীর শ্রেষ্ঠত্বের কারণে। বিমান আবিস্কারের পর বিমান বাহিনীর শ্রেষ্ঠত্বের কারণে দূর থেকেই আমেরিকা দুনিয়া নিয়ন্ত্রণ করেছে। এখন বড় শক্তিগুলোর সবারই স্থল, নৌ ও বিমান অর্থাৎ সব বাহিনীতে পারঙ্গমতা থাকায় হৃদয়-ভূমি দখলের বাস্তবতা আবার হাজির হয়েছে। ১৯৯৭ সালে দুগিন তার বই *ফাউন্ডেশন অব জিয়োপলিটিক্সে* দেখিয়েছেন যে, রুশরা ইউরোপের চেয়ে এশীয়দের নিকটবর্তী। তিনি চীন, ভারত ও মুসলমানদেরও রুশদের সহযাত্রী করার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি মনে করেন এই দেশগুলো স্বভাবতই মার্কিন বিরোধী।

> The first category is composed by the more or less successful nation-states that are not happy to lose their independence to a supranational exterior authority – not in the form of open American hegemony, nor in the Western-centric forms of world government or governance, nor in the chaotic dissolution of a failed international system. There are many such countries – foremost among them China, Russia, Iran, and India, but including many South American and Islamic

> states. They don't like the transition at all, suspecting, with good reason, the inevitable loss of their sovereignty. So, they are inclined to resist the main trends of the global American-centric geopolitical arrangement or adapt to it in such a manner that it would be possible to avoid the logical consequences of its success, be it via an imperialist or globalist strategy. The will to preservation of sovereignty represents the natural contradiction and point of resistance in the face of American/Western hegemonic or globalist trends. (Dugin: 2012: 91)

দুগিন বলেন যে, সামনের দুনিয়া ত্রিমেরুর দুনিয়া (tripolar world) হবে; রাশিয়া, আমেরিকা ও চীনকে কেন্দ্র করে। ফলে এখানেও কেন্দ্র-পরিধির তত্ত্বের বাইরে তিনি এককদমও যাননি। অবশ্য দুগিনের মতাদর্শী ইউরেশীয় যুব সঙ্ঘ (Eurasian Youth Union) ইউক্রেন সংকট ত্বরান্বিত করলে ২০১৫-এর ১১ই মার্চ মার্কিন কোষাগার দপ্তর (United States Department of the Treasury) দুগিনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

৮.

সম্প্রতি দুগিন তার এক বক্তব্যে বলেছেন যে, উত্তর আধুনিক দুনিয়ায় (post modern world) চূড়ান্ত সত্য (absolute truth) বলে কিছু নেই, সবই আপেক্ষিক সত্য (relative truth)। ফলে রুশদেশেরও কিছু সত্য রয়েছে, যা রুশদেশীয় চিন্তার প্রতিফলন। যে-কারণে রাশিয়া সিরীয় যুদ্ধে বাশার আল আসাদের সমর্থন দিয়েছিল, আর আমেরিকা নিয়েছিল তার বিপরীত অবস্থান। দুগিনের এই কথাকে যে কেউই ফ্যাসিবাদী আখ্যায়িত করতে পারেন; কারণ এই যুক্তিতে যে-কোনো স্বৈরতান্ত্রিক সরকার, সামরিক সরকার ও একনায়ক নিজের চিন্তার পক্ষে সাফাই গাইতে পারেন। কিন্তু আমরা ভালো করে লক্ষ করলে দেখতে পাব, দুগিনের এই চিন্তা রাশিয়ার পরিধিকে সম্প্রসারিত করারই মূলমন্ত্র।

গ্রন্থপঞ্জী ও তথ্যসূত্র

Amin, Samir. 2011. *Global History: A View from the South,* Pambazuka Press.

Dugin, Alexander. 2012. *The Forth Political Theory: Eurasian Movement*, Arktos Media.

Frank, Andre Gunder. 1998. *Reorient: Global Economy in the Asian age,* University of California Press.

Goldberg, Dror. 2005. "Famous Myths of Fiat Money"; *Journal of Money, Credit and Banking*, 37 (5): 957–967, Ohio State University Press.

Kvangraven, Ingrid Harvold: 2017: "A Dependency Pioneer: Samir Amin"; *Dialogues on Development vol 1*, Institute for New Economic thinking.

Ushehwedu Kufakurinani et al (editors). 2017. *Dialogues on Development vol 1*, Institute for New Economic thinking.

নওশাদ, মুহাম্মদ তানিম. ২০২২ (৪ মে) . "পুতিনের লক্ষ্য ও টিকে থাকার যুদ্ধে তার করণীয়," *সাম্প্রতিক দেশকাল*।

আদিত্য নিগমের সাক্ষাৎকার: পুঁজিবাদ কোনো অখণ্ড বা স্বয়ংসম্পূর্ণ উৎপাদন-ব্যবস্থা নয়।

[ইন্ডিয়ান বাঙালি তাত্ত্বিক আদিত্য নিগম দিল্লির প্রথিতযশা বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর দ্যা স্টাডি অব ডেভেলপিং সোসাইটিজ (CSDS)-এর ফেলো। ২০২০ সালে তার সর্বশেষ বই *Decolonizing Theory: Thinking across the Traditions* প্রকাশের পর থেকে একাডেমিক ও ক্রিটিক্যাল চিন্তার পরিসরে বইটি বিশেষ কদর পাচ্ছে। ডিকলোনাইজিং থিওরি-র নানা দিক নিয়ে আলাপ-আলোচনা ক্রমবর্ধমান। যেমন *Kairos: A Journal Of Critical Symposium*-এর Vol. 6 No.1 (2021) গোটা সংখ্যাটাই *ডিকলোনাইজিং থিওরি* বইটির ওপর নানামাত্রিক আলোচনা-পর্যালোচনার জন্য বরাদ্দ করা হয়। এই সংখ্যায় ডিকলোনাইজেশন, থিওরি, মডার্নিটি ও ডেমোক্রেসি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তর্ক-বিতর্কে প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সুদীপ্ত কবিরাজসহ অপরাপর চিন্তকেরা অংশ নেন।

সামাজিক ও রাজনৈতিক তত্ত্বের বিউপনিবেশায়ন নিয়ে আদিত্য নিগম বর্তমানে কাজ করছেন। কেবলমাত্র পশ্চিমা তত্ত্বের চর্চা কিংবা 'অ-পশ্চিমা' সমাজে পশ্চিমের দার্শনিক ও তাত্ত্বিক ক্যাটাগরিসমূহকে সর্বজনীন ধরে নিয়ে তার নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা কিংবা পশ্চিমের 'ক্রিটিক' করাকেই নিগম ও তার সহ-তাত্ত্বিকরা নিজেদের কাজ মনে করেন না। তারা মনে করেন বিভিন্ন চিন্তা ঐতিহ্যের মধ্যে গতায়াতের মাধ্যমে 'অ-পশ্চিমা' সমাজই হতে পারে 'doing theory' তথা "তত্ত্ব করা"র ক্ষেত্র।

তত্ত্ব নাকি অনুশীলন, আগে তত্ত্ব পরে অনুশীলন, অনেক তত্ত্ব হয়েছে এবার অনুশীলনের পালা; এমন নানাবিধ যান্ত্রিকতাকে ছাপিয়ে তারা বলছেন: "The point is to change the way we do theory" (Nigam 2020e)। "তত্ত্ব করা" প্রকল্পে তারা তত্ত্বকে সমাজে এমনভাবে প্রোথিত করতে চান যেন তত্ত্বকে অনুশীলন থেকে কিংবা অনুশীলনকে তত্ত্ব থেকে আলাদা করে ভাবা অসম্ভব হয়ে ওঠে। তত্ত্ব নির্মাণের ভিন্ন পদ্ধতিই তারা প্রতিষ্ঠা করতে চান (Banerjee, Nigam & Pandey 2016)।

গত বছর আমার নেয়া আদিত্য নিগমের একটি সাক্ষাৎকার অরাজে প্রকাশিত হয়েছিল (সারোয়ার ২০২১)। বর্তমান সাক্ষাৎকার কিংবা আলাপচারিতাকে আগের সাক্ষাৎকারটির ধারাবাহিকতায় পাঠ করা যেতে পারে, আবার বর্তমান সাক্ষাৎকারটির স্বতন্ত্র পাঠও সম্ভব।

জৈব-রাজনীতি, নজরদারি, বায়ো-পাইরেসি, বেকারত্ব, কর্মসংস্থান, সামাজিক অর্থনীতি, আউটসাইডের ধারণা, ইনফর্মাল ইকনমি, মোড অব প্রোডাকশন, ইতিহাসগত সময়, পোস্ট-স্ট্রাকচারালিজম, ভিন্নতা, তত্ত্ব করা ও তত্ত্বের বিউপনিবেশায়ন, সাবলটার্ন স্টাডিজ, ইতিহাস-লেখন পদ্ধতি, ঔপনিবেশিকতা, লাতিন আমেরিকা, নব্য-বামপন্থা, রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র, পুঁজি, পুঁজিবাদ, স্ট্রাকচার, টোটালিটি, উপাদান, সার্বভৌমত্ব, সহিংসতা, পলিটিক্যাল, রাষ্ট্র, পপুলিজম ইত্যাদি নানা বিষয়ে এই সাক্ষাৎকারে আদিত্য নিগমের গভীর ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ চিন্তাশীল পাঠকের নজর এড়াবে না বলেই আমার বিশ্বাস। আদিত্য নিগমের সঙ্গে বর্তমান আলাপচারিতাটি শুরু হয় ২০২১ সালের ২৮ আগস্ট, আর শেষ হয় ২০২২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি। অর্থাৎ প্রায় ছয় মাস ধরে স্ব স্ব ব্যস্ততা ও অপরাপর দৈনন্দিনতার ফাঁকে ফাঁকে নিয়মিত বিরতিসহ এই আলাপচারিতাটি অগ্রসর হয়।

- সারোয়ার তুষার]

সারোয়ার তুষার: আমাকে দেয়া পূর্ববর্তী সাক্ষাৎকারে (সারোয়ার ২০২১) এক জায়গায় আপনি লিখেছেন, "জৈব-রাজনীতির বা biopolitics-এর অর্থও আজ অনেক বেশি ব্যাপক। ফুকো জৈব-রাজনীতি বলতে যা বোঝাতে চেয়েছিলেন তার সম্পর্ক মূলত 'সরকার'-এর কার্যকলাপের সঙ্গে ছিল। আজকে কিন্তু পুঁজির কার্যকলাপের প্রসঙ্গে 'biopolitics'-কে অন্যভাবে বুঝতে হবে।"

বায়োপলিটিকস তথা জৈব-রাজনীতির সেই অন্যরকম বোঝাপড়াটা কী?

আদিত্য নিগম: আসলে ফুকো যখন জৈব-রাজনীতির কথা বলেন তখন তাঁর মাথায় দুই ধরনের জিনিস ছিল। প্রথমত, আঠারো শতাব্দী থেকে ইউরোপে আধুনিকতার আবির্ভাবের ফলে যে ধরনের পরিবর্তন ঘটে তার একটা দিক ছিল 'সরকারের' কাজকর্ম সংক্রান্ত। আগে প্রাক-আধুনিক যুগে রাজা বা সম্রাটদের প্রজার কল্যাণ নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা ছিল না – অন্তত যে অর্থে বর্তমানে আমরা কল্যাণকে দায়িত্ব হিসেবে বুঝি। "সরকার" বলতে ফুকো বোঝাতে চেয়েছেন একটা এমন ধরনের রাজনৈতিক ক্ষমতা যেখানে "জনসংখ্যা"র স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং জীবন-মৃত্যু সংক্রান্ত সব কিছুই সরকারের দায়িত্ব হিসেবে তার কাজের আবর্তের মধ্যে চলে আসে। পুরাতন যুগের রাজাদের চিন্তা যেখানে তাদের নিজেদের ক্ষমতা ও সাম্রাজ্য বিস্তার নিয়ে বেশি থাকত, সেখানে আধুনিক কালে গোটা জনসংখ্যার ভালো-মন্দের চিন্তা এবং সে কারণে তাদের গণনা করা, হিসাব রাখা ইত্যাদি সরকারের কাজের গণ্ডির মধ্যে চলে আসে। এমন নয় যে প্রাক আধুনিক রাজারা কিছুই করতেন

না – সেচ থেকে শুরু করে রাস্তা-ঘাট তৈরি করার দায়িত্ব তারা নিশ্চয়ই বহন করতেন – কিন্তু জনসংখ্যার হিসাব এবং তাদের ভালো-মন্দের ব্যবস্থা, তার মাধ্যমে তাদের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ নতুন একটা ব্যাপার ছিল। দ্বিতীয়ত, স্বাস্থ্যের ওপরে বিশেষ নজরের অর্থ হলো সুস্থ দেহ বা সুস্থ শরীর নিয়ে চিন্তা থাকা, যেটা তখনকার ইউরোপে খ্রিস্টান ধর্ম থেকেও আসে। এই নতুন ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে তার একটা সোজা সম্পর্ক শরীরের চাহিদা অর্থাৎ যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণ করাও বটে। এই নিয়ন্ত্রণ – যেটাকে ফুকো 'বায়োপাওয়ার' বলেন – সরাসরি রাষ্ট্রের ক্ষমতা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে না হয়ে যৌনতা সংক্রান্ত নতুন ডিসকোর্সের মাধ্যমে পরিচালিত হতে থাকে।

এবার পুঁজির কার্যকলাপের প্রসঙ্গে আসা যাক। "বায়ো-পাওয়ার" বলতে আমরা ফুকোর মাধ্যমে যা বুঝি তার সঙ্গে এখন আরও দুটি অর্থ যোগ হয়ে যাওয়া উচিত। বিষয়টা একটু জটিল কারণ এখানে এখনো অনেক কাজ ও ভাবনা-চিন্তা দরকার। তা ছাড়া ভালো করে না ভেবেচিন্তে হালকা করে কিছু বলা উচিত নয়। সুতরাং একেবারে প্রাথমিক কতগুলো চিন্তা হিসেবে এই কথাগুলি বলছি। প্রথম যে কথাটি আজকের পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে যে, সরকারের যে কাজগুলোর দিকে ফুকো আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন সেগুলো সবই এখন প্রাইভেট কর্পোরেশনগুলোর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। এমনকি, সরকারগুলো নিজেরাই সে দায়িত্বগুলো কর্পোরেশন বা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিদের হাতে তুলে দিচ্ছে। আমেরিকাতে তো এ-জাতীয় প্রবৃত্তি অনেক আগে থেকেই লক্ষ করা যায় কিন্তু বিগত কয়েক দশকে দেখা গেছে যে, এই প্রবৃত্তি পৃথিবী জুড়ে বিস্তার লাভ করেছে এবং এটার ফলে জনসংখ্যার একটা বড় অংশ সরকারের দায়িত্বের গণ্ডির বাইরে চলে গেছে। কিন্তু লক্ষ করার বিষয় যে তার ফলে সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে তারা যেতে পারছে না; বরং নিয়ন্ত্রণটা আরও সর্বাত্মক হয়ে গেছে। যে দ্বিতীয় অর্থের কথা আমি বলতে চাই সেটা এই নতুন ধরনের নজরদারির সঙ্গে যুক্ত। এটাকে আমরা ডাটা ক্যাপিটালিজম অথবা সোশানা জুবফ্ফের ভাষায় (Zuboff 2019) সার্ভেইলেন্স ক্যাপিটালিজমও বলতে পারি। জুবফফ অবশ্য এই কথাটি নিছক প্রাইভেট খেলোয়ারদের সম্বন্ধে ব্যবহার করেন। কিন্তু হালে যদি খেয়াল করে থাকেন দেখবেন কীভাবে সোশ্যাল মিডিয়ার – বিশেষ করে ফেসবুক ও হোয়াটস্যাপ – সাথে বিভিন্ন সরকারগুলোর, বিশেষ করে দক্ষিণপন্থী-ফ্যাসিবাদী ধরনের সরকারগুলোর সম্পর্ক গভীর হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে যে বিগত কয়েক দশকের মধ্যে সরকার ও প্রাইভেট কর্পোরেশানগুলোর মধ্যে অন্য অনেকভাবেও সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তার ফলে বায়োপাওয়ার বা বায়োপলিটিকস এর ব্যাপারটা অন্যভাবে ভাববার জরুরত দেখা দিয়েছে।

এখানে তৃতীয় একটা প্রশ্নও চলে আসছে যার চরিত্র একটু অন্যরকম। এ পর্যন্ত কিন্তু আমাদের আলোচনাতে "bio" বলতে মানুষের জীবন বোঝাচ্ছিল, কিন্তু পুঁজির নতুন চেহারা এমনই যে শেষ পর্যন্ত জীবনের নানা প্রকারকে নানাভাবে মুনাফার হার বাড়াবার জন্য ব্যবহার করতে তার কোনো নৈতিক বাধা উপস্থিত হয় না। কোনো সীমানাই সে মানতে নারাজ। এখানে আমি কেবল গাছপালা বা জন্তু-জানোয়ারকে "প্রাকৃতিক সম্পদ" হিসেবে দেখার ও ব্যবসার অথবা উৎপাদনের জন্য তাদের ব্যবহারের কথা বলছি না; বরং ১৯৯০-এর দশকের শেষের দিকের বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) গঠনের সময় থেকে "patenting of life forms" ও "biopiracy" নিয়ে যে বিতর্ক উঠেছিল তার দিকেও ইঙ্গিত করতে চাইছি। বায়োপাইরেসির মাধ্যমে আদিবাসীদের জ্ঞান চুরি করে পেটেন্ট করা থেকে শুরু করে genetically modified organisms (গাছপালা ও জন্তু-জানোয়ারসহ) এর ওপর পেটেন্ট করার নামে নানান ধরনের জৈব-সম্পদকে নিজেদের কবলে টেনে আনা – এই হলো একুশ শতকের পুঁজিবাদের লুণ্ঠনের এক জঘন্য চেহারা। এটার মাধ্যমে অনেক সময় 'তৃতীয় বিশ্বে'র দেশগুলোর সাধারণ কৃষকের বীজের ওপর অধিকারকেও কেড়ে নেয়া হয়। এগুলো নিয়ে এমনিতে অনেক কাজ হয়েছে কিন্তু জৈব-রাজনীতির একটা নতুন চেহারা হিসেবে এগুলো নিয়ে ভাববার প্রয়োজন আছে।

সারোয়ার তুষার: 'পুঁজিবাদের পরের জীবন' শীর্ষক আপনার চার-পর্বের ধারাবাহিক প্রবন্ধ সিরিজের শেষ পর্বে আপনি কর্মসংস্থান, বেকারত্ব ইত্যাদি নিয়ে আলাপ তুলেছেন (Nigam 2020d)। জবলেস গ্রোথের সমালোচনা করতে গিয়ে অনেকেই আরও বেশি বেশি শিল্পায়নের দিকে ধাবিত হওয়ার পক্ষে সওয়াল-জবাব করেন যেন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। কিন্তু আপনি বেকারত্বের জিনিওলজি উন্মোচন করতে গিয়ে দেখিয়েছেন খোদ শিল্পায়নই বেকারত্বের সূতিকাগার। ইউরোপের ইতিহাস থেকে দেখা যাচ্ছে, ছোট কারিগর, কৃষকসহ বিচিত্র স্বাধীন পেশা ও সম্পত্তি ধারণার মধ্যে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করা মানুষদেরকে নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত করে

শিল্প-কারখানায় বাধ্যতামূলক শ্রমদাসত্বের দিকে ঠেলে দেয়ার পক্ষে যুক্তি হাজির করা হয়েছে 'ইতিহাসের অনিবার্য নিয়তি/পরিণতি'র দোহাই পেড়ে। অন্যদিকে, পৃথিবীর বাদবাকি অঞ্চলে, অর্থাৎ এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখতে পাই, এখানে পরিস্থিতি আরও করুণ। কৃষক কিংবা সরাসরি উৎপাদকদের উৎপাদনের উপায়-উপকরণ থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে ঠিকই; উৎপাদনের উপকরণগুলো পুঁজির বলয়ে ঢুকে পড়লেও, উৎখাত হওয়া মানুষেরা কিন্তু সবাই ক্যাপিটালের সার্কিটে জায়গা পাচ্ছে না। যেমনটা এতদিন মার্কসবাদীরা বলে এসেছেন যে সবই ক্যাপিটালে বিলীন (dissolve) হয়ে যায়, কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, there is no outside! কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, যারা পরিত্যক্ত, বাদ পড়ে গেল, এরা তো একাধিক outside সৃষ্টি করছে; এই outside আবার কোনোভাবেই 'অতীতের অবশেষ' কিংবা pre-capital জাতীয় কিছু নয়। বরং, এই outside পুঁজির সমান্তরালে একটা ভিন্ন সার্কিট তৈরি করে যা ঠিক পুঞ্জিভবন তথা accumulation এর লজিকে চলে না। এখানে একটা ভিন্ন র‍্যাশনালিটি কাজ করে। এই outside-ই কল্যাণ সান্যালের প্রয়োজনের অর্থনীতি বা জীবিকা অর্থনীতি গঠন করে। এই outside-কেই পার্থ চট্টোপাধ্যায় 'পলিটিকাল সোসাইটি' হিসেবে সাব্যস্ত করেন (সারোয়ার ২০২২)। আপনি অবশ্য বলবেন এটা 'social economy' যা সমাজের মধ্যেই প্রোথিত (embedded); অর্থনীতি বলতে কোনো স্বতন্ত্র ডোমেইন হিসেবে এটা ক্রিয়া করবে না।

এই গোটা বিষয়টার ওপর আপনার মন্তব্য জানতে চাই। ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের পরিপ্রেক্ষিতে employment paradigm-কে ছাপিয়ে যাওয়া কি আদৌ সম্ভব বা বাস্তবসম্মত? দ্বিতীয়ত, কল্যাণ সান্যাল ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের 'outside capital' কিন্তু ক্যাপিটালিজমের মধ্যেই ঘটছে। অর্থাৎ পুঁজিবাদের মধ্যেই দ্বৈত অর্থনীতি; একটা অর্থনীতি আনুষ্ঠানিক যা পুঞ্জিভবনের লজিকে চলে, অন্য অর্থনীতি অনানুষ্ঠানিক যা জীবিকা বা তাগিদের লজিকে চলে (কল্যাণ ২০১১, Sanyal 2007, Sanyal and Chatterjee 2016, Chatterjee 2008)। আপনার 'সামাজিক অর্থনীতি'র ধারণা কি পুঁজিবাদের বাইরে (outside capitalism) কোনো স্পেস তৈরি করতে সক্ষম? নাকি এ-ও পুঁজিবাদের অভ্যন্তরেই কেবল পুঁজির আউটসাইড? সামাজিক অর্থনীতির ধারণার মাধ্যমে কীভাবে আমরা কর্মসংস্থান

মানসিকতাকে ছাপিয়ে যেতে সক্ষম হব বলে মনে করেন?

আদিত্য নিগম: আমি উত্তরটা শেষ থেকে শুরু করব। প্রথমেই বলি, "outside of capital" আমি যখনই ব্যবহার করি "আউটসাইড" কথাটা সর্বদাই উদ্ধরণ চিহ্নের মধ্যে রাখি। তার কারণ হচ্ছে এই যে, আমি আর আগের মতো "অর্থব্যবস্থা"কে কিংবা পুঁজিবাদকে কোনো চৌহদ্দির মধ্যে ঘেরা সমগ্রের অথবা উৎপাদনতন্ত্রের মতো দেখি না। "ভিতর" বলে কিছু থাকলেই "বাহিরে" কি আছে তার কোনো অর্থ হতে পারে— সে কাঠামো (structure) হতে পারে অথবা চৌহদ্দির মধ্যে বন্ধ কোনো সমগ্র (totality) হতে পারে। সমাজতত্ত্বে এই ধারণাগুলোর প্রয়োজন এই কারণে বোধ করা হয়েছিল যাতে সমাজের পরিবর্তনের একটা অভ্যন্তরীণ যুক্তি খুঁজে বার করা যেতে পারে। এমনটা হলেই তো আমরা বলতে পারব যে সমাজের কিংবা ইতিহাসের অগ্রগতির কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম খুঁজে বার করা গেছে। আমি যদি এই ধারণাটাই খারিজ করে দিই তাহলে "আউটসাইড" কথাটার কোনো মানে দাঁড়ায় না। সুতরাং পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বা কল্যাণ সান্যালের জন্য যেটা ভিতর ও বাইরের প্রশ্ন হতে পারে, সেই প্রশ্নটা আমার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে অবান্তর হয়ে যায়। এই তত্ত্বগত প্রশ্নটা একবার পরিষ্কার বুঝে নিলে আমরা অন্য প্রশ্নগুলোর দিকে এগোতে পারি।

"Social economy" কথাটা আমি আপাতত কাজ চালাবার জন্য ব্যবহার করেছি। আসলে এটা পুরোপুরি সন্তোষজনক নয়। কিন্তু আপনি যেটা একদম সঠিকভাবে ধরেছেন, পার্থ-দা কিংবা কল্যাণ সান্যালের "পলিটিকাল সোসাইটি" ও "প্রয়োজনের অর্থব্যবস্থা" দুটোই পুঁজিবাদের মধ্যে ঘটছে এবং দুজনেই মোটামুটি যেটাকে আমরা ইনফর্মাল সেক্টর বলি তাকে মাথায় রেখে এই ধারণাগুলো প্রস্তাব করেন। এই সেক্টরের বিষয়ে বলা যায় যে এটা পুঁজির দ্বারাই তৈরি করা – "আদিম সঞ্চয়" (primitive accumulation) এর মাধ্যমে প্রাক-পুঁজিবাদী সম্প্রদায়গুলোকে ধ্বংস করে। তাঁদের মতে এটা থেকেই শেষ পর্যন্ত পুঁজিবাদের পাশাপাশি একটা পৃথক অংশ হিসেবে প্রয়োজনের অর্থব্যবস্থা (বা পলিটিকাল সোসাইটি) গড়ে ওঠে। কিন্তু আমরা যদি আমাদের দেশগুলোর মধ্যে বিশাল বড় কৃষিক্ষেত্রের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই ৭০ শতাংশর কাছাকাছি লোকেদের জীবিকা এই সেক্টরের সঙ্গে জড়িত। এই ক্ষেত্রের মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে ঠিকই – কিন্তু

দুইশ বছরের বিপুল সরকারি হস্তক্ষেপ ও প্রচেষ্টা (যার মধ্যে ইংরেজ শাসনের দ্বারা চালু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ইত্যাদিও শামিল) সত্ত্বেও এটা যে আজ পুঁজিবাদের পুরোপুরি অন্তর্ভুক্ত এ কথা বলা যায় না। আদিবাসীদের জীবন ধরন তো নয়ই, এমনকি যে জায়গাগুলোতে বাজারের সম্পর্ক প্রবেশও করেছে সেগুলোকেও ঠিক পুঁজিবাদ বলা যায় না।

এখানে এই বিষয়ে বিশদ আলোচনার অবকাশ নেই। কেবল একটা দিকে খেয়াল করতে বলি, ১৯৯০-এর দশকের পর থেকে পৃথিবীজুড়ে পুঁজির মোকাবিলায় দেখা যায় কৃষক ও আদিবাসীদের – শ্রমিক শ্রেণিকে নয়। এমনকি আজ লাতিন আমেরিকাতে তো নতুন বামপন্থার ভিত্তিই হচ্ছে আদিবাসী জনগোষ্ঠী। মেক্সিকোর চিয়াপাস বিদ্রোহ থেকে শুরু করে বলিভিয়া, ইকুয়েডর ইত্যাদি দেশগুলিতে এই নতুন বামপন্থার এরকম চেহারা আমরা দেখতে পাই। আমি এগুলোকে "প্রাক-পুঁজিবাদ" বা "pre-capital"-ই বলি— এই অর্থে নয় যে তারা অতীতের অবশেষ; বরং এই অর্থে যে তাদের ইতিহাস পুঁজিবাদের থেকে অনেক পুরনো এবং তারা পুঁজিবাদ দ্বারা সৃষ্ট নয়। এই সমস্ত ক্ষেত্রগুলোকেও আমাদের আলোচনার মধ্যে টেনে আনার জন্য আমি "social economy" কথাটা ব্যবহার করেছিলাম। যদিও এমনিতে এই কথাটি ব্যবহার করা হয় এমন এক অর্থনীতির দিকে ইঙ্গিত করার জন্য যেখানে cooperative ও mutual aid society ইত্যাদি থেকে শুরু করে গরিব ও গৃহহীনদের ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার নানান পদক্ষেপ নেয়া হয়। বিগত কয়েক দশকে এটার অর্থ আরেকটু ব্যাপক হয়েছে আর environment ও sustainability-র প্রশ্ন তার মধ্যে যোগ করা হয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে যে আমি যে অর্থে কথাটা ব্যবহার করেছিলাম তার থেকে এটা একটু আলাদা।

এবার আসা যাক আপনার মূল প্রশ্নে: ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের পরিপ্রেক্ষিতে employment paradigm-কে ছাপিয়ে যাওয়া কি আদৌ সম্ভব বা বাস্তবসম্মত? আমার উত্তর এখানে সোজা। মুখে অর্থনীতিবিদরা যাই বলুন না কেন, আসলে তাঁরাও বোঝেন যে পুঁজিবাদের স্বর্ণযুগেই যখন বেকারত্ব থেকে নিস্তার পাওয়া গেল না তাহলে আজকে তো সেটা হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আজকে শুধু যে আমরা জবলেস (jobless) গ্রোথের দিকে তাকাচ্ছি তাই নয়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (artificial intelligence) যুগে আমরা "জবলস" (job

loss) গ্রোথের নগ্ন চেহারা দেখছি (Nigam 2021a)। এটাও পরিষ্কার যে আজও Food and Agricultural Organization (FAO)-এর তথ্য অনুযায়ী বিশ্বজুড়ে ৬০ শতাংশের মতো মানুষের জীবিকা নির্ভর করে কৃষির ওপরে। বাদ বাকি ৪০ শতাংশ জনসংখ্যার মধ্যে যারা কাজ করতে পারে এবং ওয়ার্কফোর্সের অংশ, তাদের ৬১ শতাংশ অনানুষ্ঠানিক চাকরি করেন। পৃথিবীজুড়ে মাত্র ৩৯ শতাংশ মানুষ আনুষ্ঠানিক রোজগারে আছেন – এবং আমরা জানি, তাদের অধিকাংশেরই আজ আছে তো কাল নেই অবস্থা। শেষ ৬১ শতাংশ মানুষ অনানুষ্ঠানিক রোজগারে অর্থাৎ প্রয়োজনের অর্থব্যবস্থার মধ্যে আছেন। অর্থাৎ তথ্যগুলো দেখিয়ে দিচ্ছে যে আজও পৃথিবীজুড়ে ৬০ শতাংশেরও বেশি লোকের রোজগার ও জীবিকা পুঁজির দ্বারা তৈরি কর্মসংস্থানের ওপর নির্ভর করে না। অন্যদিকে, যারাই স্বনির্ভর কিংবা ছোটোখাটো উদ্যমের সাথে যুক্ত তারাই কিন্তু আবার এমন লোকের দায়িত্বও বহন করছে যারা বেকার অথবা ওয়ার্কফোর্সের বাইরে। এটা মাথায় রাখতে হবে-যে এই অবস্থা তখন যখন সমস্ত দেশের সরকার ও আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাগুলোর সকল প্রচেষ্টা বড় পুঁজির পক্ষে এবং কৃষির ও অনানুষ্ঠানিক সেক্টরের বিপক্ষে পরিচালিত হয়ে থাকে। ফলে পুঁজির ও শিল্পায়নের মাধ্যমে লোকেদের জীবিকা ও মঙ্গল আদৌ সম্ভব বা বাস্তবসম্মত কি না এই প্রশ্ন তাদের করা উচিত যাঁরা এই পথের ওকালতি করে থাকেন। এটা আমাদের বুঝে নেয়া উচিত যে আজকে বড় পুঁজি ছাড়া বাকি সব সেক্টরের সংকট বিভিন্ন দেশের সরকারগুলোর ও WTO-র মতো সংস্থার তৈরি করা। ওই সংকটের থেকে নিস্তার পাওয়া তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা বুঝতে পারব যে পুঁজির লুটতরাজ চালু রাখার জন্যই গোটা পৃথিবীকে আজ এরা সবাই মিলে এক ভয়াবহ সংকটের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

সারোয়ার তুষার: স্ট্রাকচার আর টোটালিটির প্রসঙ্গ তুলে বেশ করেছেন। আমার এ প্রসঙ্গে আসার পরিকল্পনা ছিল। আপনি ইতিমধ্যে প্রসঙ্গটা হাজির করায় প্রশ্নটা এখনই রাখছি। আপনার লেখাপত্র পড়লে কিন্তু মনে হয় পুঁজিবাদকে আপনি একটা অখণ্ড/স্বয়ংসম্পূর্ণ "উৎপাদন-ব্যবস্থা" হিসেবে মানতে নারাজ (Nigam 2011, 2014, 2020e)। আপনি দাবি করছেন, সর্বপ্রথম মার্কসই এটাকে "উৎপাদন-ব্যবস্থা" হিসেবে তত্ত্বায়ন করেছেন। আপনার মতে, এটা অনিবার্য অভ্যন্তরীণ কিংবা 'বৈজ্ঞানিক' যুক্তি দ্বারা ঘেরা অখণ্ড কোনো "উৎপাদন-ব্যবস্থা" নয়। আলথুসার কিংবা পরবর্তী অনেক

মার্কসবাদী তাত্ত্বিকে আমরা মার্কসের একটা ভিন্ন রিডিং পাই বটে। কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকেই পুঁজিবাদকে একাট্টা "উৎপাদন-ব্যবস্থা" ধরে নিয়েই এগিয়েছেন। অর্থাৎ, পুঁজিবাদ "আছে" ধরেই নিয়েই যাবতীয় আলোচনা অগ্রসর হয়েছে। আপনি ভিন্ন কিছু বলতে চাইছেন বলে আমার মনে হয়। 'উৎপাদন-ব্যবস্থা' হিসেবে যদি পুঁজিবাদকে না দেখি, তাহলে পুঁজিবাদকে কীভাবে দেখা উচিত? পুঁজিবাদ কি স্ট্রাকচার? নাকি টোটালিটি? নাকি স্ট্রাকচার ও টোটালিটি উভয়ই? নাকি কোনোটাই না?

আপনি দাবি করছেন, এমনকি আঠারো শতকের শেষের দিকে এবং ঊনিশ শতকের একটা সময় পর্যন্ত, পুঁজিবাদের তাত্ত্বিক হিসেবে কার্ল মার্কসের আবির্ভাবের পূর্বে 'অর্থনৈতিক ব্যবস্থা' কিংবা 'উৎপাদন ব্যবস্থা' হিসেবে পুঁজিবাদকে দেখার রেওয়াজ ছিল না। পুঁজি/বাদকে এত অমোঘ, প্রাকৃতিক মনে হওয়ার ইতিহাস খুবই সাম্প্রতিক। হ্যাঁ, এ কথা ঠিক যে, পুঁজির ধারণা ছিল। পুঁজির ধারণার সিলসিলা (genealogy) বহু পুরাতন। তবে রাজনৈতিক অর্থনীতিতে বিভিন্ন আচার-ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানাদি থাকলেও 'পুঁজিবাদ' নামক কোনো একক অনিবার্য 'ঐতিহাসিক ব্যবস্থা'র নজির পাওয়া কঠিন। কর-খাজনা আদায়, কেনাকাটা, বেচাবিক্রি, মুনাফা করা, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, বাজার-ব্যবস্থা, এমনকি ব্যাংকিং, স্টক এক্সচেঞ্জ, হিসাব-সংরক্ষণ ইত্যাদির ধারণা ও চর্চা শত শত বছরের। ফরাসি ঐতিহাসিক Fernand Braudel-এর বরাত দিয়ে আপনি সম্পদ, অর্থকড়ি, মালপত্র, ফান্ড অর্থে 'Capitale' শব্দের ব্যবহারের সিলসিলা সেই বারো-তেরো শতক থেকে দেখাচ্ছেন। আর 'Capitalist' শব্দের ব্যবহার শুরু সতেরো শতক থেকে— পুঁজির মালিক অর্থে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে নয়। এখানে একটু নোক্তা দিয়ে রাখি, মার্কসে কিন্তু 'capitalism' বলতে কোনো ধারণা পাওয়া যায় না; 'capitalist mode of production system' তথা 'পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা' ধারণাটার উপস্থিতি দেখা যায়। এজন্য, আমাদের দেশের কোনো কোনো মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী 'পুঁজিবাদ' টার্মটা ব্যবহার না করে, 'পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা'— এভাবে লিখে থাকেন।

কিন্তু আপনি আরও র‍্যাডিকাল দাবিসহ হাজির। মার্কসের জন্য 'পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা'র তত্ত্বায়ন জরুরি ছিল কারণ মানব-সভ্যতাকে তার অন্তিম গন্তব্যে (কমিউনিজম) পৌঁছাতে হলে 'পুঁজিতন্ত্র' নামক কোনো অখণ্ড, ঘেরাও

করা সমগ্রকে antecedent হিসেবে থাকতেই হবে। এ যেন ঐতিহাসিক সময় এবং এর সহগামী অনিবার্য প্রগতির 'internal logic'। এর সাথে তাল মেলানো ছাড়া বা একে অর্জনে উদ্দমী হওয়ার কোনো বিকল্প নাই। যেসব অঞ্চল এই ঘোড়দৌড়ে 'পিছিয়ে' আছে, সেগুলো পশ্চাদপদ কিংবা ইতিহাসের 'ব্যতিক্রম'।

আমার কাছে আপনার একটা মন্তব্য বেশ চমকপ্রদ মনে হয়েছে। *CAPITAL* লেখার সময়ে মার্কস যদি হেগেল পুনর্পাঠে মনোযোগী না হয়ে স্পিনোজায় মনোযোগী হতেন, তাহলে হয়ত তিনি সম্পূর্ণ ভিন্নদিকে অগ্রসর হতেন (Nigam 2020e)। অর্থাৎ, 'বিশ্ব-ইতিহাস', 'দ্বান্দ্বিক সমগ্রতা', 'অখণ্ড সমগ্রতা'র মতো ধারণাগুলোকে সমস্যায়িত করা গেলেই একই বাস্তবজগতের ভিন্ন ব্যাখ্যা আমাদের সামনে হয়ত খোলাসা হবে।

ফলে আপনার কাছে আমার কয়েকটা ধাপে প্রশ্ন। একটা প্রশ্ন শুরুতেই করেছি। 'পুঁজিবাদ' কি স্ট্রাকচার নাকি টোটালিটি? যদি স্ট্রাকচার বা টোটালিটি কোনোটাই না হয়, তাহলে বর্তমানে আমরা যে সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, একে কীভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব?

দ্বিতীয়ত, মার্কস ও মার্কসবাদে 'পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা'র ধারণা দরকার বুঝলাম। কিন্তু বিপুল সংখ্যক অ-মার্কসবাদী লিবারেল, সেক্যুলার এমনকি পুঁজিপন্থী রাজনীতিবিদ, পলিসি-মেকার, বুদ্ধিজীবী ও তাত্ত্বিক যে পুঁজিবাদকে একটা 'অর্থনৈতিক ব্যবস্থা' হিসেবে বুঝে থাকেন, সেটাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

তৃতীয়ত, ঐতিহাসিক সময় ও 'বিশ্ব-ইতিহাস' ধারণার সংকটের দিকগুলো কী?

চতুর্থত, পুঁজিবাদ-বিরোধী নানা কিসিমের রাজনৈতিক সমাবেশ ও আন্দোলন দেখা যায় দুনিয়াব্যাপী। যেমন ধরা যাক, অকুপাই মুভমেন্ট, সিয়াটলের বিশ্বায়ন বিরোধী প্রতিরোধ-সংগ্রাম কিংবা আরও সাম্প্রতিক কালের জি-২০ জোটের সম্মেলনকে কেন্দ্র করে পুঁজিবাদ-বিরোধী গণজমায়েত। এসব আন্দোলন, প্রতিরোধ ও জমায়েতে কিন্তু পুঁজিবাদকে একটা এনক্লোজড রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধরে নিয়েই সেটার বিরোধিতা হয়। এখন, যদি 'পুঁজিবাদ' বলতে কোনো অখণ্ড ব্যবস্থাই না থাকে – আপনার ভাষায়

বর্তমানে আমরা যে ব্যবস্থাটা দেখছি সেটা মাঠে বহু খেলোয়ারের একটা মাত্র খেলোয়ার যদি হয় (..what we are talking about is one among many players in the field…) – তাহলে তো পুঁজিবাদ-বিরোধী এসব জমায়েত-প্রতিরোধেরও বর্তমানের সমস্যা সম্পর্কে একটা ভিন্ন বোঝাপড়া এবং ভিন্ন একটা জগৎ-কল্পনা থাকা দরকার। আমার এই মন্তব্যকে আপনি কীভাবে দেখবেন?

আদিত্য নিগম: প্রথমে স্ট্রাকচার বা টোটালিটির প্রশ্নটা নেয়া যাক। এই প্রশ্নটা যেহেতু চতুর্থ প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত তার উত্তরও এখানেই চলে আসবে। আমি আগেই বলেছি-যে আমি পুঁজিতন্ত্রকে কোনো অখণ্ড বা স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনো ব্যবস্থা হিসেবে দেখি না। তাহলে সেটাকে আমি কীভাবে দেখি? আসলে আমি যে কথা বলছি সেটা কোনো আজগুবি বা অভিনব কথা নয়; মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদদের নিজেদের কাজ থেকে এটা বেরিয়ে আসে যদিও তারা এটা স্বীকার করবেন না। মার্কসবাদের গোটা ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে পুঁজির যে স্বরূপ মার্কস *ক্যাপিটাল*-এ চিহ্নিত করে গেছেন সেটা একমাত্র ব্রিটেনের বাইরে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। খোদ মার্কস সেটা নিয়ে শেষ জীবনে ভাবতে ও গবেষণা করতে শুরু করেন। আন্তোনিও গ্রামশি ইতালির প্রসঙ্গে বিবেচনা করতে গিয়ে যখন দেখেন যে বিকশিত ও শিল্পায়িত উত্তরের পাশে, একই দেশে অবিকশিত দক্ষিণ সহাবস্থান করছে, তখন সেটা বুঝতে গিয়ে তিনি "প্যাসিভ বিপ্লব"-এর কথা বললেন। এই কথাটার বিশদ আলোচনা এখানে করা যাবে না। কিন্তু যেটা উনি বলতে চেয়েছিলেন সেটা হলো এই যে, ইতালিতে বুর্জোয়া শ্রেণি অত শক্তিশালী ছিল না যে তারা প্রাক-পুঁজিবাদী কাঠামোটাকে ধ্বংস করে এককভাবে পুঁজিবাদ সৃষ্টি করতে পারে, তাই তাদেরকে রাষ্ট্রের ক্ষমতার মাধ্যমে আস্তে আস্তে সেই পরিবর্তন ঘটাবার ওপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু গ্রামশির কারাগারের লেখাগুলোর মধ্যেই আমরা দেখতে পাই যে, এই বিষয়টা নিয়ে ভাবতে গিয়ে উনি দেখছেন যে আসলে ফরাসি বিপ্লবের পর থেকেই গোটা ইউরোপের ইতিহাসই প্যাসিভ বিপ্লবের ইতিহাস হিসেবে বুঝতে হয়। ঠিক এই সমস্যাটি অন্যান্য তাত্ত্বিকদের সামনেও ভিন্ন ভিন্নভাবে হাজির হয়েছে। কোনো জায়গাতেই এককভাবে খাঁটি বা নির্ভেজাল পুঁজিবাদ নেই; বরং আছে একাধিক উৎপাদন ব্যবস্থার সহাবস্থান। এটাকে অনেকে 'সোশ্যাল ফর্মেশন' বলে আখ্যা দিলেন। ১৯৬০, ১৯৭০ ও ১৯৮০-র দশকে

লাতিন আমেরিকায় 'dependency debate' নামে কিংবা এশিয়া ও আফ্রিকাজুড়ে 'mode of production debate' নামে যে বিতর্ক উঠল, তাতে আসলে মূল প্রশ্ন এটাই ছিল: পুঁজিবাদ কেন বিকশিত হচ্ছে না? এখানে যে তত্ত্বগত প্রশ্ন সামনে উঠে আসে সেটা হলো এই যে, পুঁজিবাদ যদি অখণ্ড ও স্বয়ংসম্পূর্ণ না হয় এবং সর্বদাই যদি তার সাথে একটা 'ভেজাল' হিসেবে প্রাক-পুঁজিবাদী ফর্মগুলো সঙ্গে চলে, তাহলে তার আন্তরিক নিয়মগুলি কাজ করবে কী করে? ভারতবর্ষেও দীর্ঘদিন ধরে এই বিতর্ক চলে এবং জয়রাস বানাজি বলে আমাদের একজন শ্রদ্ধেয় বুদ্ধিজীবী এটা নিয়ে আজও কাজ করে চলেছেন। পৃথিবীজুড়ে যে গবেষণা এই প্রশ্নে হয়েছে সেগুলো আবেক্ষণ করে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে আসলে পুঁজিবাদ কোথাওই এককভাবে বিদ্যমান নয় – যদিও এটা পরিষ্কারভাবে তিনি স্বীকার করতে নারাজ (Banaji 2013)।

মার্কসবাদীদের এই সমস্ত কাজ পর্যালোচনা করে আমি যে কথাটি বলতে চাইছি সেটা এই: আসলে এই সুদীর্ঘ সময় ধরে আমরা 'mode of production'-এর যে স্ট্রাকচার খুঁজবার চেষ্টা করছি, তাতে বারবার ব্যর্থ এই কারণেই হচ্ছি যে আসলে সেরকম কোনো জিনিস নেই। যেটা আছে, সেটা এক তারামণ্ডলের (constellation) মতো, যেখানে অনেকগুলো তারা কাছাকাছি থাকাতে আমরা একটা প্যাটার্ন দেখতে পাই। ধরুন সপ্তর্ষি। তাই বলে কি আমরা বলব তার একটা কাঠামো আছে বা সেটা একটা টোটালিটি? আমি যখন বলি যে অর্থব্যবস্থা একটি খেলার মাঠের মতো বা রণক্ষেত্রে একত্রিত সৈন্যদের মতো, তখন তারামণ্ডলের সঙ্গে আমি একটা বড় পার্থক্যের দিকে ইঙ্গিত করছি: এখানে পুঁজিবাদ সর্বদা প্রাক-পুঁজিবাদী ফর্মগুলোকে ধ্বংস করতে সচেষ্ট থাকে এবং প্রাক-পুঁজিবাদী ফর্মগুলো বা জীবন-পদ্ধতিগুলো তার ফেলা জালের বা ফাঁদের মধ্যে থেকে খসে বেরিয়ে পড়ার তালে থাকে। এই অবস্থায় দুই দিকই একে অপরকে প্রভাবিত করে থাকে। এই বিন্যাসটাকে ধরে রাখে অর্থব্যবস্থার কোনো অভ্যন্তরীণ নিয়ম নয়; বরং রাজনৈতিক ক্ষমতা – যার গঠন বিশেষ ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী নির্ধারিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ রাজনৈতিক ক্ষমতার ওপরে শক্তিশালী শ্রেণিসমূহের প্রভাব থাকলেও তার এক আলাদা অস্তিত্ব আছে ; সেটা অর্থব্যবস্থার প্রতিফলন মাত্র নয়।

এখানে আলথুসারের প্রসঙ্গেও দু-একটা কথা বলতে চাই। আলথুসার যখন ১৯৬০ এর দশকে *ক্যাপিটাল*-এর ওপর সেমিনার করছিলেন এবং যার পরে *Reading Capital* (Althusser and Balibar 1977) গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়, তখনো তিনি মোটামুটি পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার কথা কেন্দ্রে রেখেই ভাবছিলেন, যদিও সেটাকে এমনভাবে পরিভাষিত করলেন যেখানে তার মধ্যে পরিবর্তনের বিষয়টা আর নিছক অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তিতে বোঝা সম্ভব রইল না। তাঁর ভাষায়, "the lonely hour of the last instance [of the economy] never arrives"। অথচ সেই গ্রন্থেই এতিয়েন বালিবারের লেখাতে আমরা দেখতে পাই অন্য এক ধারণা জন্মাচ্ছে। মার্কসের *Grundrisse*-এর অধ্যয়নের ভিত্তিতে বালিবার দেখালেন যে, খোদ মার্কসের গবেষণায় দেখা যাচ্ছে পুঁজিবাদের আবির্ভাব সামন্ততন্ত্রের মধ্যে কাঠামোগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে হচ্ছে না, বরং দুটি পৃথক ইতিহাসের কথা তিনি বলেন। একদিকে ধন-সম্পদবান লোকেদের আবির্ভাব আর অন্যদিকে মুক্ত শ্রমের – এই দুইয়ের মিলনে, এক জায়গায় আসাতে পুঁজিবাদের জন্ম হয়। এখান থেকে আরেকটা দার্শনিক প্রশ্ন হাজির হয়। স্ট্রাকচার হিসেবে আমরা যা দেখছি তার কোনো পূর্ব-অস্তিত্ব নেই, আন্তরিক নিয়ম তো নেই-ই। স্ট্রাকচারের অস্তিত্ব তার এই পৃথক উপাদানগুলোর সমন্বয়ের ফলাফল। জীবনের শেষের দিকে এসে আলথুসার এই প্রশ্নে আবার ফিরে আসেন। ততদিনে তিনি তাঁর *Philosophy of Encounter* উত্থাপন করতে শুরু করেছেন। এই সময়ের তাঁর লেখার মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে তিনি আগেকার [বালিবারের পর্যবেক্ষণের] প্রশ্নটাকে একটা নতুন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখছেন। এখন এটা কেবল পুঁজিবাদের প্রশ্নেই শুধু নয়; বরং গোটা ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি বলেন যে উপাদানগুলোর অস্তিত্ব স্ট্রাকচারের খাতিরে নয়। এই উপাদানগুলো আছে, স্বতন্ত্রভাবে আছে, এবং তাদের মিলন ও সমন্বয় ঘটবে কি না সেটা আকস্মিকতা ও চান্সের ওপর নির্ভর করে। সব সময় যে দুধটা দই হবেই— সমস্ত উপাদান থাকা সত্ত্বেও— তার কোনো গ্যারান্টি নেই (Althusser 2006)।

আমি যে কথাগুলো বলছি তার সঙ্গে আলথুসারের এই দৃষ্টিভঙ্গির যথেষ্ট মিল আছে। পার্থক্যের জায়গাও আছে, কিন্তু সেগুলো আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। আমার মনে হয় না যে বর্তমান যুগের পুঁজিবাদ-বিরোধী গণ অভ্যুত্থানগুলোর মধ্যে টোটালিটি বা স্ট্রাকচারের কোনো ধারণা কাজ করে।

যথা, সাধারণভাবে যারা অকুপাই ওয়াল-স্ট্রিট আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন তারা ব্যাঙ্কগুলো থেকে তাদের সঞ্চয় বা সেভিংস মুছে যাওয়া বা এই জাতীয় সমস্যা নিয়ে পেরেশানিতে ছিলেন, ফলে ক্ষুব্ধও ছিলেন। সাধারণভাবে গণ-অভ্যুত্থানে যারা শরিক হন তাঁরা দৈনন্দিনের সমস্যার মুখোমুখি হয়ে আন্দোলনে নেমে থাকেন। আর তত্ত্বগত দিকগুলো নিয়ে চিন্তা মতাদর্শী পুরোহিত (ideologue) লোকেদের বেশি হয়।

আসলে আমরা বিগত দশকগুলোতে পুঁজিবাদের ক্রমবর্ধমান আধিপত্য দেখে অনেক সময় ধরে নিই যে যেহেতু আমরা তার কবলে এই ভাবে ফেঁসে যাচ্ছি তার মানে এই – পুঁজিবাদ একটা সর্বগ্রাসী দানব। আমাদের এই উপলব্ধি এমনিতে খুব একটা ভুল নয়, কিন্তু তার এই সর্বগ্রাসী ক্ষমতাটি আসছে দুটি কারণে। প্রথমত, রাজনৈতিক ক্ষমতা – দেশের অভ্যন্তরে রাষ্ট্রের এবং আন্তর্জাতিক স্তরে আইএমএফ, ডব্লিউটিও, বিশ্বব্যাংক ইত্যাদি বিশ্ব সংস্থাগুলো থেকে। এই সংস্থাগুলো অর্থনৈতিক মনে হলেও আসলে আগাগোড়া রাজনৈতিক। এগুলো পুঁজিবাদের কোনো অভ্যন্তরীণ তর্কে পরিচালিত নয়; বরং শক্তিশালী দেশগুলোর ক্ষমতাবানদের পক্ষে পরিচালিত হয়ে থাকে।

এখানে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, অ-মার্কসবাদী বা লিবারেল বুদ্ধিজীবী ও তাত্ত্বিকরা এই সব প্রশ্ন নিয়ে বেশি মাথা ঘামায় না কারণ তারা ধরেই নেন যে গোটা পৃথিবীর একই নির্দিষ্ট গন্তব্য এবং সেটা হলো পুঁজিবাদ। আপনি ঠিকই বলছেন যে তারাও মোটামুটি মেনে চলেন যে এই মানব সমাজটা সেই কারণে একটি 'সমগ্র', তবে তাদের চিন্তা "আধুনিকতা" নিয়ে এবং তার ধরণ-ধারণ কায়েম করা নিয়ে বেশি থাকে।

এবার শেষে, তৃতীয় প্রশ্নে আসা যাক। ইতিহাসগত সময় নিয়ে বিশদ আলোচনার অবকাশ এখানে নেই – বিষয়টা নিয়ে একটা আলাদা আলোচনাই করা যায়। এখানে সংক্ষেপে এটা বলা প্রয়োজন যে, আমরা যদি মানব সমাজ সম্বন্ধে যে বিবর্তনীয় ধারণা, যেখানে ক্রমশ সমাজ নিচু থেকে উচ্চস্তরে উঠে যাচ্ছে, সেই ধারণাকে খারিজ করি তাহলে আমাদের বিকল্পটা কী? আমরা যদি বলি যে শিল্পায়ন করে কৃষিকে ধ্বংস করে, আদিবাসী ও কৃষকদের নির্মূল করার ধারণাই ভুল, তাহলে আমরা কি কোনো পাল্টা দৃষ্টিভঙ্গি প্রস্তুত করতে পারছি? আমার মনে হয় একটা পাল্টা ধারণার

আবির্ভাব বিগত দুই দশকে হতে শুরু হয়েছে, কিন্তু এখনো তার দার্শনিক "উচ্চারণ" হয়নি। নিকট ভবিষ্যতে-যে সেটা হবে তার অনেক চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। আসলে বাস্তব জীবনে তো তার চিহ্ন আমরা দেখেইছি, হালে জ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্রে তার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। বাস্তব জীবনে ১৯৯০-এর দশকের পর থেকে যেখানে আমরা দেখছি আধুনিক শ্রমিক শ্রেণি প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে এবং রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছে, ঠিক সেই সময়ে যাদের আমরা "অতীতের অবশেষ" ভাবতাম – অর্থাৎ আদিবাসী ও কৃষক – তারা আজ বিশ্বজুড়ে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। আমাদের থিওরি এটা মানুক আর না মানুক, আজকে মনে হয় যেন ইতিহাস 'পশ্চাদপসরণ' করছে। জ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্রেও ঠিক এই সময়ের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি আধুনিকতার 'সময়' সম্পর্কে যে লিনিয়ার ধারণা ছিল, সেটাকে প্রথমে উত্তর-আধুনিকতার আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয় এবং পরবর্তীকালে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকা প্রভৃতি দেশের বুদ্ধিজীবীদের, বিশেষ করে আদিবাসী (indigenous people) বুদ্ধিজীবীদের সমালোচনার শিকার হতে হয়। প্রশ্নটা অবশ্য এখন কেবল সমালোচনার নয়, আদিবাসী জীবনের মূল্যগুলোকে ভিত্তি করে নতুন করে ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়েছে। এই বিষয়টা এইখানে এখন এর বেশি বলা সম্ভব নয়, কিন্তু আগামী সময়ে এই ব্যাপারে আমরা অনেক নতুন চিন্তা ভাবনার সম্মুখীন হব এটা নিশ্চয়ই বলা যায়।

সারোয়ার তুষার: তার মানে, দুধ থেকে সবসময় যে দই-ই হবে এমন কোনো কথা নেই। একই উপাদানসমূহ সবসময় একই স্ট্রাকচারে নিয়ে যাবে ইতিহাস প্রসঙ্গে এমন কোনো দাবি করা যায় না। আকস্মিকতা, পরিস্থিতি, সুযোগ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, রাজনৈতিক ক্ষমতার সমন্বয় ছাড়া একটা বিশেষ স্ট্রাকচার দাঁড়ায় না। রাজনৈতিক ক্ষমতার অভিপ্রায় বদলে গেলে কিংবা পরিস্থিতি ও ইতিহাসের ভিন্ন বাস্তবতা হাজির হলে একই উপাদান সত্ত্বেও ফলাফল ভিন্ন হতে পারে। আমরা যারা স্ট্রাকচারে বিশ্বাস করি বা ধরে নিই সকল ঘটনায় এক অন্তর্নিহিত স্ট্রাকচার ক্রিয়াশীল তাদের জন্য দার্শনিক এতিয়েন বালিবারের এই দার্শনিক পর্যবেক্ষণটি মনে রাখা খুবই জরুরি যে – উপাদানগুলোর অস্তিত্ব স্ট্রাকচারের নিমিত্তে নয়; বরং উপাদানগুলোর বিশেষ ধরনের মিলন ও সমন্বয়ের ফলাফল হচ্ছে স্ট্রাকচার। এইভাবে ভাবতে গেলে 'ইতিহাসের অনিবার্য যুক্তি', 'পুঁজির ইন্টার্নাল লজিক', স্ট্রাকচারের অভ্যন্তরীণ বিধি ও পূর্ব-অস্তিত্ব সংক্রান্ত প্রচলিত ধারণা

দারুণভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হয়। উপাদান ও স্ট্রাকচারের সম্পর্ক নিয়ে আপনি আরও বলুন। উপাদান ও কাঠামোর সম্পর্ক তাহলে কীভাবে বোঝা দরকার?

আদিত্য নিগম: এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগে বলে রাখি যে দুধ থেকে দই হওয়ার রূপকটা কিন্তু লুই আলথুসার স্বয়ং ব্যবহার করেছেন। আলথুসারের পর্যালোচনা সামগ্রিকভাবে পুঁজিকে কেন্দ্র করে এবং 'উৎপাদন পদ্ধতি'র ধারণার প্রসঙ্গে— রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্ন কিন্তু উনি তোলেননি। সেই অংশটি আমি টেনে এনেছি। আলথুসারের পক্ষে এই প্রশ্নটা তোলা সম্ভব ছিল না কারণ তিনি তখনো (অর্থাৎ ১৯৮০-র দশকের শেষের দিকে) মোটামুটি মার্কসবাদের 'টেক্সট' সমূহের পরিপ্রেক্ষিতেই পুঁজিবাদের কথা ভাবছিলেন যেখানে 'রাজনীতি' পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং তার স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করা যায় না। যদিও শেষ জীবনে তিনি দর্শনের দিক থেকে মার্কসবাদ থেকে অনেকটা সরে গিয়েছিলেন, রাজনীতির প্রশ্ন নিয়ে তিনি তখনো আলাদা করে ভাবছিলেন না।

প্রশ্নের সূত্রপাত হয় ১৯৬০-এর দশকের গোড়ায় যখন আলথুসার তাঁর কয়েকজন ছাত্রদের নিয়ে মার্কসের *ক্যাপিটাল* গ্রন্থের ওপর সেমিনার শুরু করেন এবং যার শেষে *রিডিং ক্যাপিটাল* বইটি বের হয়। এই বইয়ে এতিয়েন বালিবার তাঁর লেখায় মার্কসের *Grundrisse* এর বিশ্লেষণ করে দেখান যে পুঁজিবাদের আবির্ভাব কাঠামোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের ফলে ঘটছে না; বরং দুটি পৃথক ইতিহাসের সঙ্গমের দরুন হচ্ছে। এই দুটি ইতিহাস – একদিকে মুক্ত শ্রমিক ও অন্যদিকে বিত্তবান লোকেদের ইতিহাস – দুটি আলাদা উপাদানের আলাদা ইতিহাস। এই দুইয়ের সামনা-সামনি আসাতে, বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পুঁজিবাদের জন্ম হয়।

জীবনের শেষ পর্যায়ে আলথুসার যখন তাঁর *Philosophy of the Encounter* লিখছেন, তখন তিনি এই প্রশ্নে ফেরত আসেন। তাঁর নতুন দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে কাঠামো ও উপাদান সম্পর্কে এবার তিনি দাবি করেন যে কাঠামো উপাদান-সমূহের আগে আসে না, এবং উপাদান-সমূহের অস্তিত্ব কাঠামোর খাতিরে নয়। তাদের অস্তিত্ব এই জন্য নয় যে এক দিন কাঠামোর অংশ হয়ে তারা ধন্য হবে। তারা স্বতন্ত্রভাবে জগতে ভেসে বেড়ায় এবং বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে, উপযুক্ত পূর্বশর্তগুলো দেখা দিলে সেইগুলো দইয়ের মতো 'জমে' যেতে পারে। আবার না-ও 'জমতে' পারে।

আমি আলথুসারের এই বক্তব্যের সাথে একমত। তিনি পোস্ট-স্ট্রাকচারালিজমের 'ভিন্নতার' (difference) আগ্রহের সঙ্গে একমত হয়েও কাঠামো নিয়ে মার্কসবাদের চিন্তাটি কিন্তু বর্জন করছেন না। তাঁর বক্তব্য এই যে, কাঠামোটা এই 'জমে যাওয়ার' ফলে জন্মায় এবং ইতিহাসে বেশ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তা টিকে থাকতে পারে। উনি আবার এটাও স্বীকার করবেন যে এই কাঠামোতে সবাই বা সব স্তরগুলো সমান নয় – তাদের মধ্যে বৈষম্য আছে, আছে 'হায়ারার্কি' – কারণ এই 'জমে যাওয়া'র ফলে শুধু যে 'ঐক্য' কায়েম হয় তাই নয়, একই সঙ্গে কায়েম হয় নানা ধরনের শ্রেণিবিভাগ। যে উপাদানগুলোর এতদিন আলাদা অস্তিত্ব ছিল তারা যখন একই কাঠামোর অংশ হয়ে যায়, তখন তারা তাদের স্বতন্ত্র সত্তা হারিয়ে অসমানতার বন্ধনে বাঁধা পড়ে যায়। এখানে আমি তাঁর কথাটা খানিকটা সরল করে বললাম যেন বুঝতে সুবিধা হয় মার্কসবাদের সঙ্গে তফাতটা কোন জায়গায়। এই কাঠামোর মধ্যে সংঘাত থাকবে, সংঘর্ষ থাকবে কিন্তু তার কোনো অনিবার্য নিয়ম খুঁজে বার করা সম্ভব নয়, তার অনিবার্য পরিণতির তো প্রশ্নই ওঠে না।

আমি মনে করি উনি যে কথাটি বলেননি এবং যেটা না বুঝলে এই কাঠামোর টিকে থাকার রহস্যটা বোঝা সম্ভব নয় – সেটা হলো রাজনৈতিক ক্ষমতা বা রাষ্ট্রের ক্ষমতা। আমি মনে করি এটাও কোনো শ্রেণি-ক্ষমতার ব্যাপার নয় – তার চেহারা, চরিত্র ও আকস্মিকতা; পরিস্থিতি ও সুযোগের ওপরে নির্ভর করে এবং অর্থব্যবস্থার সঙ্গে তার সংযোগও নানান বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনার ফলে তৈরি হয়ে থাকে।

সারোয়ার তুষার: সুদীপ্ত কবিরাজ আপনার *ডিকলোনাইজিং থিওরি* বইয়ের এক দীর্ঘ ক্রিটিক্যাল রিভিউ লিখেছেন (Kaviraj 2021)। সেখানে তিনি লিখেছেন, মার্কসবাদী পদ্ধতিতেই পুঁজিবাদকে 'উৎপাদন পদ্ধতি' (mode of production) এবং সোশ্যাল ফর্মেশন – এই দুইভাবেই দেখার সুযোগ আছে। আলথুসারিয়ান মার্কসবাদীদের বরাত দিয়ে উনি দেখাচ্ছেন, একটা কংক্রিট সোশ্যাল ফর্মেশনে একাধিক 'উৎপাদন পদ্ধতি'; অর্থাৎ কোনো একক 'mode' নয়, 'modes' থাকা সম্ভব। এই জটিলতাকে ধরার জন্যই 'structured totality' কথাটার আবির্ভাব। সুদীপ্ত কবিরাজ থেকে উদ্ধৃতি করি: "To me, therefore, co-presence of different structures which might possess their different temporalities, is

assumed to be part of the basic idea of a historical totality."

তিনি আরও লিখেছেন, একটা ফর্মেশনের কথা চিন্তা করাই যুক্তিযুক্ত যেখানে বিভিন্ন স্ট্রাকচার – পুঁজিবাদী ও প্রাক-পুঁজিবাদী (pre-capital) কাঠামো – একটা আরেকটাকে পরাভূত না করে একে অন্যের বর্তমানতার সাথে সহাবস্থান (coexist) ও মানিয়ে নিতে বাধ্য থাকে। সুদীপ্ত কবিরাজের এই বক্তব্য সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

আদিত্য নিগম: প্রথমেই বলি সুদীপ্তদা আমার শিক্ষক এবং আলথুসারের সঙ্গে আমার পরিচয় তিনিই করিয়ে দেন। সেই ১৯৭৮-৭৯ সালে আমি যখন জেএনইউতে এম এ পড়ি তখন। উনি যেটা বলছেন ঠিকই বলছেন। সে সময়কার আলথুসারের লেখাগুলোর মধ্যে 'structured totality' ও 'structure-in-dominance' কথাগুলো ব্যবহার করা হয়েছে ঠিক যে অর্থে সুদীপ্ত-দা বলছেন সে অর্থেই। কিন্তু আমার মনে হয় যে কোনো সোশ্যাল ফর্মেশনে একাধিক উৎপাদন পদ্ধতির সহ-অবস্থানের কথা মেনে নিলে একটা সমস্যা থেকে যায় এবং সেটা হলো: মার্কসবাদ বলে যে প্রত্যেক উৎপাদন পদ্ধতির আলাদা নিয়ম অথবা যুক্তি আছে যেটার দ্বারা তার বিকাশ নির্ধারিত হয়ে থাকে। দুটো বা তিনটা উৎপাদন পদ্ধতি যখন একসঙ্গে এসে একটা টোটালিটিকে জন্ম দিচ্ছে তখন তার বিকাশের তর্ক বা যুক্তি কী দিয়ে নির্ধারিত হবে? মার্কসবাদীদের একটা বড় অংশ বিশ্বাস করতেন যে অবশ্যই তার মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে যেটা সব চেয়ে বেশি উন্নত সেটাই – অর্থাৎ পুঁজিবাদ – শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে বাধ্য। এটা মনে না করলে মেনে নিতে হবে এই স্ট্রাকচারটা একটা অচল কাঠামো যেখানে পুঁজিবাদী ও প্রাক-পুঁজিবাদী পদ্ধতিগুলোর সহাবস্থান একরকম static equilibrium-এর জায়গায় এসে থেমে গেছে। আসলে স্ট্রাকচারালিজমের কাছে পরিবর্তনের কোনো ধারণাই নেই। কেবল স্ট্রাকচারের জায়গায় 'historical totality' কথাটা ব্যবহার করলে কিন্তু সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। থিওরির দিক থেকে হয়ত structure-in-dominance-এর মানে ঠিক অপরিবর্তনীয়তা নয়, কিন্তু তাতে পরিবর্তনের অন্য কোনো ব্যাখ্যাও নেই। এটা হলো মার্কসবাদীদের কথা।

তবে সুদীপ্তদার সঙ্গে আমার মতের অমিলের জায়গা কিন্তু অন্যত্র। আমি মনে করি যে, যে-মুহূর্তে এই সোশ্যাল ফর্মেশনটাকে আমরা 'টোটালিটি' বলি সেই মুহূর্তেই আমাদের সমস্যা শুরু হয়। কারণ টোটালিটি মানেই তো তার মধ্যে

একটা ঐক্য থাকবে, আর তার সাথে থাকবে তার এক অভ্যন্তরীণ তর্ক বা যুক্তি। সেদিক থেকে মার্কসবাদীদের কথা ও প্রশ্ন দুটোই ঠিক। আমার মনে হয় আমরা যদি এ জাতীয় ফর্মেশনকে একটা খেলার মাঠ অথবা রণক্ষেত্রের মতো করে দেখি তাহলে কোনো দিশা বা যুক্তি খোঁজার কোনো প্রয়োজন থাকে না। খেলাটা কোন দিকে যাবে এবং কে জিতবে সেটা আগে থেকে বলা সম্ভবও নয়, তার দরকারও নেই। আর তার সঙ্গে আমার আরেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে—'বাইরে' যে বিপুল জগৎ পড়ে আছে, সেটাকে আর আমাদের 'বাহির' (outside) হিসেবে দেখতে হচ্ছে না।

শেষে আরেকটা কথা বলে রাখা দরকার। আলথুসার তাঁর শেষ জীবনে এই ব্যাপারটা অনেকটা বুঝতে পেরেছিলেন – যার জন্য তিনি কাঠামোটাকে উপাদানের ওপর বা আগে রাখেননি; বরং সেটাকে একটা ঐতিহাসিক সংযোগ হিসেবে দেখেছেন যেটা যে কোনো সময়, অন্য কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার ফলে খারিজ বা বাতিল হয়ে যেতে পারে।

সারোয়ার তুষার: সাবলটার্ন স্টাডিজের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও বর্তমান প্রাসঙ্গিকতাকে কীভাবে বিচার করবেন? সাবলটার্ন স্টাডিজ এখন আর গ্রুপ হিসেবে ক্রিয়াশীল নেই, কিন্তু এই গ্রুপের ঐতিহাসিকেরা ব্যক্তিগতভাবে বিপুল কাজ করে চলেছেন এখনো। ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু মৌলিক প্রশ্ন তাঁরা তুলেছিলেন, মার্কসবাদ থেকে শুরু করে গোটা পশ্চিমা জ্ঞানকাণ্ডের ইউরোকেন্দ্রিকতাও তাঁরা উন্মোচন করেছেন। অন্যদিকে, আরিফ দির্লিক, ভিভেক চিবের, আইজাজ আহমেদদের মতো মার্কসবাদীরা সাবলটার্ন স্টাডিজের তীব্র সমালোচনাও করেছেন।

প্রথমত, সাবলটার্ন স্টাডিজ কিন্তু মার্কসবাদের মধ্যে থেকেই ভারতবর্ষের সমাজতন্ত্রের একটা চেহারার অন্বেষণ করছিলেন, যেটা আমার ধারণা সনাতনী মার্কসবাদীরা ঠিক ধরতে পারেননি। অনেকের আক্রমণ বা উষ্মার মাত্রা এতটাই যে মনে হয় যেন বিপ্লবটা প্রায় হয়েই যাচ্ছিল, পোস্ট কলোনিয়ালিজম কিংবা সাবলটার্ন স্টাডিজ এসে সব ভণ্ডুল করে দিয়েছে। যে-কোনো নতুন চিন্তা বা বাঁধা ছকের বাইরে কাউকে ভাবতে দেখলেই দলকানা মার্কসবাদীরা যে প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে থাকে, এর মনস্তত্ত্ব কী? এটা কি তাঁদের কোনো ইনসিকিউরিটি?

দ্বিতীয়ত, আপনারা যখন কাজ শুরু করলেন, সাবলটার্ন স্টাডিজকে আপনারা

কীভাবে নিলেন? কোন কোন ক্ষেত্রে সাবলটার্ন স্টাডিজের মুনশিয়ানা বাহবা দেয়ার মতো? বর্তমানের জমিনে দাঁড়িয়ে ভাবলে, তাদের সীমাবদ্ধতাগুলোই বা কী ছিল?

আদিত্য নিগম: প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ এবং আমার মনে হয় আমাদের ইতিহাসের ওই অংশটাকে নিবিড়ভাবে খতিয়ে দেখা দরকার। আপনি যাদের 'সনাতনী মার্কসবাদী' বলছেন তাদের সঙ্গে এ বিষয়ে কোনো বিতর্কে যাওয়ার আমার কোনো ইচ্ছা নেই। কারণ আপনি ঠিকই বলেছেন যে তাদের সমালোচনায় ভাবখানা এমনই থাকে যে বিপ্লব যেন ঘটেই যেত যদি না এঁরা – subaltern studies আর postcolonial studies— এসে সব ভণ্ডুল করে দিত। একথাও একদম ঠিক যে বাঁধাধরা ছকের বাইরে কেউ ভাববার চেষ্টা করলেই পার্টিমনস্ক ও নীতিবাগীশ মার্কসবাদীরা তাদের সন্দেহের চোখে দেখেন। আসলে এঁরা মার্কসবাদকে একটা ধর্মের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন যেখানে এঁরা পণ্ডিত সেজে ধর্মগ্রন্থগুলোকে রক্ষা করে থাকেন। ওনারা যা ব্যাখ্যা করবেন তার বাইরে গিয়ে কেউ ভাবতে পারবে না। মনে হয় যেন মার্কসবাদ এঁদের পৈত্রিক সম্পত্তি।

আমাদের দেশের ইতিহাসে এবং চিন্তাভাবনার জগতের ইতিহাসে সাবলটার্ন স্টাডিজের একটা বিশেষ জায়গা আছে। ইতিহাসের একটা বিশেষ সন্ধিক্ষণ ও পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে – নকশালবাড়ির আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে – পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত কিছু বুদ্ধিজীবীদের, বিশেষ করে ইতিহাসবিদদের মধ্যে অনেকগুলো প্রশ্ন জাগে। প্রশ্নগুলো আমার মতে দুই ধরনের ছিল – এক, অনেক ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিকতার সঙ্গে স্বাধীন ভারতের অব্যাহত সম্পর্ক আর দুই, কৃষক সমাজের স্বতন্ত্র বা স্বায়ত্ত চেতনা ও আন্দোলনের ইতিহাস যেটা এতদিন জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের অংশ হিসেবে দেখা হতো। কৃষকদের স্বতন্ত্র আন্দোলন ও চেতনার প্রশ্ন এই পর্যায়ে মূল প্রশ্ন হিসেবে সামনে আসে। সত্তরের দশকের শেষের দিকে আন্তোনিও গ্রামশির *Prison Notebooks* প্রকাশিত হয় এবং বাংলার বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রচণ্ড সাড়া জাগায়। সাবলটার্ন স্টাডিজের 'subaltern' কথাটা গ্রামশির লেখা থেকেই নেয়া। শুধু এই শব্দটাই নয়, গ্রামশির লেখায় অধীনস্থ শ্রেণি ও সমূহগুলোর রাজনীতি সম্পর্কে অনেক নতুন অন্তর্দৃষ্টি পাওয়া যায়।

রণজিৎ গুহ এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে এই বুদ্ধিজীবীদের এক জায়গায়

জড়ো করেন। এঁদের মধ্যে অনেকে – যেমন শাহিদ আমিন, জ্ঞান পাণ্ডে, জ্ঞান প্রকাশ – এঁরা বাঙালি নন আর নকশালও ছিলেন না[১]। শাহিদ অবশ্য রণজিৎ গুহ-র প্রভাবে আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তবে সব মিলিয়ে কৃষক সমাজের স্বতন্ত্র চেতনার সন্ধানে বেরিয়ে পড়া এই বুদ্ধিজীবীদের হাতে গ্রামশি এমনই এক হাতিয়ার হয়ে উঠলেন যে তাঁর সাহায্যে এঁরা জাতীয়তাবাদী ও মার্কসবাদী দুই ধরনের ইতিহাস লেখার প্রখর সমালোচনা প্রস্তুত করলেন। 'Subaltern' কথাটার মানে কিন্তু শুধু কৃষক নয়; ফলে এই ধারণাটি আসার ফলে দৃষ্টিটাও অনেকটা পাল্টাতে হলো। এখানে ***Subaltern Studies*** এর বিশদ আলোচনা তো সম্ভব নয়। কিন্তু এটা বলা যেতে পারে যে, ইতিহাস লেখনের এই প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে আমরা অনেক কিছু শিখেছি এবং বোঝার সুযোগ পেয়েছি। যাদের স্বর ইতিহাসে লুপ্ত হয়ে আছে, যাদের আওয়াজ আমরা কোথাও শুনতে পাই না, সেই আওয়াজটাকে উদ্ধার করে ইতিহাস লেখনের মধ্যে আনা যায় কি করে, কলোনিয়াল আর্কাইভটাকে কীভাবে পড়লে আমাদের পক্ষে এই স্বরটাকে সামনে নিয়ে আসা সম্ভব – এমন অনেক কিছু আমরা এই অধ্যায়ের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বুঝতে ও জানতে শিখেছি।

সাবলটার্ন স্টাডিজের দ্বিতীয় পর্যায়ে এডওয়ার্ড সাঈদ ও ফুকোর প্রভাবে যে সকল নতুন প্রশ্ন সামনে আসতে থাকে তার দিকে নজর দেয়া হয়। এই পর্যায়ে প্রধানত পার্থ চ্যাটার্জির নেতৃত্বে পশ্চিমা জ্ঞানকাণ্ডের ও জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ঔপনিবেশিকতার সম্পর্ক ইত্যাদি নিয়ে প্রচুর কাজ হয়। আমার মনে হয় নকশাল আন্দোলনের থেকে উদ্ভূত দ্বিতীয় যে প্রশ্ন ছিল – ঔপনিবেশিকতার সঙ্গে আমাদের বর্তমানের সম্পর্কের ইতিহাসের গবেষণা শুরু হয়। আজকে আমার মনে হয় নতুন করে সেই ইতিহাসের পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে। এত বছরে আমরা অনেক কিছু শিখেছি, অন্যভাবে বুঝতে শিখেছি– সেগুলোকে মাথায় রেখে নতুন করে ওই ইতিহাসটা আবার খতিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে। তবে সনাতন মার্কসবাদীরা যে ভাবে করতে চান, সে ভাবে করার কোনো মানেই হয় না।

সারোয়ার তুষার: *ডিকলোনাইজিং থিওরি*-তে আপনার কহতব্য কী? প্রশ্নটা এভাবেও রাখা যায়, কেন তত্ত্বের বিউপনিবেশায়ন করা দরকার? একটা সময় পর্যন্ত, 'ডিকলোনাইজেশন' কথাটার মানে ছিল পশ্চিমা হানাদারি দখল ও লুণ্ঠন থেকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের মুক্তি তথা স্বাধীন নেশন-স্টেট

অর্জন। কিন্তু এই ডিকলোনাইজেশন তো কুখ্যাত খেমারুজ শাসন রুখতে পারেনি। তার মানে আজকে আপনারা যে ডিকলোনাইজেশন বলছেন, এর সাথে অ্যান্টি-কলোনিয়াল ডিকলোনাইজেশনের বিস্তর ফারাক আছে নিশ্চই। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই প্রশ্নটা করা। ডিকলোনাইজেশন যদি তথাকথিত সোনালি অতীতের হাহাকার কিংবা পেছনে ফিরে যাওয়া না হয়ে থাকে, তাহলে ডিকলোনাইজেশন মূলত কী? এর সাথে তত্ত্বেরই বা সম্পর্ক কী? আপনার 'ডিকলোনাইজিং থিওরি' কথাটার সাথে আবার 'থিংকিং অ্যাক্রস দ্যা ট্র্যাডিশনস' কথাটা জুড়ে দেয়া আছে। 'Thinking across the traditions'-কে আমি বাংলা করেছি বিভিন্ন চিন্তা ঐতিহ্যের মধ্যে গতায়াত। দ্বিতীয় ধাপের প্রশ্নটি হলো, ডিকলোনাইজিং থিওরির সাথে এই বিভিন্ন চিন্তা ঐতিহ্যের মধ্যে গতায়াত কীভাবে সম্পর্কিত? তৃতীয় প্রশ্ন, ডুয়িং থিওরি বা তত্ত্ব করা প্রকল্পে আপনাদের মূল বক্তব্য কী?

আদিত্য নিগম: প্রশ্নগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আসলে একথা ঠিকই যে এক কালে এটা ধরে নেয়া হয়েছিল-যে পশ্চিমা হানাদারি ও দখল থেকে মুক্তি পাওয়াই যথেষ্ট। সেটা করতে পারলেই আমরা আবার নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারব। ফলে জাতীয় মুক্তিই ছিল আসল বা শেষ কথা। কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তীকালে দেখা গেল যে একটার পর একটা, এই স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো আসলে প্রত্যেকে 'উপনিবেশিত'ই রয়ে গেল। সেই পুরনো আইন, সেই একই রাষ্ট্রের কাঠামো, সেই পুঁজিবাদী অর্থনীতি এবং সেই একই শিক্ষা-ব্যবস্থা ও পাঠ্যক্রম। অনেকদিন তো এগুলো চোখেও পড়েনি। বহু দশক ধরে আমরা – বিশেষ করে মার্কসবাদীরা – অর্থনৈতিক নিরবচ্ছিন্নতাই কেবল দেখতে পেতাম এবং এটাকে 'নিও-কলোনিয়াল' আখ্যা দিতাম। তার মানে এই যে বিদেশী শাসনের অবসান ঘটলেও অর্থব্যবস্থার ওপর তাদের ও তাদের পুঁজির প্রভাবটা বজায় থাকার দরুন আমরা পুরোপুরি স্বাধীন হতে পারছি না। ওরা এখনো কলকাঠি নেড়ে যাচ্ছে। সেই কারণে অনেক নব্য-স্বাধীন দেশগুলো আবার সেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর কবলে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে।

আসলে ব্যাপারটা অত সোজা নয়। আসল ব্যাপারটা এই যে দুইশ বছরের গোলামির ফলে আমাদের গোটা চিন্তা-ভাবনার ধরনধারণই এমন হয়ে গেছে যে পশ্চিমের তৈরি ছকের বাইরে আমরা আর ভাবতেই পারি না। এখানে

একটা কথা পরিস্কার বলে নেয়া দরকার। চিন্তার জগতে কোন ধারণা কোত্থেকে এসেছে তা কখনোই আলাদা করে বলে দেয়া সম্ভব নয়। খ্রিস্টান ধর্ম এশিয়াতে জন্মেও আজকে ইউরোপীয় ধর্ম হিসেবেই পরিচিত। তার পরবর্তী বিকাশে ইউরোপেরই অবদান বেশি। আর আমাদের মতো দেশগুলোর তো আরেকটা সমস্যা আছে – আমাদের নিজেদের সম্পর্কে যে ধারণা, আমাদের 'আত্ম-জ্ঞান', আসলে দুইশ বছরের ঔপনিবেশিক শাসনে তৈরি হয়েছে। ভারতে গোটা ঊনবিংশ শতাব্দী ধরে উপনিবেশবাদের পৃষ্ঠপোষকতায় যে জ্ঞান তৈরি হয়েছে, যে গবেষণা হয়েছে এবং আমাদের সম্বন্ধে তাদের যা ধারণা ছিল – এই সবের দ্বারাই, এগুলোর প্রভাবের মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের 'জাতীয় সংস্কৃতি' গড়ে তুলেছি। ফলে আমাদের আজকের জাতীয় সংস্কৃতি ও আত্ম-জ্ঞান কোনো নির্ভেজাল প্রাক-ঔপনিবেশিক 'আত্মের' পুনরুদ্ধার মাত্র এমন দাবি একদম বাজে কথা। কিন্তু উপনিবেশবাদ-বিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শুধু আমাদের দেশগুলোতেই নয়, সমস্ত পরাধীন দেশগুলোতে এ ধরনের এক উগ্র-জাতীয়তাবাদী ঝোঁক দেখা দিয়েছে যেটা দাবি করে যে সে এক হারানো সোনালি অতীতকে আবার উদ্ধার করে এনেছে – যার ভিত্তিতে সে সব রকম ভেজাল বার করে এক বিশুদ্ধ বা খাঁটি সংস্কৃতি তৈরি করবে। Khmer Rouge এই মানসিকতারই পরিণতি – যার সম্ভাবনা উপনিবেশবাদের মধ্যে সর্বদাই থাকে (Nigam 2021b)

ফলে 'ডিকলোনাইজিং থিওরি' বলতে আমি কোনো প্রাক-ঔপনিবেশিক চিন্তা বা তত্ত্ব উদ্ধার করার কথা বলছি না; বরং আমি চিন্তার ক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিতে চাইছি। আমাদের নিজেদের প্রয়োজন মতো থিওরি তৈরি করাই হচ্ছে এটার মূল কথা। এটা করতে গিয়ে আমরা কি পশ্চিমা জ্ঞানকাণ্ড বর্জন করব? একেবারেই নয়। প্রয়োজন মতো আমরা সেটা কাজে লাগাব। কিন্তু আমরা কি কেবলমাত্র সেই জ্ঞানকাণ্ডের ওপরে ভর করে থাকব? এখানে আমি জোর দিয়ে বলতে চাই, আদৌ তা নয়। এতদিন ধরে আমরা এটাই বুঝেছি যে থিওরি বা দর্শন কেবল তারাই করতে পারেন আর আমাদের কাজ হলো শুধু সেটা আমাদের পরিস্থিতিতে 'প্রয়োগ' করা। আমাদের সমাজগুলোর যে স্বতন্ত্র কোনো চাহিদা থাকতে পারে এবং সেটার জন্য আমাদের-যে অন্যভাবে ভাববার প্রয়োজন থাকতে পারে, থিওরি ও দর্শনের জন্য-যে আমরা অন্যান্য

'চিন্তা ঐতিহ্য' থেকে শিখতে পারি – এই সমস্ত প্রশ্ন আজও আমাদের কাছে অভাবনীয়। সেক্যুলারিজম, গণতন্ত্র, পুঁজিবাদ থেকে শুরু করে সবকিছুই তো তারা ভেবে গেছেন। আমাদের আবার নতুন করে কি ভাববার কিছু থাকতে পারে? আমি এই মনোভাবটাকেই খারিজ করতে চাইছি। এখানে এই বিষয়ের বিশদ আলোচনা সম্ভব নয়, কিন্তু এইটুকু বলে রাখতে চাই যে ইউরোপের 'আলোকপ্রাপ্তির' আগে যে সারা পৃথিবী অন্ধকারে বাস করছিল এ কথা একদম ভুল। আমাদের অঞ্চলসহ আরব, ইরান (পারস্য), চীন ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের চিন্তা-ভাবনার থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার ও বোঝার আছে। 'Thinking across Traditions' বলতে আমি এটাই বোঝাতে চাই যে এখন আমাদের নিজেদের পায়ের ওপর দাঁড়াবার জন্য আমাদের কেবলমাত্র ইউরোপের ওপর ভরসা করলে চলবে না। মৌলিক কোনো চিন্তা ভাবনা আমাদের দ্বারা সম্ভব নয় – এমন হীনমন্য চিন্তা আমাদের দ্রুত কাটিয়ে উঠতে হবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে 'doing theory' কথাটা আমি ব্যবহার করি থিওরি 'apply' করার থেকে তার পার্থক্যটা বোঝাবার জন্য। সুদীপ্ত কবিরাজ অনেক সময় ঊনবিংশ শতকের ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের একটা কথার উল্লেখ করে থাকেন, যেখানে ভূদেব বলেন-যে আমাদের দেশে "বিজ্ঞান করা হয় না, বিজ্ঞানের গল্প করা হয়"। আমরা বিভিন্ন বিদেশি বৈজ্ঞানিকদের কৃতিত্ব নিয়ে গল্প করেই সন্তুষ্ট হয়ে যাই, নিজেরা বিজ্ঞান করি না। থিওরি করা বা 'ডুইং থিওরি' কথাটা সেই অর্থেই বুঝতে হবে।

সারোয়ার তুষার: সম্প্রতি চিলিতে রেজিমের পালাবদল ঘটেছে। নতুন প্রেসিডেন্ট হয়েছেন সাবেক ছাত্রনেতা বামপন্থী গ্যাব্রিয়েল বোরিচ। তিনি কট্টর ডানপন্থী রক্ষণশীল নেতা জোসে অ্যান্তোনিও কাস্তকে পরাজিত করে রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসেছেন। সঙ্গতকারণেই বিশ্বজুড়ে বৃহত্তর অর্থে বাম-প্রগতিশীল মহল এতে উচ্ছ্বসিত। আপনিও আপনার এক ফেসবুক পোস্টে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি আপনার মধ্যে এক ধরনের সতর্কতাও লক্ষ করলাম। আপনি লিখেছেন: "While I am immensely overjoyed at Boric's victory, I am scared too." উচ্ছ্বাসের পাশাপাশি আপনার এই শঙ্কার কারণ কী? বিশ শতকের 'রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র' মডেল থেকে বামদের সরে আসার জরুরতের ওপর আপনি আপনার বিভিন্ন

লেখায় জোরারোপ করেছেন। রাষ্ট্র ক্ষমতায় গিয়ে বামপন্থীরাও বারবার সেই পুঁজিবাদের খপ্পরেই পড়ছে, ভারী শিল্পায়নভিত্তিক উন্নয়নের হাতছানি আর মোহ এড়াতে পারছে না। বলিভিয়া, ব্রাজিল, পেরুর মতো দেশগুলোতে ডানপন্থার উত্থানের একটা বামপন্থী পটভূমির কথা আপনি বারবার বলছেন (Nigam 2022)।

আপনার সম্পূর্ণ ফেসবুক পোস্টটি পাঠকদের স্বার্থে তুলে ধরছি:

> With Gabriel Boric's resounding victory in Chile, one can see once again that winds of change are blowing everywhere. (Except this God-forsaken country, of course). While I am immensely overjoyed at Boric's victory, I am scared too. Not because of the enemy but because the resurgent new Left- from the Latin American Pink Tide (Brazil's PT, Bolivia's Evo Morales and MAS etc) to Syriza—seems to have led to nowhere, except for providing alibis to the extreme Right. We have yet to see what happens to Podemos or the new Peruvian regime. Keeping fingers crossed. However, I can't help feeling that all these failures have to do with the fact that the Left hasn't yet thought through what it's alternative to 20th century state socialism is or can be. It has been, unfortunately, barking up the wrong tree. In any case, it doesn't see beyond the immediacy of the moment of struggle. Knee jerk reactions then follow when they happen to assume power. And everywhere they end up replicating the capitalist, extractivist model that inevitably turns against the peasantry and indigenous people. Industrialization remains key to their fantasy. This observation is not coming from pessimism but an 'optimism of the will' as well.

প্রথমত, চিলির রেজিম পরিবর্তন নিয়ে আপনার শঙ্কার জায়গাটা কী তা জানতে চাইব। আরও সাধারণভাবে, ক্ষমতায় যাওয়ার পর বামপন্থী দলগুলো যে 'রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র' করতে চায় আপনি একে কেন সমস্যাজনক মনে

করেন?

দ্বিতীয়ত, আমাকে দেয়া আগের সাক্ষাৎকারে আপনি নতুন ধরনের বামপন্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন (সারোয়ার ২০২১)। এছাড়াও, অন্য একটা লেখায় 'Urgent Need to Reinvent the Left'- এর কথা বলেছেন (Nigam 2020c)। বাম রাজনীতিতে রূপকল্পগত কী কী আমূল পরিবর্তন আসা দরকার বলে মনে করেন?

আদিত্য নিগম: আসলে আমরা এই শতাব্দীতে একটা সম্পূর্ণ নতুন পরিস্থিতিতে বাম রাজনীতি করতে শিখছি যার বাঁধাধরা কোনো পথ নেই। এটার জন্য সমস্যা তৈরি হয় বটে, কারণ গত শতাব্দী জুড়ে যখনই বামপন্থীরা ক্ষমতায় এসেছেন তারা জানতেন মোটামুটি তাদের 'কী করিতে হইবে' আর কী নয়! ধরুন শিল্পের রাষ্ট্রীয়করণ কিম্বা চাষে যৌথ মালিকানার প্রবর্তন করা, বাজারের ওপরে ভরসা না করে প্ল্যানিং-এর সাহায্য নেয়া ইত্যাদি। মোটামুটি সোভিয়েত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই আমরা চলতাম এবং নতুন কোনো বামপন্থী শক্তি ক্ষমতায় আসলে সেই অভিজ্ঞতাকেই একটু এদিক ওদিক করে তাদের নিজেদের পথ বার করে নিতেন। পরে চীনের উদাহরণটা সামনে এল এবং সোভিয়েত অর্থ-ব্যবস্থার সমালোচনা করে মাও এক অন্য পথ খোঁজার চেষ্টা করলেন। স্তালিনের ভারী শিল্পায়নের পথটা বর্জন করে তিনি 'দুই পায়ে হাঁটার' (walking on two legs) তত্ত্ব হাজির করলেন। অর্থাৎ শিল্প ও কৃষি উভয়ের ভূমিকা তিনি স্বীকার করলেন এবং প্রযুক্তিকে প্রাধান্য না দিয়ে 'জনগণ'-এর ওপর ভর করার ওপর জোর দিলেন। বিংশ শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, এই দুই ধরনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই সমস্ত আলোচনা হতো এবং তার শিক্ষা নিয়েই বিভিন্ন দেশ তাদের নিজেদের পথ বার করেছেন। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশেও, যেখানে 'আফ্রিকান সমাজতন্ত্রের' কথা বলা হতো, তারা একটু আলাদা পথ নিলেও মাথায় রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের রেফারেন্স পয়েন্টই থাকত। পরবর্তীকালে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতনের পর, আরেক ধরনের সমস্যা দেখা দিল। দিশেহারা মার্কসবাদীরা এবার পুঁজিবাদের 'তর্কের' কাছে নতি স্বীকার করে পুঁজিবাদ গড়ার কাজেই মশগুল হয়ে যেতে থাকলেন।

চিলি সম্পর্কে আমার মন্তব্যে আমি এই দুই পরিস্থিতির দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছিলাম। বিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের মডেলটা অবলম্বন

করলেও বিপদ আছে, আবার তার পতন থেকে ভুল শিক্ষা নিলেও বিপদ আছে।

আগে রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের মডেলের কথা আলোচনা করা যাক। প্রথেমেই এটা বোঝা দরকার-যে, যে-সমস্ত দেশে রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র কায়েম হয়েছিল সেই দেশগুলোতে সংখ্যাগরিষ্ঠের নামে আসলে এক সংখ্যালঘু ভ্যানগার্ড পার্টি ক্ষমতা দখল করে। এরপর সমস্ত রকমের স্বাধীনতা বাতিল করে একটা মাত্র পার্টির একচেটিয়া রাজত্ব কায়েম করে। গণতন্ত্রের অভাবে পরিচালিত অর্থব্যবস্থার মধ্যে জনসাধারণের দিক থেকে কোনো ফিডব্যাক আসার কোনো সম্ভাবনা তো ছিলই না; যেহেতু বাজারকেও খারিজ করা হয়েছিল, সেহেতু ওই রাস্তা দিয়েও ফিডব্যাক আসার কোনো সম্ভাবনা রইল না। রাষ্ট্রের প্ল্যানিং বোর্ড যা ঠিক করে দেবে সেটাই সবাইকে মেনে চলতে হবে।

সে তুলনায় আজকের পরিস্থিতি একদম ভিন্ন। সোভিয়েত পতনের পর অনেক বামপন্থী – বিশেষ করে লাতিন আমেরিকার বামপন্থীরা – গণতন্ত্রের মূল্য অন্যভাবে বুঝতে শিখেছেন। গণতন্ত্রের এই নতুন মূল্যায়নের পেছনে অবশ্য ১৯৬০ থেকে ১৯৮০-র দশকের ব্যর্থ সশস্ত্র বিপ্লবগুলোর ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা কাজ করেছে। যাই হোক, একুশ শতকে লাতিন আমেরিকা জুড়ে নব্য-বামপন্থার যে আবির্ভাব আমরা দেখছি, সেই বামপন্থা এটা পরিষ্কার বুঝেছে যে – যেমন বুঝেছে পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশেও – গণতন্ত্রকে 'বুর্জোয়া' বলে খারিজ করা ভুল। কারণ গণতন্ত্র বুর্জোয়া শ্রেণির দেয়া কোনো উপহার নয়; শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের লড়ে অর্জন করা একটা মূল্যবান জিনিস। কাজেই সমাজতন্ত্রের পথটা গণতন্ত্র প্রসারের মধ্যে দিয়েই যাবে, তাকে খারিজ করে নয়। এই পথের অসুবিধা এই যে এক ঝটকায় ক্ষমতা দখল করে অর্থব্যবস্থার পরিবর্তন করা যাবে না; বরং অনেক ওঠা-নামার মধ্য দিয়ে সে পরিবর্তন ঘটাতে হবে। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। ফলে অনেক কিছু নতুন করে খতিয়ে দেখার আর বোঝার প্রয়োজন আছে, যেটা আমার মনে হয় আমরা আজ অবধি করে উঠতে পারিনি। রাষ্ট্রকে 'শ্রেণি-রাষ্ট্র' বলে কথা শেষ করে দিলে তো কাজ চলতে পারে না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চরিত্রই আলাদা এবং সেখানে শাসক শ্রেণির স্বার্থ চাইলেই হাসিল করা যায় না। তাই তাদের নানান ধরনের দুর্নীতির পথ ধরতে হয় এবং গণতন্ত্রকে পরাভূত করার উপায় বার করতে থাকতে হয়। সত্তরের দশকের শেষের দিকে

গ্রিক সমাজবিদ নিকোস পুলান্তজাস (Nicos Poulantzas) এই প্রশ্ন নিয়ে অনেক কিছু ভেবেছেন ও লিখেছেন— সেগুলো নিয়েও তেমন কোনো বিতর্ক বা আলোচনা বামপন্থীদের মধ্যে হয়েছে বলে আমার জানা নেই। তিনি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে শ্রেণি সংগ্রামের আখড়া বা রণক্ষেত্রের মতো দেখেন যেখানে 'পপুলার' রাজনীতি সর্বদাই হাজির (Poulantzas 1978)। কমিউনিস্টরা যেহেতু এখনো এই প্রশ্নগুলো ভেবে দেখেননি, সেহেতু তারা এখনো মনে করেন যে এই শ্রেণি রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে কিছু করা সম্ভব নয়, ফলে চেষ্টা করাও বৃথা। একথা শতভাগ ঠিক যে যখনই গণতন্ত্র তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে, শাসক শ্রেণি সেটাকে নানাভাবে ধ্বংস করা বা উল্টে দেয়ার চেষ্টা এখনো চালিয়ে যাবে। ফলে সেইসব চক্রান্তের সম্ভাবনাগুলোও মাথায় রাখা দরকার। রাষ্ট্র যদি শ্রেণি সংগ্রামের আখড়া হয় তাহলে বিচিত্র রকমের সংগ্রামের বহু-বিচিত্র রূপের জন্য বামপন্থীদের প্রস্তুত থাকাই উচিত। তবে এটাও মনে রাখা দরকার যে আজকের যুগে একমাত্র গণতন্ত্রের মধ্যেই ব্যাপক জনসাধারণকে নিজেদের দিকে টেনে আনার সুযোগ আছে। আবার এটাও পরিষ্কার-যে এই পথে এগোতে হলে 'রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের' গণতন্ত্র-বিরোধী মনোভাব ছাড়তে হবে এবং আগের মতো করে বাজারকে খারিজ করা যাবে না – তেমন গণতন্ত্র-বিরোধী মনোভাব একমাত্র কোনো স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেই সম্ভব।

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরটা বোধহয় আগেই দেয়া হয়ে গেল। এবার বাজার ও শিল্পের জাতীয়করণের প্রশ্ন সম্বন্ধে একটা কথা বলে রাখতে চাই। বাজার মানেই পুঁজিবাদ নয়। যুগ যুগ ধরে বাজার ও বাণিজ্য আছে – কারিগর বা শিল্পী হিসেবে মানুষ নিজে যা উৎপাদন করে সেটা বাজারে বিক্রি করে এসেছে দেশে-বিদেশে। বাজারের একটা বিশেষ চেহারা আছে যেটা আমরা পুঁজিবাদের উদ্ভবের পরে দেখতে পাই, যেটাকে কার্ল পোলানির (Karl Polanyi) ভাষায় 'disembedding of markets from social relations' বলা যেতে পারে (Polanyi 2001)। অর্থাৎ পুঁজিবাদের আবির্ভাবের পরে সামাজিক সম্পর্কগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 'বাজার' এমন এক আকার গ্রহণ করে, যার ফলে সে আমাদের জীবনটাকেই পরিচালিত করতে শুরু করে। এই প্রলয়ংকারী বাজারের লাগাম টানতে গিয়ে বা একে বশে আনতে গিয়ে যদি আমরা খোদ 'বাজার'কেই খারিজ করে বসি, তাহলে আমরা এক মারাত্মক ভুল করব যেটা রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রে করা হয়েছে। পণ্য

উৎপাদন (Commodity production) মাত্রই তাকে 'পুঁজিবাদ' সাব্যস্ত করা হয়েছে। শিল্পের জাতীয়করণের প্রশ্নটাও এটার সঙ্গে জড়িত। যা কিছু পুঁজিবাদী সব রাষ্ট্রের আয়ত্তে আসবে – এই মনোভাব নিয়ে চললে সরকারের কাজ কেবল অর্থব্যবস্থা পরিচালনা করাই থেকে যায়। কোনো কেন্দ্রীয় শক্তিই সে কাজ করতে পারে না। এর ফল তো আমরা রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের পতনে দেখেইছি।

পরিশেষে এটা বলি যে চিলির রেজিম পরিবর্তনের প্রসঙ্গে আমার আশংকার কারণ এই-যে, ওপরে যে সব প্রশ্ন আমি তুলেছি, সেসব নিয়ে খুব একটা ভাবনা চিন্তা তো হয়ইনি; উপরন্তু পুঁজিবাদকে সমাজের অগ্রগতির এক অনিবার্য স্তর বা ধাপ মনে করার প্রবণতা এখনো বজায় আছে বলে মনে হয়। আমি জানি না চিলিতে এটা নিয়ে কেমন ভাবনা চিন্তা হয়েছে – তবে এ নিয়ে বিশেষ লেখাজোখা দেখিনি। গ্যাব্রিয়েল বোরিচের জয় আসলে কোনো এক প্রবৃত্তি বা পার্টির জয় নয়। এই জয়ের পেছনে সমর্থন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সামাজিক আন্দোলনগুলোর বিশাল এক কোয়ালিশন। এটা তাদের শক্তি তো বটেই, কিন্তু এটাও খেয়াল করার বিষয় যে তাদের মধ্যে শরিক আছে কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে শুরু করে আরও অনেক রকম পুরনো বামের প্রতিনিধি শক্তি। তাদের মধ্যে কোনো নতুন চিন্তা ভাবনা হয়েছে কি না সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। তারা কতটা চাপ সৃষ্টি করতে পারবে বোরিচের ওপর, তার ওপরে অনেক কিছু নির্ভর করবে।

শুধু তাই নয়, আমরা বিগত দুই দশকের নব্য-বামপন্থার অভিজ্ঞতায় যা দেখতে পেয়েছি তাতে খুব একটা ভরসা হয় না। এই নব্য-বামপন্থার ভিত্তি এখন মূলত আদিবাসী (indigenous peoples) জনগোষ্ঠীর মধ্যে হলেও পুঁজিবাদ ও শিল্পায়নের গণ্ডি থেকে বেরোবার কোনো লক্ষণ চোখে পড়ে না। এটা ঠিক যে ইভো মোরালেসের মতো আদিবাসী নেতার নেতৃত্বে পরিচালিত বলিভিয়ার সরকার কিছু কিছু ব্যাপারে নতুন চিন্তা ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছিল। 'শিল্প বিপ্লব' ও শিল্পায়ন নিয়ে অনেক প্রশ্নও তারা তুলেছিল, কিন্তু বিশ্ব-পুঁজিবাদের কবল থেকে বেরোবার পাল্টা-ব্যবস্থা কিংবা পথ কী হতে পারে এইসব নিয়ে তাদের কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। ফলে আবারও ওই পুরনো পথে অগ্রসর হয়ে ফেঁসে গেল। শেষাবধি এই সব রেজিমের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণ-অসন্তোষ থেকে ডানপন্থী শক্তিগুলো ফায়দা লুটল।

সারোয়ার তুষার: আধুনিক রাষ্ট্র, সার্বভৌমত্ব, পলিটিক্যাল ইত্যাদি বর্গের তো একটা ইউরোপীয় ইতিহাস আছে – যা এখন সর্বজনীন তথা তামাম দুনিয়ার সাধারণ ইতিহাস বনে গেছে। যে কারণে আমরা আধুনিক রাষ্ট্র ও সার্বভৌমত্বের ইতিহাস লিখতে গিয়ে ইউরোপের ইতিহাসেরই চর্চা করি। ধরে নিই যে প্রাক-আধুনিক যুগেও আমাদের অঞ্চলে ইউরোপের মতোই সার্বভৌম শাসক ছিল। অথচ একথা আজকাল আর কারোর জানতে বাকি নেই যে প্রাক-আধুনিক জমানায় আমাদের অঞ্চলসমূহে সার্বভৌম শাসক বলতে কিছু পাওয়া যায় না। রাজা কিংবা সম্রাট সমস্তকিছুর ঊর্ধ্বে ছিলেন না; বরং আইন তথা ধর্ম ঊর্ধ্বে তুলে ধরাই ছিল রাজার কর্তব্য। আপনি লিখেছেন:

> Many political thinkers of modern India point us towards a notion of state in pre-colonial times that stands in relative marginality to the social order. (Nigam 2020e: 157)

অর্থাৎ, প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে রাষ্ট্র ছিল সামাজিক বিন্যাসের প্রান্তে। আবার ইউরোপের রাজনৈতিক দর্শন যেভাবে রিলিজিওন ও পলিটিকসের সুস্পষ্ট ভেদ মেনে এগিয়েছে, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সেই একই ইতিহাস মেলানো যায় না। আপনি বলছেন রিলিজিওন, ভায়োলেন্স ও পলিটিকস পরস্পর পরস্পরকে গঠন করে (Nigam 2016)।

এই সূত্র ধরেই আপনার কাছে জিজ্ঞাসা: সার্বভৌমত্ব ও পলিটিক্যালকে আমাদের বাস্তবতায় বুঝতে হলে কী কী বিষয় আমলে নেয়া জরুরি? 'ফর্মেশন অব পলিটিক্যাল' সম্পর্কে বলুন। আপনার লেখায় 'সোশ্যাল পলিটি' নামক বর্গের ব্যবহার দেখা যায়, 'সোশ্যাল পলিটি' বলতে আপনি আসলে কী বোঝাতে চান? (Nigam 2020e)

আদিত্য নিগম: সার্বভৌমত্বের ধারণা ইউরোপে একটা বিশেষ প্রসঙ্গে সামনে আসে। সর্বপ্রথম সার্বভৌমত্ব ছিল একমাত্র একেশ্বরবাদী খ্রিষ্টান ঈশ্বরের। কেবল তাঁর জন্যই এই ধারণা বা প্রত্যয় ব্যবহার করা হতো। পরে সেটা রাজনৈতিক ক্ষমতার বৈধতা কায়েম করার একটা থিওরি হয়ে দাঁড়ায়, যেটাকে বলা হতো 'divine right of kingship'। অর্থাৎ শাসক বা রাজা হচ্ছেন ভগবানের দ্বারা নির্বাচিত – অতএব বৈধ। ফলে পৃথিবীতে ভগবানের প্রতিনিধি হিসেবে সার্বভৌমত্ব হয়ে দাঁড়ায় রাজার। বোঝা দরকার যে একেশ্বরবাদী ঈশ্বরের নিজের ক্ষমতা যেমন একচেটিয়া, তাঁর প্রতিনিধি রাজার

ক্ষমতাও তারই অনুরূপ। আরও মনে রাখা দরকার-যে বিশেষ করে যেটাকে আমরা 'অন্ধকারময় মধ্যযুগ' (dark middle ages) বলে জানি – যেটা ইউরোপের ইতিহাসের একটা বিশেষ অধ্যায় – সেই যুগে গির্জার 'আধ্যাত্মিক শক্তি' ও রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ক্ষমতা একে অপরের সাথে গাঁথা ছিল। ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত। ফলে আধুনিক যুগের গোড়ায় জ্যাঁ বদাঁ (Jean Bodin) কিম্বা রুশো (Rousseau) যখন সার্বভৌমত্ব বা sovereignty-কে পরিভাষিত করেন তখন এই একচেটিয়া ক্ষমতার বিষয়টাকেই তাঁরাও প্রধান মনে করেন। সার্বভৌমত্ব ছিল অবিভাজ্য ও শর্তহীন (indivisible and absolute)।

ভগবান/খোদার প্রতিনিধির ধারণা-যে আমাদের দেশগুলোতে বা ইসলামে ছিল না তা নয় – কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে তো একেশ্বরবাদের তেমন কোনো চলন ছিল না। ফলে হিন্দু বা বৌদ্ধ গ্রন্থগুলোতে চক্রবর্তী রাজার[২] কথা বলা থাকলেও সে সেই অর্থে সার্বভৌম ছিল না। এই বিষয়ে আমি পরে আরও বলব। অন্যদিকে ইসলামেও 'খিলাফত' ও 'সালতানাত' এর মধ্য একটা ভেদ গোড়া থেকেই হয়ে গিয়েছিল। একাদশ শতাব্দীতে খোদ আল-গাজালি সুলতানকে একচেটিয়া ক্ষমতা দিলেও এটা পরিষ্কার করে দেন যে তিনি কিন্তু খলিফা নন।

ভারতে ও বৃহত্তর দক্ষিণ এশিয়ায় তো রাজনৈতিক ক্ষমতার গঠন একেবারে অন্য রকম ছিল। যে কারণে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বেশির ভাগ বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদ বার বার এই কথার ওপর জোর দেন যে রাষ্ট্রের চেয়ে আমাদের ইতিহাসে সমাজের গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি। রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক ক্ষমতার নিশ্চয়ই একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, কিন্তু সেটা সামাজিক গঠনের সহায়ক হিসেবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহাত্মা গান্ধী ছাড়াও অনেকে এই দিকটার ওপর জোর দিয়েছেন। ইতিহাসবিদরা এটাও দেখিয়েছেন যে ভারতের মতো দেশে এই প্রাচীন ব্যবস্থা মুসলমান শাসনেও – অর্থাৎ সালতানাত ও মুঘল শাসনকালে – বজায় থেকেছে। তারাও কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতার সেই চরিত্রটি বজায় রেখেছেন। এই চরিত্রের বৈশিষ্ট্য কী? এখানে বলতে হয় যে ভারত ও দক্ষিণ এশিয়াতে শুধু নয়; দক্ষিণ পূর্ব ও পূর্ব এশিয়ার অনেকগুলো দেশে ক্ষমতার একটা বিচ্ছুরিত চেহারা দেখা যায় – একটা কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের জায়গায় আমরা দেখতে পাই তারামণ্ডলের মতো একটা সূত্রে অনেকগুলো

রাজ্য। এটাকে বৌদ্ধ ও হিন্দু টেক্সটগুলোতে 'মণ্ডল' বলা হয়। এছাড়া আমি আমার কাজে 'সোশ্যাল পলিটি' কথাটি ব্যবহার করেছি। এই ধারণাটি ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের *Studies in Indian Social Polity* (বাংলায় *ভারতের সমাজ পদ্ধতি*) থেকে ধার নেয়া। ইংরেজিতে 'সোশ্যাল পলিটি' কথাটি ব্যবহার করে উনি ক্ষমতার গঠনের আরেকটা দিকের ওপর দৃষ্টিপাত করার জন্য আমাদের আমন্ত্রণ জানান— যেটা চূড়ায় থাকা রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও তারামণ্ডলের মতো বিচ্ছুরিত রাজ্যসমূহ, উভয়ের থেকে আলাদা। এই গ্রন্থে ভূপেন দত্তের বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে জাতি ও বর্ণ-ব্যবস্থা, যেটাকে তিনি 'রাজনৈতিক' ক্ষমতার একটা স্তর হিসেবে দেখতে চান। আমার মনে হয় যে আমাদের দেশগুলোতে 'পলিটিক্যাল' বলতে আমরা কেবল রাষ্ট্রের কথা বলে ইতি টানতে পারি না (Nigam 2008)। এই তিনটি স্তর নিয়েই আমাদের দেশগুলোতে রাজনৈতিক ক্ষমতার বিন্যাস তৈরি হয়।

এখানে আমি আধুনিক গণতান্ত্রিক রাজনীতির কথা বলছি না – কারণ সেখানে, বলাই বাহুল্য, রাজনৈতিক দল, গণ-আন্দোলন ইত্যাদির কথাও উঠতে বাধ্য। আমার আলোচনার বিষয় এখানে নানান দেশে ও সমাজে যেভাবে 'পলিটিক্যাল' এর আলাদা ইতিহাস ও আলাদা চেহারা ছিল, সেটা নিয়ে। তালাল আসাদের 'ফর্মেশান্স অফ দ্যা সেকুলার' এর অনুসরণে 'ফর্মেশান্স অফ দ্যা পলিটিক্যাল' বলতে আমি এটাই বোঝাতে চাই যে আলাদা আলাদা দেশকালে ক্ষমতার – বিশেষ করে রাজনৈতিক ক্ষমতার – গঠন বিশেষ রূপ নেয়। এটা বুঝতে হলে ইউরোপের রাজনীতির ইতিহাস জানা যথেষ্ট তো নয়ই, বিভ্রান্তিকরও বটে।

সারোয়ার তুষার: আগের প্রশ্নের উত্তরে আপনি লিখেছেন: "আমার মনে হয় যে আমাদের দেশগুলোতে 'পলিটিক্যাল' বলতে আমরা কেবল রাষ্ট্রের কথা বলে ইতি টানতে পারি না"; আবার এ-ও বলছেন যে আপনি 'আধুনিক গণতান্ত্রিক রাজনীতি'র কথা বলছেন না, কারণ আধুনিক গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে রাজনৈতিক দল, গণ-আন্দোলনের প্রসঙ্গ ওঠে। আপনি বরং নানান দেশে ও সমাজে 'পলিটিক্যাল'-এর আলাদা ইতিহাস ও আলাদা চেহারা খতিয়ে দেখতে চান। সেক্ষেত্রে যে প্রশ্নটা হাজির হয়: আধুনিক যুগে তো বিশ্বের সকল দেশেই – এমনকি আমাদের দেশগুলোতেও – আধুনিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা এই রাষ্ট্র পেয়েছি নিষ্ঠুর কলোনির অভিজ্ঞতার

মধ্য দিয়ে। একদিকে বর্তমানকালে বিশ্বের সর্বত্র 'রাষ্ট্র', অন্যদিকে একেক দেশে, একেক সমাজে 'পলিটিক্যাল' ফর্মেশনের ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাস। এই ঘটনার তাৎপর্য কী? অভিন্ন রাষ্ট্র-ব্যবস্থার মধ্যেই ভিন্ন ভিন্ন 'পলিটিক্যাল' এর ইতিহাস রাষ্ট্র ও পলিটিক্যালের সম্পর্কের কোনদিক উন্মোচন করে?

দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশগুলোতে 'পলিটিক্যাল' বলতে আমরা কেবল রাষ্ট্রের কথা বলে ইতি টানতে পারি না কেন?

আদিত্য নিগম: আসলে ব্যাপারটা একদিক থেকে বলতে গেলে খুবই সোজা। এতদিন আমরা যেভাবে আধুনিক রাজনীতি বুঝে এসেছি এবং আমাদের ছাত্রদের পড়িয়ে এসেছি তাতে সব গল্পেরই শুরু ইউরোপে। আপাতত আমি গ্রিসকেও ইউরোপের মধ্যে ধরে নিচ্ছি – আধুনিক বাস্তবকে মাথায় রেখে। তবে বলে রাখা দরকার-যে মধ্যযুগের আরব দার্শনিকরা যখন গ্রিসের দর্শনকে সম্বল করে তাদের নিজেদের ভাবনা চিন্তার বিকাশ করতেন, তারা কিন্তু সেটাকে এক অর্থে নিজেদের অতীত ভেবেই করতেন। ক্লাসিকাল যুগের বৌদ্ধিক ভূগোলের (intellectual geography) দিক থেকে গ্রিস ছিল ভূমধ্যসাগর এলাকারই অংশ, যেখানে ইউরোপের চেয়ে এশিয়া মাইনর বা আনাতোলিয়া ও মিশর ইত্যাদি এলাকার সঙ্গে তার সম্পর্ক বেশি ছিল। মধ্যযুগে ইউরোপ যখন তার অন্ধকার যুগে ঘেরা, তখন গ্রিসের বৌদ্ধিক উত্তরাধিকারকে বাঁচিয়ে রেখেছেন এবং বিকশিত করেছেন আরব দার্শনিকেরাই।

যাই হোক, আজকের দিনে আমরা যেহেতু গ্রিসকেও ইউরোপের অংশ হিসেবে জানি, এটা বলা ভুল হবে না যে – আগে যে কথা বলছিলাম – আমরা যেভাবে রাজনীতি বা গণতন্ত্রের ইতিহাস বর্ণনা করে থাকি তাতে সব কিছুর উৎসই ইউরোপে। সেই অর্থে আমরা নিজেদের ইতিহাসের নানান বৈশিষ্ট্য বেমালুম ভুলেই গেছি। এটা আমি কোনো জাতীয়তাবাদী আগ্রহ বা আবেগ থেকে বলছি না। এই ভুলে যাওয়ার ফল হয়েছে মারাত্মক; কারণ আমরা আসলে আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রগুলোকে কেবলমাত্র ইউরোপের ইতিহাসের এক বিশেষ পর্যায়ে আবির্ভূত রাষ্ট্রের নকল মনে করি। এটা তো ঠিকই – আপনি যে প্রশ্নটা তুলেছেন – যে আজ গোটা পৃথিবীতে উপনিবেশবাদের মাধ্যমে এই রাষ্ট্রটা ছড়িয়ে পড়েছে; এমনকি, যাদের কাছে এটা ছিল না তাদেরও ইচ্ছা ও স্বপ্ন হয়ে দাঁড়াল সেই রাষ্ট্র অর্জন করা। বলতে গেলে আধুনিক রাজনীতির লেনদেনের ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে 'রাষ্ট্র'। ভারত ও

চীনসহ বিভিন্ন দেশের মুক্তি আন্দোলন ও বিপ্লবেরও উদ্দেশ্য হয়ে গেল এই আধুনিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু আমরা যেটা ভুলে যাই – এবং যেটা এখন পৃথিবী জুড়ে অনুভব করা হচ্ছে – সেটা হলো আসলে এই নতুন 'রাষ্ট্র' কখনোই পুরাতনকে একেবারে ধ্বংস বা নিশ্চিহ্ন করে তার আধিপত্য কায়েম করতে পারে না। আমি আগে 'মণ্ডল' এবং 'social polity' নিয়ে যে কথাগুলো বলেছিলাম তার সঙ্গে এই প্রশ্নের সম্পর্ক আছে। কারণ আমাদের এখানে যেহেতু কখনো কোনো কেন্দ্রীভূত সার্বভৌম কোনো ক্ষমতা (খ্রিষ্টান একেশ্বরবাদের সাথে যার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল) ছিল না; সেহেতু আধুনিক রাষ্ট্রের 'উপরিকাঠামো'র তলায় তলায় ক্ষমতার সেই বিচ্ছুরিত চেহারা থেকেই গেছে। আমরা যে ইউরোপের মতো রাষ্ট্র গড়তে পারছি না, এটাকে আমরা চিরকাল আমাদের 'সভ্যতার অভাব' কিম্বা 'বিকাশের অভাব' বলেই ব্যাখ্যা করে যাব, যদি না আমরা বুঝতে শিখি যে আসলে আমরা যে ভিতের ওপর, যে উপাদান নিয়ে সেটা গড়ার চেষ্টা করছি তাতে ইউরোপের আদলে রাষ্ট্র জিনিসটা তৈরি হতে পারে না। ওপর থেকে দেখলে একরকম হলেও, আসলে তলায় তার চেহারা একদম আলাদা হতে বাধ্য।

একটা উদাহরণ দিয়ে বললে বোধহয় কথাটা আরও স্পষ্ট হবে। আমাদের দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে অনেক সময়ই আমরা লক্ষ করে থাকি যে নির্বাচনে যে পার্টিই জিতুক না কেন, স্থানীয় ক্ষমতার কাঠামো খুব একটা পাল্টায় না। স্থানীয় স্তরে এই হিসাবটা করে নেয়া হয় – কোন দল জিতলে আমাদের কি করতে হবে যাতে আমরা ক্ষমতার গণ্ডির মধ্যে থাকতে পারি। একেবারে জল মাথার ওপর দিয়ে চলে গেলে, অসাধারণ কোনো পরিস্থিতি দেখা দিলেই কেবল স্থানীয় স্তর বড় স্তরের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে। তখনই আমরা বড় আকারের রেজিম পরিবর্তনের সম্ভাবনার আভাস পাই। সেই কারণে আমার মনে হয় আমাদের বর্তমান রাজনীতির চেহারা ভালো করে বুঝতে হলে আমাদের নিজেদের ইতিহাস খতিয়ে দেখতে হবে এবং সেটা করতে গেলেই আমরা দেখতে পাব যে কেন্দ্রীয় 'রাষ্ট্রের' ক্ষমতার বাইরেও একটা বিশাল পরিসর পড়ে আছে যেটা ঠিক আমাদের চোখে পড়েনি।

সারোয়ার তুষার: সাম্প্রতিক সময়ে 'পপুলিজম' ক্যাটাগরিটি বেশ গুরুত্ব পাচ্ছে। বিচিত্র ধরনের রাজনৈতিক পক্ষ, প্রবণতা, বৈশিষ্ট্য ও মতাদর্শকে

'পপুলিজম' হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়ে থাকে। আবার শব্দটিকে ঘিরে বিভ্রান্তিও বিপুল। একদিকে আছে জনতার যে-কোনো প্রকারের উত্থানকে নিন্দার্থে 'পপুলিজম' বলার এলিটিস্ট প্রবণতা। এই অভিজাত নাক-উঁচামিকে মোকাবিলা করতে গিয়ে অনেকে আবার "জনগণ কোনো ভুল করতে পারে না" কিসিমের রিভার্স-এলিটিস্ট ভাবালুতায় ভোগেন। ফলে বিভ্রান্তি আরও বাড়ে। বিশেষত যারা জন-উত্থান ও গণতান্ত্রিক তৎপরতার পক্ষে থাকতে চান, অথচ হিস্টেরিয়াগ্রস্ত গণ-উন্মাদনাকে ন্যূনতম প্রশ্রয় দিতে চান না – তাদের জন্য 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি' পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

অবশ্য, আর্নেস্তো লাকলাউ কিংবা শান্তাল মউফের মতো গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিকেরা পপুলিজম মাত্রই নিন্দনীয় এমন মতের সাথে একমত নন। শান্তাল মউফ তো এই পপুলিস্ট মুহূর্তটাকে (populist moment) পাকড়াও করে একে বাম অভিমুখে নিতে চান (Mouffe 2018)।

আপনিও পপুলিজম নিয়ে লিখেছেন। আপনি উল্লেখ করেছেন, ভারতীয় ভাষাগুলোতে চট করে পপুলিজমের পরিভাষা পাওয়া যায় না। আপনি বলছেন:

> However, the fact that we do not have a word for this phenomenon in most of our Indian languages should be seen not simply as a sign of a lack but rather as an index of a difficulty: the difficulty of trying to think the complex terrain of popular politics in India through borrowed categories by simply translating them, without undertaking the necessary theoretical labour required to make them workable for us. If we undertake a study of mass politics in India, we are likely to come to very different conclusions about what we can very broadly refer to as populism. It is not likely to be anything like the populisms of Latin America or the USA or Europe. (Nigam 2021c)

বাংলা, উর্দু কিংবা হিন্দি ভাষায় জন, গণ, আওয়াম, লোক শব্দগুলোর অর্থ ইতিবাচক বলে আপনি উল্লেখ করেছেন। পপুলিজমের যে সকল পরিভাষা ভারতীয় ভাষাগুলোতে করার চেষ্টা করা হয়েছে, সেগুলোর মাধ্যমে পপুলিজমকে ঠিকঠাক বোঝা যায় না। যেমন বাংলায় 'লোকরঞ্জনবাদ' বা

'জনতুষ্টিবাদ' শব্দগুলো চালু আছে। কিন্তু এই শব্দগুলো দ্বারা সর্বোচ্চ যা বোঝা যায় – রাজনৈতিক দল/নেতা জনগণকে তুষ্ট করার চেষ্টায় লিপ্ত। কিন্তু পপুলিজম বলতে যদি কেবল নেতারা কী করছেন/করেন তা না বুঝিয়ে, আরও বেশি কিছু বোঝায় – অর্থাৎ লিবারেল-প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি গণ-অসন্তোষ ও গণ-বিদ্রোহ/উত্থান বোঝায়, সেক্ষেত্রে উল্লিখিত পরিভাষাসমূহ যথেষ্ট নয়। আপনার ভাষ্যে:

> But if populism is not just about what leaders do but as the above discussion suggests, constitutes a revolt against liberal- representative political system, we need to understand it as a mass phenomenon.

বাংলা পরিভাষা যদি করতেই হয় আপনি 'জনবাদ' শব্দটি ব্যবহারের পক্ষে। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও 'জনবাদ' শব্দটি ব্যবহার করেন (পার্থ ২০২১খ)।

কয়েকটি ধাপে প্রশ্ন করতে চাই। প্রথমত, পপুলিজম বলতে আপনি আসলে কোন ধরনের ফেনমেননকে বুঝতে আগ্রহী? পপুলিজম কি কোনো মতাদর্শ? নাকি এটা কোনো পলিটিক্যাল রেজিম?

দ্বিতীয়ত, আর্নেস্তো লাকলাউ এর মতে, পপুলিজম হচ্ছে ক্ষমতাধর এলিটদের বিরুদ্ধে বাদ পড়ে যাওয়া 'আন্ডারডগ' জনতার রাজনৈতিক মহড়া (মবিলাইজেশন) ও সক্রিয়তার একটা ডিস্কার্সিভ রাজনৈতিক ফ্রন্ট নির্মাণ (Laclau 2006)। শান্তাল মউফ একে মতাদর্শ কিংবা রেজিম হিসেবে সাব্যস্ত না করে 'a way of doing politics' হিসেবে সাব্যস্ত করতে চান যা বিভিন্ন মতাদর্শিক (ideological) রূপ ধারণ করতে পারে (Mouffe 2018)। আপনি তো লিখেছেন আমাদের অঞ্চলের পপুলিজম নিয়ে তত্ত্ব করতে গেলে কিংবা আমাদের অঞ্চলের গণ-রাজনীতির প্রকরণ, বৈশিষ্ট্য বুঝতে গেলে পশ্চিম থেকে ধার করা ক্যাটাগরির বিচার-বিবেচনাশূন্য ব্যবহার কোনো কাজে আসবে না। আমাদের অঞ্চলের গণ-রাজনীতির ইতিহাস পপুলিজম সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্ন সিদ্ধান্তে আমাদের নিয়ে যেতে পারে। সেই ভিন্ন সিদ্ধান্তটা কী? কী করে আমরা বুঝব আমাদের অঞ্চলগুলোর সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত?

তৃতীয়ত, ডেমোক্রেসিকে আমরা বাংলায় বলি 'গণতন্ত্র'। হিন্দিতে সম্ভবত 'লোকতন্ত্র'। পপুলিজমের বাংলা পরিভাষা যদি 'জনবাদ' হয়, সেক্ষেত্রে এই

'জনবাদ' এর সাথে গণতন্ত্রের লেনদেনের ধরনটা কেমন? অর্থাৎ, এই বর্গ দুটি কি পরস্পরের পরিপূরক? নাকি একে অপরের সাংঘর্ষিক? নাকি এদের মধ্যে সমান্তরাল বোঝাপড়া চলতে পারে?

চতুর্থত, বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে ডানপন্থার উত্থান দেখা যাচ্ছে। পপুলিজমের ডিসকোর্সে ডানপন্থার অবস্থানটা কেমন? অর্থাৎ, পপুলিজম মাত্রই কি ডানপন্থী? এর উত্তর সহজে বলে দেয়া যায়, না। ফলে উল্টো করে যদি জানতে চাওয়া হয়, সাম্প্রতিক কালের ডানপন্থা মাত্রই কি পপুলিস্ট? উত্তর যদি হয়, হ্যাঁ। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হচ্ছে 'কেন ও কীভাবে'?

আদিত্য নিগম: প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আমি বলব-যে আসলে পপুলিজমকে কোনো মতাদর্শ বা রেজিম ইত্যাদি হিসেবে দেখতে গেল বিপদ আছে কারণ নানা ধরনের রাজনীতির সঙ্গে তার সংযোগ থাকতে পারে। ডানপন্থী রাজনীতির মধ্যে যেমন, ঠিক তেমনি বাম রাজনীতির মধ্যেও পপুলিজমের উপস্থিতি থেকে থাকে। আর্নেস্তো লাকলাউ এর ১৯৭০ এর দশকের লেখার প্রসঙ্গ তুলে যদি বলি, পপুলিজমের কোনো শ্রেণিগত বা মতাদর্শগত ভিত্তি নেই – তখনকার মার্কসবাদী লাকলাউ অবশ্য শ্রেণি ও মতাদর্শের সম্পর্ক অনেকটা মেনে নিয়েই চলতেন (Laclau 1977)। আজকে আর আমাদের পক্ষে (শ্রমিক) শ্রেণি ও (বাম) মতাদর্শের মধ্যে কোনো সম্পর্ক সে ভাবে দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু সে যুগের আলথুসারিয়ান মার্কসবাদের প্রভাবে লাকলাউ তখনো কিন্তু এদের মধ্যে একটা সোজা সম্পর্ক দেখতে নারাজ ছিলেন এবং তখন থেকে শ্রমিক শ্রেণির বারে বারে ফ্যাসিবাদ ও ডানপন্থী রাজনীতির দিকে সরে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ করছিলেন। সেই লেখাতে লাকলাউ পপুলিজমকে মূলত একটা 'ডাক' কিম্বা 'আহ্বান' অথবা 'interpellation' হিসেবে দেখার প্রস্তাব রাখেন। এই 'ডাক' এক বিশেষভাবে 'জনগণের' ডাক হয়ে দেখা দেয় যেটা বাম বা ডান, যে-কোনো মতাদর্শের সাথে যুক্ত হয়ে যেতে পারে। মনে রাখতে হবে-যে তখনকার আলথুসারের কাজে 'interpellation' এক বিশেষ গুরুত্ব রাখে – কারণ ডাকে 'সাড়া' দেয়ার মধ্য দিয়েই ব্যক্তি ইডিওলজির দ্বারা 'recruit' হয়ে সমাজে তার নির্দিষ্ট জায়গা পায়। লাকলাউ এটাকে পপুলিজম ও ফ্যাসিবাদের গবেষণার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন। উনি 'পপুলার interpellation' এর কথা বলেন যেটা আধুনিক রাজনীতিতে জনগণের বিশিষ্ট অবস্থান ও ভূমিকার সঙ্গে যুক্ত। এই পপুলার interpellation

গণতান্ত্রিক রাজনীতির কেন্দ্রে যেমন থাকে, ফ্যাসিবাদের mobilization এ-ও ততই সহজে জায়গা পেয়ে যেতে পারে। আমার মতে এখনো এই ধারণটাই সঠিক। লাকলাউ তাঁর পরবর্তী কাজে যেভাবে পপুলিজমকে বুঝতে চেষ্টা করেন তাতে বিষয়টা আরও অনেক বেশি ব্যাপক হয়ে যায়। পুরনো বিশ্লেষণটি এবার একটা নতুন আকারে সামনে আসে, যেটার উল্লেখ আপনি করেছেন : 'আন্ডারডগ' জনতার রাজনৈতিক মহড়া ও সক্রিয়তার একটা ডিসকার্সিভ রাজনৈতিক ফ্রন্ট নির্মাণ' – কিন্তু একটা অন্যদিকও যোগ হয়ে যায়। তাঁর কথায় 'populism is the royal road to the construction of the political itself' (Laclau 2006)। এটা আমার সঠিক মনে হয় না। এর চেয়ে বরং শান্তাল মউফের 'a way of doing politics' কথাটা এখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তারই সঙ্গে আজকের এই সময়টাকে 'populist moment' হিসেবে ধরা আমাদের ভাবনা-চিন্তার আরও অর্গল খুলে দেয়।

এবার প্রশ্ন হলো আমাদের উপমহাদেশের দেশগুলোতে পপুলিজমের ক্যাটাগরিটা খাটে কি না? মজার ব্যাপার এই যে আসলে 'পপুলিজম' কথাটা কয়েক দশক আগে কেবল 'পিছিয়ে পড়া' দেশগুলোর ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হতো। পশ্চিমের গবেষকেরা ভাবতেন-যে এই সমস্ত দেশে, যেখানে একদিকে অর্থনৈতিক বিকাশ অবরুদ্ধ আর অন্যদিকে গণতন্ত্রের পদ্ধতিগুলো ঠিকমতো রপ্ত হয়নি, সেই দেশগুলোতেই পপুলিজম একটা সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। তখন কিন্তু এই বর্গটা আমাদের অতটা আকৃষ্ট করেনি – কেননা আমরা তো 'ওদের' মতো হতে চাইছিলাম। এখন যখন পপুলিজমের কিছু কিছু লক্ষণ ইউরোপে ও আমেরিকাতেও দেখা দিয়েছে, তখন অবশ্যই নতুন করে ভাববার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এখন এটার দামও বেড়ে গেছে – সবাই যে যার দেশে পপুলিজম খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাতে এই ক্যাটাগরিটা এমনভাবে ফুলে ফেঁপে গেছে-যে মনে হয় সব কিছুই তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া যায়। লাকলাউ যেহেতু তাঁর আর্জেন্টিনার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সারা জীবন পপুলিজম নিয়ে ভাবলেন, তাঁর চিন্তায় আমরা কিন্তু একটা অন্য চেহারা দেখতে পাই যেটা ইউরোপের এলিট তাত্ত্বিকদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একদম অন্য রকম। এখানে জনগণকে নিয়ে সেই সংশয়, সেই নেতিবাচক মনোভাব নেই। তবে তাঁর কাজের মধ্যে পেরোনিজমের (Peronism)[৩] অভিজ্ঞতার এক পরিষ্কার ছাপ আছে। ওই ধরনের কোনো অভিজ্ঞতা আমাদের দেশগুলোতে

নেই।

আমার কথা হলো এই, যেহেতু উপনিবেশবাদ-বিরোধী সংগ্রামের সময় থেকে আমাদের জাতীয়তাবাদী এলিট শ্রেণিকে শুধু যে জনগণের সঙ্গে মানিয়ে চলতে হয়েছে তাই নয়, তার নামেই স্বাধীনতার লড়াই লড়তে হয়েছে। ফলে, ওই ধরনের 'জনগণের ভয়' এখানে দেখা যায় না যেটা ইউরোপে উনিশ শতকে বা বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় দেখা গেছে। কিন্তু আমাদের দেশগুলোতে 'জনগণ' কোনো একক বা ঐক্যবদ্ধ কোনো বস্তু নয় – আধুনিক রাজনীতির গোড়া থেকেই সেটা ধর্ম, জাতি, ভাষা ইত্যাদির ভিত্তিতে বিভক্ত। এখানে লাকলাউ এর 'দুই শিবিরে বিভক্ত' সমাজ – অর্থাৎ 'ঐক্যবদ্ধ জনগণ বনাম জনশত্রু' – খুঁজে পাওয়া মুশকিল। শুধু তাই নয়, আগে যে কথা আমি বলেছি, সেটাও মাথায় রাখতে হবে – এখানে ক্ষমতা ঐতিহাসিকভাবে বিচ্ছুরিত ছিল, কাজেই কোনো একটা মাত্র কেন্দ্রে তাকে একত্রিত করা যায় না। ভারতের উপনিবেশবাদ-বিরোধী সংগ্রামেও তা সম্ভব হয়নি। এখানে যদি আমরা বুঝতে চাই আমাদের দেশগুলোতে পপুলার interpellation কী কী ভাবে রাজনীতিতে আবির্ভূত হয়েছে তাহলে এই সব দিকগুলো মাথায় রেখে চলতে হবে।

এবার শেষে গণতন্ত্রের সঙ্গে পপুলিজম তথা জনবাদের সম্পর্কের প্রসঙ্গে আসা যাক। আমাদের আগের আলোচনা থেকে এটা তো বোঝা মুশকিল হওয়া উচিত নয়-যে এই দুই ফেনমেনার মধ্যে কোনো সোজা, এক ধরনের সম্পর্ক হতে পারে না। জনবাদের 'ডাক' বাম ও গণতান্ত্রিক রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হলে গণতন্ত্রের সঙ্গে এক ধরনের সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে, যেটা গণতন্ত্রকে আরও গণমুখী হতে এবং শাসকদের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করতে পারে। আবার সেটা গিয়ে যদি ফ্যাসিবাদী রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়, তাহলে তার ফলাফল গণতন্ত্রের জন্য মারাত্মক হতে পারে। সাম্প্রতিককালের ডানপন্থা অবশ্যই পপুলিস্ট, কিন্তু এটাকে আমি একটা ঐতিহাসিক সংযোগ মাত্র বলব। ডানপন্থীদের একটা সুবিধা আছে সব সময়ই – যেহেতু তাদের ধর্ম, জাতি, ইত্যাদির মতো পরিচয়গুলোকে কাজে লাগাতে কোনো দ্বিধা নেই; সেহেতু তারা 'জনগণ' এর একটা উদ্ভট ধারণা নিয়ে রাজনৈতিক সীমানা গড়ে তুলতে পারে। কিন্তু ইতিহাসে অনেক সময় সেগুলো কাজে দেয় না। তখন যদি গণতান্ত্রিক ও বাম রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত একটা জনবাদী রাজনীতি সামনে

আসে তাহলে পরিস্থিতি অন্যরকমও হতে পারে।

সারোয়ার তুষার: আপনার সাথে আমার আগের পর্বের আলোচনাতে আপনি বলেছিলেন, "আমার দিন দিন এই ধারণা দৃঢ় হচ্ছে যে রাজনীতি কোনো সমস্যার সমাধান নয়; বরং সকল সমস্যার উৎস।" আবার ওই একই আলোচনায় বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সাথে নিজের ফারাক বোঝাতে গিয়ে বলেছিলেন, "উনি একজন ভালো সমাজ-বিজ্ঞানীর মতো যা ঘটে যায় তার ব্যাখ্যা করেন এবং আমাদের সেটা বুঝতে সাহায্য করেন কিন্তু আমার কাছে সমাজ পরিবর্তনের প্রশ্নটিও গুরুত্বপূর্ণ।" (সারোয়ার ২০২১)

সাধারণত সমাজ-পরিবর্তনের একমাত্র উপায় হিসেবে লোকে রাজনীতির কথাই ভাবে। রাজনৈতিক উদ্যোগ-আয়োজন-সক্রিয়তা ছাড়া কোনো ধরনের সমাজ-রূপান্তর সম্ভব – এমন কথা বিশ্বাস করার লোক খুঁজে পেতে বেশ মুশকিলই হবে বলা যায়। এমন কথা তো আমরা হরহামেশাই শুনি যে 'রাজনৈতিক সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানই করতে হবে, সামাজিক সমাধানে কাজ হবে না..' ইত্যাদি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, রাজনীতি যদি সমস্যার 'সমাধান' না হয়ে, সমস্যার কারণ/উৎস হয়ে থাকে; সেক্ষেত্রে বিচিত্র রকমের সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সংকটের দাওয়াই এর পথ কী হবে? অর্থাৎ রাজনীতি ছাড়া অন্য কোন প্রক্রিয়ায় আপনি সমাজ-পরিবর্তনের কথা ভাবেন? প্রসঙ্গত এটা বলে রাখি, বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক অ্যাক্টিভিস্ট মহড়াকে নিশ্চই আপনি সমাজ-পরিবর্তনের দাওয়াই ভাবেন না। অর্থাৎ বিভিন্ন উদ্ভূত সমস্যায় দিল্লির যন্তর-মন্তরের সামনে কিংবা ঢাকার প্রেসক্লাব-শাহবাগের সামনে ব্যানার-প্ল্যাকার্ড নিয়ে দাঁড়ালেই সমাজ-পরিবর্তনের কাজটা আগাবে তা তো নয় নিশ্চই। এ ধরনের তাৎক্ষণিক ইস্যুভিত্তিক প্রতিবাদী অ্যাক্টিভিজমের নিশ্চই মূল্য আছে, কিন্তু এর দ্বারা তো কাঙ্ক্ষিত সমাজ-পরিবর্তন সম্ভব নয়। সমাজ-পরিবর্তনের পথ-প্রক্রিয়া, সংগঠিত হবার ধরন নিশ্চই আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত। প্রথমত, রাজনীতিকে আপনি সকল সমস্যার উৎস বলছেন কেন? দ্বিতীয়ত, সমাজ-পরিবর্তনের পথ-প্রক্রিয়া সম্পর্কে আপনার ভাবনা কী?

আদিত্য নিগম: এই প্রশ্নের এই মুহূর্তে কোনো বিশদ জবাব দেয়া সম্ভব নয় কারণ এটা নিয়ে এখনো অনেক কাজ, অনেক ভাবনা-চিন্তার প্রয়োজন আছে। তবে দুই-একটা কথা বলা যেতে পারে। কিন্তু তার আগে আমার প্রথম

মন্তব্যের সম্বন্ধে বলি। সমাজ বিজ্ঞানের কাজ যা ঘটে গেছে তার ব্যাখ্যা করা এবং কোনো কোনো সময় তার থেকে এক পা এগিয়ে ভবিষ্যতে কী হতে পারে সেটা বলে দেয়া। সমাজ বিজ্ঞান কখনো দার্শনিক অর্থে সমালোচনা – critique – করতে পারে না। সেই কাজটা করে দর্শন (philosophy) কিংবা critical theory। কেবল ব্যাখ্যার মাধ্যমে নতুন কিছু সৃষ্টি করা যায় না – নতুনভাবে ভাবতে হলে, নতুন প্রশ্ন তুলতে হলে, নতুন পথ বার করতে হলে আমাদের দর্শনের শরণে যেতে হয়। ঠিক সেই ভাবেই কেবল প্রতিবাদের মধ্য থেকে নতুন কিছু সৃষ্টি করা যায় না – সে ইস্যুভিত্তিকই হোক আর বড় আকারের রাজনৈতিক প্রতিবাদই হোক। রাজনীতি সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত। রাজনীতি নিয়ে সমাজ বিজ্ঞানীর মতো কিংবা এক্টিভিস্টদের মতো ভাবতে গেলে একথা অস্বীকার করা যায় না যে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান রাজনীতির মধ্যে বা তার মাধ্যমেই খুঁজতে হবে। আমার প্রশ্নটা অন্য জায়গা থেকে আসছে। আসলে দেখতে গেলে আধুনিক যুগের যে কোনো সমস্যা নিয়ে ভাবতে শুরু করলে আমরা দেখব যে প্রত্যেকটার মূলে আছে রাজনীতি। উপনিবেশবাদ কি শুধু অর্থনৈতিক লেনদেনের ব্যাপার ছিল? ফ্যাসিবাদ? আমি এই দুটির উল্লেখ শুধু দৃষ্টান্ত হিসেবে করছি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এটা আমরা হরদম দেখি যে যত দাঙ্গা-ফ্যাসাদ বাঁধানো হয়, রাজনৈতিক দলগুলোই নিজেরা বাঁধায় বা কলকাঠি নাড়ে। কাজেই এক নম্বর প্রশ্ন হলো এই দলগুলো নিয়ে। দলগুলোকে বাদ দিয়ে কি রাজনীতির কথা ভাবা যেতে পারে? পৃথিবী জুড়ে আজ সমস্ত দেশের গণ-অভ্যুত্থানগুলোতে রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে এই আওয়াজ সজোরে উঠছে – এক এক করে নাম নেয়ার নিশ্চয়ই প্রয়োজন নেই। একদিক থেকে বলতে গেলে আমার মনে হয় যে এই সব আন্দোলন একটা নতুন পথ খুঁজছে – পার্টিগুলোকে বাদ দিয়ে রাজনীতি করতে পারার পথ। ট্র্যাজেডিটা এই যে নির্বাচনের সময়ে আবার এসব পার্টিকেই ভোট দিতে হয়। আমার মনে হয় প্রাথমিক ধাপের কাজ এরকম একটা রাস্তা বার করা। কিন্তু এতে সমস্যার সমাধান হবে বলে আমার মনে হয় না। আজকে আমাদের জীবনের প্রতিটি সিদ্ধান্ত আমাদের হাত থেকে বেরিয়ে চলে গেছে রাষ্ট্রের হাতে। আগেকার দিনে, এমনকি আমাদের মতো দেশে আমার মা-বাবার সময়েও তারা মোটামুটি তাদের জীবনের অনেক সিদ্ধান্তই নিজেরা নিতে পারতেন। কার্যত বলতে গেলে, ক্রমশ আমরা আমাদের অটনমি

হারাচ্ছি। আমি আগেও বলেছি পুঁজিবাদ কেবলই অর্থনৈতিক বিষয় নয়— রাষ্ট্রের মারফতই সে পুঁজির একচেটিয়া আধিপত্য কায়েম করে। সে অর্থে রাজনীতির নাগপাশ থেকে মুক্তির ব্যাপারটা জড়িয়ে আছে আমাদের স্বায়ত্ততার প্রশ্নের সঙ্গে, অর্থাৎ এমন এক ব্যবস্থা তৈরি করা যেখানে লোকাল অটনমির ভিত্তিতে লোকে তাদের জীবনের অধিকাংশ সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। এই জন্য আজ চারিদিকে বিংশ শতাব্দীর সমাজতন্ত্রের কথা না বলে আন্দোলনগুলো এবং চিন্তাবিদরা commons, common property ইত্যাদির কথাটা তুলছেন। এমনই একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে – যেটাকে আমরা একটা নতুন এপিস্টেম বলতে পারি – সেটা উঠে আসবে। এটা অবশ্য ভবিষ্যতের কথা।

টীকা:

১) এখানে আদিত্য নিগম বলছেন, "শাহিদ আমিন, জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে, জ্ঞান প্রকাশ এঁরা বাঙালি নন আর নকশালও ছিলেন না।" শাহিদ আমিন, জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে ও জ্ঞান প্রকাশ তিনজনই সাবলটার্ন স্টাডিজের সভ্য ছিলেন। এটা ঠিক যে তাঁরা কেউই বাঙালি নন। কিন্তু এটা হলফ করে বলা যায় না যে সত্তরের দশকে তাঁরা 'নকশালী' ছিলেন না। জ্ঞান প্রকাশের ব্যাপারটা নিশ্চিত না হলেও, জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে ও শাহিদ আমিন যে সত্তরের দশকে নকশালপন্থী ছিলেন এতে কোনো সন্দেহ নেই। সাবলটার্ন স্টাডিজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দুইজন সদস্য, বিখ্যাত ইতিহাসবিদ দীপেশ চক্রবর্তী ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের লেখাপত্র ও আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে ও শাহিদ আমিন সেই সময়ে নকশালপন্থীই ছিলেন। এবং তাঁদের দুইজনের সাথে আলাপ-পরিচয়ের পরই রণজিৎ গুহ তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু পরিবর্তন করেন।

এ বিষয়ে দীপেশ চক্রবর্তী ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় কী বলছেন দেখা যাক। প্রথমে এ বিষয়ে দীপেশ চক্রবর্তীর বক্তব্য পরখ করা যাক। ২০২০ সালে 'Interdisciplinary Knowledge Initiatives' এর আয়োজনে ইতিহাসবিদ দীপেশ চক্রবর্তীর সঙ্গে কথাসাহিত্যিক শাহাদুজ্জামানের একটি ভার্চুয়াল আলাপচারিতা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাটি ইউটিউবের এই লিংক থেকে দেখা ও শোনা যাবে: https://youtu.be/qSleqprg7MM

এই আলোচনায় শাহাদুজ্জামান দীপেশ চক্রবর্তীকে রণজিৎ গুহ-র ইংল্যান্ড থেকে ইন্ডিয়ায় আসা এবং সাবলটার্ন স্টাডিজের শুরু হওয়ার প্রেক্ষাপট জানতে চেয়ে প্রশ্ন

করেন। দীপেশ চক্রবর্তীর হুবুহু জবানে প্রেক্ষাপটটা জানা যাক:

"রণজিৎ-দা তখন সাসেক্সে পড়ান এবং তিনি ১৯৭০ সালে দিল্লিতে আসেন। ১৯৭০ সালে নকশাল আন্দোলনের একটা চূড়ান্ত অবস্থা চলছিল। তখন রণজিৎদা পাবলিশারের কাছ থেকে আগাম পয়সা নিয়ে এক বছরের জন্য গান্ধীর ওপর বই লিখতে দিল্লিতে আসেন। নন-ভায়োলেন্স নিয়ে বই লিখবেন ঠিক করে আসেন। কিন্তু দিল্লিতে এসে যেসব তরুণ ইতিহাসের ছাত্ররা তখন নকশালী হয়েছিল – তাদের মধ্যে দুইজন ছিল জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে ও শাহিদ আমিন, যারা পরে সাবলটার্ন স্টাডিজের সভ্য হয় – তাঁদের সঙ্গে রণজিৎ-দা'র খুব বন্ধুত্ব হয়ে যায়। এবং উনি তখন এই নকশাল আন্দোলনে মনে মনে এতটাই জড়িয়ে যান যে পাবলিশারকে ওই পয়সা ফেরত দিয়ে দেন। বলেন যে আমি নন-ভায়োলেন্স নিয়ে লিখব না, ভায়োলেন্স নিয়ে লিখব। এবং কৃষক-আন্দোলন বা কৃষক বিদ্রোহের যে হিংসা, সেই ভায়োলেন্স। সেটাই কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর পেজেন্ট ইন্সার্জেন্সি নিয়ে বই হয়ে দাঁড়াল। যেটা ১৩ বছর বাদে ১৯৮৩ সালে বের হলো – *Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India*।" (আলোচনার ১৬ মিনিট ৩০ সেকেন্ড থেকে ১৭ মিনিট ৫০ সেকেন্ড পর্যন্ত)।

এবারে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য দেখা যাক। পার্থ চট্টোপাধ্যায় রণজিৎ গুহ-র বাংলায় প্রকাশিত রচনাসংগ্রহের প্রথম খণ্ডের ভূমিকা লিখেছেন। সেই ভূমিকায় তিনি লিখেছেন:

"আ রুল অফ প্রপার্টি লেখার পর রণজিৎ গুহ প্রায় বিশ বছর ইংল্যান্ডের সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে যুক্ত ছিলেন। এসময় তিনি কোনো গবেষণা প্রবন্ধ বা গ্রন্থ প্রকাশ করেননি। এমনকি, গবেষকদের কোনো সম্মেলন বা আলোচনাসভাতেও তিনি বড় একটা যেতেন না। বলা যায়, পেশাদার ঐতিহাসিক মহল থেকে তিনি এক রকম স্বেচ্ছানির্বাসন নিয়েছিলেন। ১৯৭০-৭১ সালে তিনি এক বছরের জন্য ভারতবর্ষে আসেন। উদ্দেশ্য ছিল, গান্ধী-পরিচালিত গণ-আন্দোলনের স্বরূপ সন্ধান। কিন্তু তৎকালীন নকশাল আন্দোলনের খবরাখবর সংগ্রহ করে এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের নকশালপন্থী ছাত্রদের সংস্পর্শে এসে তিনি তাঁর গবেষণার বিষয় পাল্টে ফেললেন। তখন থেকে তাঁর নজর গিয়ে পড়ল ভারতে কৃষকবিদ্রোহের ইতিহাসের দিকে। তারই ফসল ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত বই *দি এলিমেন্টারি আস্পেক্টস অফ পেজান্ট ইনসার্জেন্সি ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া*।" (রণজিৎ ২০১৯)

রণজিৎ গুহ দিল্লিতে এসে যে সকল নকশালপন্থী ছাত্রদের 'সংস্পর্শে' এসেছিলেন বলে পার্থ চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন, তাঁরা কারা? নকশাল-প্রভাবিত যে ছাত্রদের

সঙ্গে রণজিৎ গুহ-র আলাপ হয়, তাদের মধ্যে শাহিদ আমিন আর জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে ছিলেন। ঐ দলের কয়েকজন, যেমন দিলীপ সিমিয়ন, রবীন্দ্র রায়, অরবিন্দ দাস, বিপ্লবে যোগ দেয়ার লক্ষ্যে বিহারের গ্রামে চলে যান। শাহিদ আমিন বা জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে যাননি। এই তথ্য আমি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে জানতে পারি। এখানে শাহিদ আমিন ও জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে ছাড়াও আর কাদের সাথে রণজিৎ গুহ-র সাক্ষাৎ হয়েছিল সেই নামগুলো জানা যাচ্ছে। ফলে এই তথ্যের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে।

সুতরাং, শেষ পর্যন্ত 'বিপ্লব' করতে গ্রামে না গেলেও, শাহিদ আমিন ও জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে যে সেই দিনগুলোতে নকশালপন্থী ছিলেন এতে কোনো সন্দেহ নেই।

২) 'চক্রবর্তী' রাজার উল্লেখ আমরা পাই মূলত বৌদ্ধ টেক্সটগুলোতে, একজন 'সার্বভৌম' ধর্মপরায়ণ রাজা হিসেবে। এখানে 'ধর্ম' বা পালির 'ধম্ম' কিন্তু religion নয়; বরং righteous conduct এর অর্থে ব্যবহার করা হতো। পরবর্তীকালে কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র* গ্রন্থটিতে 'বিজিগীষু' সম্রাটের কথা বলা হয়। অনেক বিদ্বান এই দুইয়ের মধ্যে একটা যোগ বা সম্পর্কও দেখেন। সম্পর্ক থাকুক আর নাই থাকুক, একটা কথা পরিষ্কার উঠে আসে এবং সেটা হলো এই যে, এটা একটা আদর্শ কিংবা লক্ষ্য হিসেবে দেখা হয়, কোনো বাস্তব অবস্থার বিবরণ হিসেবে নয়। সে অর্থে এটা ইউরোপের 'sovereignty' ধারণার সমতুল্য নয় যেটা রাজনৈতিক ক্ষমতার একটা বাস্তব রূপ ছিল।

৩) পেরোনিজম, যাকে ন্যায়বাদও (Justicialism) বলা হয়, আর্জেন্টিনার শাসক জুয়ান পেরনের (১৮৯৫-১৯৭৪) ধারণা ও পরম্পরার ওপর ভিত্তি করে বিকশিত হওয়া একটি রাজনৈতিক আন্দোলন। এটি বিশ ও একুশ শতকের আর্জেন্টিনার রাজনীতিতে একটি প্রভাবশালী আন্দোলন। ১৯৪৬ সাল থেকে, পেরোনিস্টরা ১৩টি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মধ্যে ১০টিতে জয়লাভ করে। জাস্টিশিয়ালিস্ট পার্টি (Justicialist Party) পেরোনিস্ট ধারার প্রধান পার্টিগুলোর মধ্যে একটি। পেরোনিস্টদের মধ্যে যারা রাষ্ট্রপতি হয়েছেন, তারা নীতিগতভাবে ব্যাপক বৈচিত্র্যপূর্ণ, কিন্তু তাদের সাধারণ আদর্শকে জাতীয়তাবাদ ও শ্রমবাদের (Labourism) তথা পপুলিজমের একটি অস্পষ্ট মিশ্রণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়।

রেফারেন্স:

কল্যাণ সান্যাল(২০১১): 'পুঁজিবাদী উন্নয়ন সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা', *সাত সতেরো*, অনুষ্টুপ, কলকাতা

পার্থ চট্টোপাধ্যায় (২০২১খ): "গণতন্ত্র ও জনবাদ", *রাষ্ট্রচিন্তা*, সম্পাদক হাবিবুর রহমান, বর্ষ: ৬, সংখ্যা:১

রণজিৎ গুহ (২০১৯): *রচনাসংগ্রহ: ইতিহাস-সমাজ-রাজনীতি* (প্রথম খণ্ড), ভূমিকা: পার্থ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

সারোয়ার তুষার (২০২২): 'পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার: সমাজনীতি অঙ্ক বা ব্যাকরণের মতো নয়, যা বিশুদ্ধ যুক্তির সাহায্যে আবিষ্কার করে রাষ্ট্রের আইনের মাধ্যমে জারি করা যায়', *তত্ত্বতালাশ: চিন্তামূলক প্রবন্ধের কাগজ*, তৃতীয় সংখ্যা, (জানুয়ারি ২০২২), পৃ: ৯-৩৮, সম্পাদক: মোহাম্মদ আজম

সারোয়ার তুষার (২০২১): "তত্ত্ব করা'র মানে সবার আগে আমাদের নিজেদের ইতিহাসকে তত্ত্বের দিক থেকে বোঝা"; আদিত্য নিগমের সাক্ষাতকার; *অরাজ*।

Althusser, Louis (2006): *The Philosophy of the Encounter: Later Writings*, 1978- 1987. London and New York: Verso.

Althusser, Louis and Etienne Balibar (1977): *Reading Capital*, London: NLB

Banerjee, Prathama; Nigam, Aditya and Pandey, Rakesh (2016): "The Work of Theory: Thinking across Traditions", *Economic & Political Weekly*, Vol LI, NO 37, pp 42-50

Banaji, Jairus (2013): *Theory as History: Essays on Modes of Production and Exploitation*, Delhi: Aakar Books

Chatterjee, Partha (2008): 'Democracy and Economic Transformation', *Economic and Political Weekly*, Vol.43, No.16, pp. 53-62

Kaviraj, Sudipta (2021): "On Decolonizing Theory", *Kairos: A Journal of Critical Symposium*, Vol.6 No.1

Laclau, Ernesto (1977): 'Towards a Theory of Populism', *Politics and Ideology in Marxist Theory*, Verso, London.

— (2006): *On Populist Reason*, Verso, London.

Mouffe, Chantal (2018): *For A Left Populism*, Verso, London.

Nigam, Aditya (2008): "The Implosion of 'the Political'", published in the *Journal of Contemporary Thought*, No 27, Summer 2008

— (2011): *Desire Named Development*, Penguin Books, India

— (2014): '"Molecular Economies": Is there an Outside to Capital?', in *Critical Studies in Politics: Exploring Sites, Selves, Power*, edited by Nivedita Menon, Aditya Nigam, Sanjay Palshikar, Hyderabad: IIAS Shimla and Orient Blackswan.

— (2016): "Violence and Political", in *Violence Studies (Oxford India Studies in Contemporary Society)*, edited by Kalpana Kannabiran, Oxford University Press

— (2020c): "FASCISM, THE REVOLT OF THE 'LITTLE MAN' AND LIFE AFTER CAPITALISM - MANIFESTO OF HOPE III", 23 April, *Kaflia.online*

— (2020d): "BEYOND THE 'EMPLOYMENT' PARADIGM AND LIFE AFTER CAPITALISM - MANIFESTO OF HOPE IV", 07 May, *Kaflia.online*

— (2020e): *Decolonizing Theory: Thinking Across Traditions*, New Delhi: Bloomsbury India

— (2021a): "'JOBLESSNESS' IN THE POST-EMPLOYMENT WORLD - URGENT NEED FOR PARADIGM CHANGE", 24 June, *Kaflia.online*

— (2021b): "DECOLONIZING THOUGHT - BEYOND INDIAN/ HINDU EXCEPTIONALISM", 11 September, *Kaflia.online*

— (2021c): "Mass Politics and 'Populism' in the World of Indian Languages", *Kaflia.online*

— (2022): "PERU, HONDURAS, CHILE AND CHALLENGES BEFORE THE LATIN AMERICAN NEW LEFT", 8 January, *Kaflia.online*

Polanyi, Karl (2001 [1944]): *The Great Transformation*, Boston: Beacon Press, second edition

Poulantzas, Nicos (1978): *State, Power, Socialism*, London: New Left Books

Sanyal, Kalyan (2007): *Rethinking Capitalist Development: Primitive Accumulation, Governmentality and Post-Colonial Capitalism*, Routledge, New Delhi

Sanyal, Kalyan; Chatterjee Partha (2016): 'Rethinking Postcolonial Capitalist Development, A conversation between Kalyan Sanyal and Partha Chatterjee', translated from Bengali by Partha Chatterjee, *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East*, Duke University Press, Durham

Zuboff, Shoshana (2019): *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*, PublicAffairs; 1st edition.

ঔপনিবেশিকতা ও আধুনিকতা/যৌক্তিকতা[১]

মূল: আনিবাল কিহানো

অনুবাদ: মনিরুল ইসলাম

অনুবাদকের কথা

উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়া পর্যালোচনার ক্ষেত্রে কিহানোর (Aníbal Quijano) ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। রাজনীতিকভাবে ঔপনিবেশিক পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটলেও ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা-যে ঠিকই কার্যকর থাকে অপরাপর তাত্ত্বিকদের এই প্রস্তাবনার সঙ্গে কিহানো একমত পোষণ করলেও এর জন্য তিনি মনোজগতে আশ্রয় নেওয়া ঔপনিবেশিক মস্ত্রকে দায়ী করেন না। এই প্রশ্নে আরও সুবিন্যস্ত জবাব তার আছে। তিনি বলেন ঔপনিবেশিকতার কথা। এই কথা বলার সময় 'ঔপনিবেশিকতা' প্রত্যয়টিকে তিনি উপনিবেশবাদ থেকে আলাদা করে নেন। তার ভাবনায়, উপনিবেশবাদ নির্দেশ করে এক-ধরনের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সম্পর্ক যেখানে একটি দেশের সার্বভৌম ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে অপর আরেকটি কর্তৃত্ববাদী দেশের ওপর যা কর্তৃত্বপরায়ণ দেশটিকে একটি সাম্রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলে। অন্যদিকে, ঔপনিবেশিকতা হলো উপনিবেশায়নের ফলে সৃষ্ট দীর্ঘস্থায়ী এক ক্ষমতাবিন্যাস যা ঔপনিবেশিক প্রশাসনের আওতা বহির্ভূত সংস্কৃতি, শ্রম, আন্তঃবিষয়ী সম্পর্ক ও জ্ঞানোৎপাদনকে সংজ্ঞায়িত করে। এই দুইয়ের সম্পর্ক হলো—উপনিবেশবাদকে টিকিয়ে রাখে ঔপনিবেশিকতা। এবং এটি সুপ্ত থাকে বই-পুস্তকে, বিদ্যায়তনিক তৎপরতায়, সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিতে, প্রাত্যহিক বোঝাপড়ায়, সাধারণের আত্ম-ভাবনায়, আত্মবোধের উচ্চাকাঙ্ক্ষায় ও অন্যান্য আধুনিক যাপনাভিজ্ঞতায়। অর্থাৎ, আধুনিক বিষয়ী হিসেবে আমরা যেন প্রতিদিন ও প্রতিটি মুহূর্ত ঔপনিবেশিকতার মধ্যেই দম নিই। ফলে, ঔপনিবেশিকতা কোনো ঔপনিবেশিক সম্পর্কের সরল পরিণতি বা অবশিষ্ট নয়। তার নির্মাণ ও প্রভাবশালী হয়ে ওঠার নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিত ও সমাজৈতিহাসিক বৃত্তান্ত রয়েছে (Maldonado- Torres, 2010 : 97)।

কিহানো লক্ষ করেছেন-যে আমেরিকা দখলের আগেকার আমলের উপনিবেশবাদ কোনো বৈশ্বিক শক্তির ভিত্তিপ্রস্তরস্বরূপ ছিল না। সেইক্ষেত্রে, আমেরিকার উপনিবেশায়ন ছিল ব্যতিক্রম—তা নির্মাণ করেছে নতুন ধরনের এক ক্ষমতা কাঠামো। এবং বিশেষ এই ক্ষমতাসম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়োজনে পৃথিবীর মানুষ সংজ্ঞায়িত হয়েছে বর্ণবাদী মানদণ্ডে; 'পুঁজিবাদ' শিরোনামে পুনর্বিন্যাসিত হয়েছে গোটা দুনিয়ার শ্রমপরিসর; জ্ঞানোৎপাদনের ক্ষেত্রে সূচিত হয়েছে বিষয়ী-বিষয় নির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি। অর্থাৎ, গড়ে উঠেছে ঔপনিবেশিকতা। তিনি এর নাম দেন—ক্ষমতার ঔপনিবেশিকতা। ক্ষমতার ঔপনিবেশিকতায় ইউরোকেন্দ্রিক যুক্তির আশ্রয়ে গড়ে ওঠে বিশেষ কিসিমের যৌক্তিকতাও—যা আপনকার প্রাদেশিক ও ঔপনিবেশিক চরিত্র গোপন করে আধুনিকতা ও প্রগতিশীলতার ঝাণ্ডা উড়িয়ে হাজির হয়েছে সর্বজনীন রূপে। ইউরোপীয় ভূখণ্ডের অভিজ্ঞতা ও ইউরোপীয় জ্ঞানতত্ত্বে উৎপাদিত জ্ঞান যেখানে পেশ করা হয়েছে গোটা পৃথিবীর অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বলে। যার দরুন, ইউরোকেন্দ্রিক জ্ঞানতত্ত্ব হয়ে ওঠে এক ও অদ্বিতীয়। যে জ্ঞানতত্ত্বের অন্তর্গত ঔপনিবেশিকতা আড়াল হয়েছে আধুনিকতার বয়ান দিয়ে। কিহানোর এই সূত্র ধরেই কিহানো-প্রভাবিত লাতিন আমেরিকার অপরাপর তাত্ত্বিকেরা আধুনিকতা ও ঔপনিবেশিকতাকে প্রতিপন্ন করেন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। গঠনগতভাবেই যার একটি আড়াল করে অপরটিকে। আধুনিকতা তাদের ভাবনায় ঔপনিবেশিকতারই নামান্তর। মাঝখানে স্ল্যাশ ব্যবহার করে এই দুইটিকে তারা বিজড়িত করে তোলেন। লেখেন—আধুনিকতা/ ঔপনিবেশিকতা (Mignolo, 2018 : 141)। গড়ে তোলেন 'আধুনিকতা/ ঔপনিবেশিকতা গবেষণা প্রকল্প'। কিহানো এই ঔপনিবেশিকতাকে নস্যাৎ করতে বি-উপনিবেশায়ন হিসেবে প্রস্তাব করেন জ্ঞানতাত্ত্বিক পুনর্গঠন, যা ইউরোপীয় সর্বজনীনতার দাবির পরিবর্তে প্রস্তাব করে কতিপয় সর্বজনীনতা, যা ইউরোপীয় জ্ঞানতত্ত্বের জবরদস্তির ফলে চাপা-পড়া অপরাপর জ্ঞানতত্ত্বের আবির্ভাবকে স্বাগত জানায়; ইউরোকেন্দ্রিক যৌক্তিকতা নয়—যা প্রস্তাব করে ভিন্ন ধরনের যৌক্তিকতা।

কিহানোর বিদ্যাবত্তাকে (Scholarship) মোটামুটি তিনটি পর্বে বেশ ভালো মতো ব্যাখ্যা করা যায়। প্রতিটি পর্বই যেখানে নির্ভরশীলতার ব্যাপক ধারণাটিকে পাঁক খেয়ে বিকশিত হয়েছে যা রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বোঝাপড়া থেকে তাকে পৌঁছে দেয় সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক বিবেচনায়। ষাট ও সত্তর দশকের নির্ভরশীলতা তত্ত্ব (dependency theory), আশির দশকের আধুনিকতা, ইতিহাসতত্ত্ব, সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয় বিতর্ক এবং নব্বই দশক ও এখনকার বি-উপনিবেশিক তত্ত্বে কিহানোর মৌলিক অবদান রয়েছে।[২] উপনিবেশবাদকে তিনি দুর্দান্ত দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। যার ফলে, কেবল লাতিন আমেরিকা নয়, উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্ব ও

বি-উপনিবেশিক অধ্যয়নেই তার প্রভাব তৈরি হয়েছে। অবশ্য একইসঙ্গে, কতগুলো ক্ষেত্রে তার চিন্তা পুনর্মূল্যায়নেরও দাবি রাখে—বিশেষ করে বাংলাদেশের বিউপনিবেশায়ন তত্ত্বের জায়গা থেকে। প্রথমত, কিহানোর চিন্তায় ক্ষমতার ঔপনিবেশিকতা সর্বজনীন ছেদক রূপে হাজির হয়। অর্থাৎ, তা সমাজের সকল সম্পর্ককেই যেন ছেদ করে যায়। মিগনোলো যাকে টেনে 'ক্ষমতাতন্ত্রের ঔপনিবেশিক ছাঁচ' পর্যন্ত প্রসারিত করেছেন (Mignolo, 2018 : 142)। এখন তাই যদি হয়, ক্ষমতার ঔপনিবেশিকতা তাহলে তো কিহানোর চিন্তাকেও ছেদ করে গিয়েছে। ফলে, কোন চিন্তাকাঠামোয় দাঁড়িয়ে তিনি ইউরোপীয় যৌক্তিক চিন্তাকাঠামোর বিকল্প প্রস্তাব করেছেন? আর ঔপনিবেশিকতা যদি সর্বজনীন ছেদক না-ই হয়ে থাকে, অর্থাৎ কিছু সম্পর্ককে তা যদি ছেদ করতে না পারে, নিজেই যদি সকল ক্ষেত্রে টিকে থাকতে না পারে, উপনিবেশবাদকেই বা তা টিকিয়ে রাখবে কীভাবে? ঔপনিবেশিকতা কি তাহলে গোটা সমাজে কার্যকর নয়? দ্বিতীয়ত, তার আলোচনায় ঔপনিবেশিকতা বৈশিষ্ট্যগতভাবে অপরিবর্তনীয় রূপে সংজ্ঞায়িত। কিন্তু মানুষের সমাজ তো প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। ফলে, রূপান্তরশীল সমাজের ক্ষেত্রে ক্ষমতার ঔপনিবেশিকতার নিয়ত পরিবর্তনশীলতা তাহলে কীভাবে ব্যাখ্যা করা হবে? তৃতীয়ত, ঔপনিবেশিকতাকে যদি বি-উপনিবেশিকতা দিয়ে নস্যাৎ করতে হয়, তাহলে কিহানোর চিন্তা তো ইউরোপীয় বৈপরীত্য জোড় অতিক্রম করতে পারল না। অথবা তিনি যদি ইউরোকেন্দ্রিক সর্বজনীনতার বিকল্প হিসেবে, সহনশীল কায়দায়, কেবল কতিপয় সর্বজনীনতার প্রস্তাব করেই ক্ষান্ত দেন, সেক্ষেত্রেও তাহলে ইউরোপীয় বিনির্মাণ তত্ত্বের চৌহদ্দি তিনি পেরোলেন কই? আসলে প্রশ্নগুলো কেবল কিহানোকে সমালোচনা করার জন্যই নয়; বরং ভালো মতো তাকে পাঠ করার জন্যই। উদ্দেশ্য—বি-উপনিবেশায়ন তত্ত্বে তার অবস্থানকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা। এরচেয়েও বড় কথা, তার ভাবনাকে আশ্রয় করে বাংলাদেশের বিউপনিবেশায়ন তত্ত্ব সম্পর্কেই নানান মাত্রায় চিন্তা করা।

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর পেরুর ইয়াঙ্গে (Yungay) প্রদেশের ইয়ানামা (Yungay) জেলায় কিহানোর জন্ম। পেরুর ন্যাশনাল *ইউনিভার্সিটি অব স্যান মার্কুস* (National University of San Marcos) থেকে—১৯৬৪ সালে—তিনি পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত সেখানেই সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের সিনিয়র লেকচারার পদে আসীন ছিলেন। অতি সম্প্রতি নিউ ইয়র্কের *বিংহামটন ইউনিভার্সিটির* (Binghamton University) সমাজবিদ্যার অধ্যাপক হয়েছিলেন। এছাড়া সমাজবিজ্ঞানের অতিথি অধ্যাপক হিসেবে দুনিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন, প্যারিসের *মিজোঁ দে সায়েন্সেস দু লোম্মা* (Maison des Sciences de l'Homme), *ইউনিভার্সিটি অব সাও পাউলো*, *ইউনিভার্সিটি অব*

পুয়ের্তো রিকো, *ইউনিভার্সিটি অব হ্যানোভার*, *ফ্রি ইউনিভার্সিটি অব বার্লিন*, *ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব ইকুয়েডর*, *ন্যাশনাল অটোনমাস ইউনিভার্সিটি অব মেক্সিকো*, *উনিব্যারসিদাদ দে চিলি* (Universidad de Chile), *লাতিন আমেরিকান স্কুল অব ইকোনমিক্স* ও *জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটিতে* তিনি অধ্যাপনা করেছেন।[৩] তার প্রথম দিককার চিন্তায় কেউ কেউ উদারনৈতিক ধারার তাত্ত্বিক হোসে মেদিনা এচাবারিয়া (José Medina Echavarría) ও মার্কসীয় তাত্ত্বিক হোসে কার্লোস মারিআতেগির (José Carlos Mariátegui) প্রভাব লক্ষ করেছেন (Gandarilla, García-Bravo & Benzi, 2021 : 204)।[৪] তার গুরুত্বপূর্ণ রচনাসমূহের মধ্যে রয়েছে : 'Paradoxes of Modernity in Latin America' (1989), 'Coloniality and Modernity/Rationality' (1991), 'Americanity as a Concept, or the Americas in the Modern World-System' (1992), 'Modernity, Identity and Utopia in Latin America' (1993), 'Coloniality of Power, Eurocentrism and Latin America' (2000), 'Questioning "Race"' (2007)। লাতিন আমেরিকার বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের অন্যতম প্রভাবশালী এই তাত্ত্বিক কয়েক বৎসর আগে—২০১৮ সালের ৩১ মে—পেরুর রাজধানী লিমায় (Lima) মৃত্যুবরণ করেন।

অনূদিত এই বাংলা প্রবন্ধটি সোনিয়া থেরবর্নকৃত (Sonia Therborn) অনুবাদের অনুবাদ হলেও *Perú Indígena*-সংস্করণটিও এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে।[৫] এই সুবাদে বলে ফেলা যায়, মূল পেরু-সংস্করণের সঙ্গে কিন্তু থেরবর্ন অনূদিত *Cultural Studies* পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধটির[৬] বেশ কিছু জায়গায় ভিন্নতা আছে। কোথাও কোথাও রয়েছে বাক্যাংশের অমিল বা অনুপস্থিতি। যেমন ''জনগোষ্ঠী' (Race) ও ক্ষমতার ঔপনিবেশিকতা' নামের পরিচ্ছেদটিই পেরু-সংস্করণে নেই—যা থেরবর্নের অনূদিত প্রবন্ধে রয়েছে। তবে দুইয়ের এই ভিন্নতাটুকু মূল প্রবন্ধের সঙ্গে অনূদিত প্রবন্ধটির ভাবগত কোনো সংঘর্ষ তৈরি করে না। এইসব ক্ষেত্রে থেরবর্নের ইংরেজি অনুবাদটিকে মূলত আশ্রয় করলেও *Perú Indígena*-র মূল রচনাটির ভিত্তিতেও কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে—অবশ্য তা খুবই সামান্য। স্প্যানিশ না-জেনেও উন্নত সফটওয়্যারের বদৌলতেই কেবল তা সম্ভব হয়েছে। এবং ভাবানুবাদ নয়—মূল পাঠের অনুগামী থাকার সর্বোচ্চ চেষ্টা ব্যয় হয়েছে এখানে। তবু অসতর্কতাবশত তুচ্ছ ভুলের জন্য আগাম ক্ষমাপ্রার্থী, ভবিষ্যতে যা সংশোধনের প্রয়াস অব্যাহত থাকবে। বলে রাখা ভালো, পাঠককে আশ্বস্ত করার অভিপ্রায় থেকেই কেবল ইংরেজি শব্দগুলোকে প্রয়োজনানুযায়ী বন্ধনীর মধ্যে পুরে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও তৃতীয় বন্ধনীর ভেতরে জুড়ে দেওয়া হয়েছে কিছু কথা।

এতে করে, চেহারার বিচারে অনুবাদটি তার সৌন্দর্য খোয়ালেও পাঠের কার্যকারিতা কিছুটা বৃদ্ধি পাবে এই আশা অন্তত করা যায়।

মূল প্রবন্ধ

যে ভূখণ্ডটাকে আমরা এখন লাতিন আমেরিকা নামে চিনি, একসময় এই এলাকাটির সমাজ ও সংস্কৃতিকে জবরদখল করার মাধ্যমে নতুন এক বিশ্বব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়েছিল, যা তার সর্বোচ্চ পরিণতিতে গিয়ে পৌঁছায় তারও ৫০০ বছর পর, যখন একটি বিশ্বশক্তি পুরো পৃথিবীটাকেই গ্রাস করে ফেলেছে। এই প্রক্রিয়ায় ইউরোপের ক্ষুদ্র একটি অংশের তত্ত্বাবধানে ও ফায়দার জন্য—সর্বোপরি এর শাসকগোষ্ঠীগুলোর স্বার্থে—পৃথিবীর সম্পদরাশির প্রতি এক আগ্রাসী মনোভাবের জন্ম হয়েছিল। যদিও নিপীড়িত অধিবাসীদের প্রতিরোধের ফলে কখনো-সখনো এই ব্যবস্থা পরিমার্জিত হয়েছে, তবুও তা এগিয়ে চলেছে অব্যাহত গতিতেই। কিন্তু এখন, সংকটের এই বর্তমান কালে, এই মনোভাব বাস্তবায়িত হচ্ছে নিত্যনতুন সংবেগে (impetus)—খুব সম্ভব অধিকতর আগ্রাসী উপায়ে ও আরও বিস্তৃত বৈশ্বিক পরিসরে। 'পশ্চিম' ইউরোপীয় আধিপত্যবাদীরা (dominators) ও তাদের ইউরো-নর্থ আমেরিকান বংশধরগণ এখনো প্রধান সুবিধাভোগী, সেইসঙ্গে [যুক্ত হয়েছে] প্রাক্তন ইউরোপীয় উপনিবেশগুলো ব্যতীত বিশ্বের অ-ইউরোপীয় অংশ, প্রধানত জাপান, বিশেষত তার শাসকগোষ্ঠী। লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকার শোষিত ও নিপীড়িতরাই প্রধান শিকার।

সবগুলো মহাদেশেই বিজিতদের সঙ্গে ইউরোপীয়দের দ্বারা সরাসরি, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এক আধিপত্যের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। আধিপত্যের এই সম্পর্কই সুনির্দিষ্টভাবে ইউরোকেন্দ্রিক উপনিবেশবাদ নামে পরিচিত। রাজনৈতিকভাবে, বিশেষত আনুষ্ঠানিক ও প্রকাশ্য চেহারায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ঔপনিবেশিক আধিপত্যের হার হয়েছে। আমেরিকা ছিল সেই পরাজয়ের পয়লা দৃশ্য। পরবর্তীকালে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, [যুক্ত হয়] আফ্রিকা ও এশিয়া। এভাবে, কতিপয় পশ্চিম ইউরোপীয় সমাজ কর্তৃক অপরের ওপর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ফলানোর আনুষ্ঠানিক কায়দা স্বরূপ যে ইউরোকেন্দ্রিক উপনিবেশবাদ তা এক অতীত প্রসঙ্গ [হয়ে যায়]। তারই উত্তরসূরি পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ, বাইরে থেকে [দাদাগিরি] আরোপণের পরিবর্তে, ক্ষমতায় অসমভাবে সন্নিবিষ্ট দেশগুলোরই

প্রভাবশালী (dominant) দলসমূহের ('সামাজিক শ্রেণি' বা 'গোষ্ঠী') মধ্যকার সামাজিক স্বার্থের একটি সংস্থা।

যাইহোক, ঔপনিবেশিক সেই নির্দিষ্ট ক্ষমতাকাঠামোই সুনির্দিষ্ট-সব সামাজিক বৈষম্যের জন্ম দিয়েছিল যা পরবর্তীকালে—সময়, বাহক (agent) ও অধিবাসীদের সংশ্লিষ্টতা সাপেক্ষে—'জাতিগত' (racial), 'গোষ্ঠীগত' (ethnic), 'নৃ-তাত্ত্বিক' (anthropological) ও 'জাতীয়' (national) হিসেবে [বর্গে] গ্রথিত (codified) হয়। এইসব আন্তঃবিষয়ী (intersubjective) নির্মাণসমূহ, ইউরোকেন্দ্রিক আধিপত্যের ফসলরাজি, ইতিহাস সাপেক্ষ অর্থের (historical significance) বদলে এমনকি গণ্য হয়েছে 'নৈর্ব্যক্তিক' (objective), 'বৈজ্ঞানিক' বর্গ (categories)[৭] হিসেবে। অর্থাৎ, প্রাকৃতিক প্রপঞ্চরূপে (phenomena), ক্ষমতার ইতিহাস হিসেবে নয়। এই ক্ষমতাকাঠামোর নির্মাণশৈলীর (framework) ভেতরেই সক্রিয় ছিল, এবং এখনো আছে, শ্রেণি বা ভূসম্পত্তির অপরাপর সামাজিক সম্পর্কসমূহ।

আসলে, বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে শোষণ ও দমনের প্রধান রেখাটিকেই আমরা যদি লক্ষ করি—বর্তমান বিশ্বক্ষমতার মূল রেখাটিকে—অর্থাৎ, পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্য সম্পদ ও শ্রম-পরিসরের বণ্টন[কে], তাহলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে-যে শোষিত, নিগৃহীত ও বঞ্চিত জনসংখ্যার অধিকাংশই 'জাতিগোষ্ঠী', 'নৃ-সম্প্রদায়' বা 'জাতীয়' পরিচয়ে চিহ্নিত, যাদের অধিকাংশই উপনিবেশিত এবং সেই আমেরিকা দখলের সময় থেকেই যারা এভাবে চিহ্নিত ও বর্গীকৃত (categorized) হয়ে আসছে।

অনুরূপভাবে, রাজনৈতিক উপনিবেশবাদের পরিসমাপ্তি সত্ত্বেও ইউরোপীয়—'পশ্চিমা'ও বলা হয়ে থাকে—সংস্কৃতির সঙ্গে অপরাপর সংস্কৃতির মধ্যকার সম্পর্ক এক-ধরনের ঔপনিবেশিক আধিপত্যই বহাল রাখে। এটি কেবল ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রতি অপরাপর সংস্কৃতির বাহ্যিক আনুগত্য প্রদর্শনেরই ব্যাপার নয়। এটি অপর সংস্কৃতির উপনিবেশায়ন—যদিও ঘটনা সাপেক্ষে এর তীক্ষ্ণতা ও ঘনত্বে তারতম্য নিশ্চয়ই আছে। এই সম্পর্কের প্রথম শর্তই হলো, দমিত অধিবাসীদের ভাবনার উপনিবেশায়ন, [যার] ফলে এটি কাজই করে ভাবনার অন্তর্গত হয়ে—যেন ভাবনারই তা

নিজস্ব উপাদান।

উপনিবেশায়ন শুরুতে বৈশ্বিক ঔপনিবেশিক আধিপত্যে অকার্যকর নির্দিষ্ট বিশ্বাস, ভাবাদর্শ, মানসচিত্র (image) ও প্রতীকসমূহের অথবা জ্ঞানকাণ্ডের পদ্ধতিগত দমনের ফলই শুধু ছিল না, উপনিবেশকেরা একইসঙ্গে উপনিবেশিতদের দখলচ্যুত করেছিল (expropriate) তাদের জ্ঞানাভিজ্ঞতা [থেকে], বিশেষ করে খনি-শিল্প, কৃষি, প্রকৌশল, উপরন্তু তাদের পণ্য ও শ্রম থেকে।[৮] সর্বোপরি, এই দমনের প্রভাব গিয়ে পড়েছে জানা-বোঝার প্রক্রিয়ায় (modes of knowing); জ্ঞানোৎপাদনে; পরিপ্রেক্ষিত, মানসচিত্র ও মানসচিত্র-ব্যবস্থা, প্রতীক ও অর্থোৎপাদনের উপায়ে (modes of signification); বুদ্ধিবৃত্তিক বা ঐক্ষিক (visual), সংহত (formalized) ও বিষয়কৃত (objectivised) অভিব্যক্তির উৎস, বিন্যাস ও হাতিয়ারে। শাসকগোষ্ঠীর নিজস্ব অভিব্যক্তির বিন্যাস, তাদের বিশ্বাস ও মানসচিত্রসমূহকে অতি-প্রাকৃতিক (supernatural) জ্ঞানপূর্বক আরোপণের দ্বারাই এটা সম্ভব হয়েছে। এই সকল বিশ্বাস ও মানসচিত্র শাসিতদের সংস্কৃতিগত উৎপাদনকেই কেবল ব্যাহত করেনি, একইসঙ্গে এগুলো ছিল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণেরও অতি কার্যকর হাতিয়ার, বিশেষ করে প্রত্যক্ষ দমন কার্যক্রম যখন থমকে [গিয়ে] স্থির ও প্রণালীবদ্ধ হয়ে পড়েছিল।

উপনিবেশকেরা অবশ্য জ্ঞান ও তদর্থ উৎপাদনের নিজস্ব বিন্যাস সম্পর্কেও একটি বিভ্রান্তিকর (mystified) মানসচিত্র আরোপ করেছিল। প্রথমত, তারা তাদের বিন্যাসটিকে স্থাপন করেছিল শাসিতদের নাগালের বাইরে। তারপর, তারা তা শিখিয়েছিল অসম্পূর্ণ ও নির্বাচিত কায়দায়, যাতে শাসিতদের একটি অংশকে তাদের নিজস্ব ক্ষমতা-সংস্থায় (power institutions) কাজে লাগানো যায়। ফলে, ইউরোপীয় সংস্কৃতি হয়ে উঠেছিল ক্ষমতায় পৌঁছানোর সিঁড়ি। সর্বোপরি, দমন-পীড়নের বাইরে প্রলোভনই [যেখানে] সকল ক্ষমতার অব্যর্থ হাতিয়ার। সাংস্কৃতিকভাবে ইউরোপীয় হয়ে ওঠা [তাই] আকাঙ্ক্ষার বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। এটি ছিল ঔপনিবেশিক ক্ষমতায় অংশগ্রহণের—কিন্তু তা বিলোপের কাজেও এটি খাটতে পারত[৯]—এবং পরবর্তীকালে ইউরোপীয়দের অনুরূপ বস্তুগত সুবিধা ও ক্ষমতা লাভের উপায়স্বরূপ : সংক্ষেপে বললে, প্রকৃতিকে পদস্থ করতে—'উন্নয়নের' দোহাই। ইউরোপীয় সংস্কৃতি হয়ে উঠেছিল সংস্কৃতির বৈশ্বিক আদর্শ।

অ-ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে সেই মানসপ্রতিমা (The imaginary) এখন কদাচিৎ টিকে আছে, সর্বোপরি, এই মতাদর্শিক প্রভাবের বাইরে নিজেকে যা পুনরুৎপাদনে সক্ষম।

সময় ও ঘটনাভেদে সাংস্কৃতিক এই ঔপনিবেশিকতার রকম (forms) ও ফলাফলে (effects) যথেষ্ট ফারাক বিদ্যমান। লাতিন আমেরিকায় [যেমন] বিদ্যমান সংস্কৃতির দমন ও মানসপ্রতিমার উপনিবেশায়ন চরিতার্থ হয়েছিল বিপুল ও ভয়াবহ মাত্রায় স্থানীয়দেরকে নিধনের দ্বারা, প্রধানত ব্যয়সাধ্য শ্রমশক্তি (disposable labor) হিসেবে তাদের ব্যবহারের মাধ্যমে, তার ওপর প্রভুত্ব স্থাপনের সহিংসতা তো ছিলই, আর ছিল ইউরোপীয়দের দ্বারা বাহিত রোগসমূহ। আজটেক-মায়া-ক্যারিবীয় ও টোয়ানটেনসুইউ (অথবা ইনকা) (Tawantinsuyana) অঞ্চলে ৫০ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে প্রায় ৬৫ মিলিয়ন অধিবাসী নিধনের শিকার হয়েছে। এই ধ্বংসযজ্ঞের মাত্রাগত ভয়াবহতা ছিল এতটাই-যে এটি কেবল জনসংখ্যাগত দুর্যোগই ঘটায়নি, সমাজ ও সংস্কৃতিকেও তা সমূলে বিনাশ করেছে। সাংস্কৃতিক অবদমন ও ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ (genocide) সামষ্টিকভাবে আমেরিকার এক-সময়কার উন্নত সংস্কৃতিকে নিরক্ষর, বাচনিকতায় (orality) আবদ্ধ চাষীদের এক উপসংস্কৃতিতে নামিয়ে আনে; তাকে বঞ্চিত করা হয় নিজস্ব বিন্যাসে সংহত (formalized), বিষয়কৃত (objectivised), তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সুনম্য (plastic) বা ঐক্ষিক (visual) অভিব্যক্তি থেকে। অতঃপর, উত্তরজীবীদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সুনম্য অথবা ঐক্ষিক কোনো সংহত ও বিষয়কৃত অভিব্যক্তির স্বতন্ত্র উপায় আর থাকবে না, তবে শাসকদের সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির মাধ্যমে, অভিব্যক্তির অন্য চাহিদাসমূহ সঞ্চারিত করতে ক্ষেত্রবিশেষে এমনকি তাদের যদি ধ্বংসও করতে হয়।[১০] লাতিন আমেরিকা, নিঃসন্দেহে, ইউরোপ কর্তৃক সাংস্কৃতিক উপনিবেশায়নের এক চূড়ান্ত নজির।

এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে উচ্চ সংস্কৃতিকে এমন তীব্র ও গভীরভাবে ধ্বংস করা যেত না। তথাপি তাদের অবস্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল অধীনতার সম্পর্কসূত্রে; [ফলে] ইউরোপীয় দৃষ্টিতে তো বটেই, স্থানীয় ধারকদের চোখেও তা অভিন্ন ছিল। পশ্চিমা বা ইউরোপীয় সংস্কৃতি আপনকার অগ্রবর্তী সমাজের রাজনৈতিক, সামরিক ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতার মাধ্যমে চিন্তাকাঠামোগত নিজস্ব নকশা ও মুখ্য জ্ঞানমূলক (cognitive) উপাদানগুলোকে সকল ধরনের সংস্কৃতি

বিকাশেরই নিয়মরূপে আরোপ করেছিল, বিশেষত—বুদ্ধিবৃত্তিক ও সৃজনশীল তৎপরতার ক্ষেত্রে। এই সম্পর্ক পরিণামে সেই ধরনেরই সমাজ ও সংস্কৃতি গঠনের শর্ত হয়ে উঠেছিল যা সর্বাত্মক অথবা আংশিকভাবে ইউরোপীয়করণের দিকে ধাবিত হবে।

আফ্রিকায় সংস্কৃতির বিনাশ নিশ্চিতভাবেই এশিয়ার তুলনায় অনেক বেশি গভীর ছিল, তারপরও তা ছিল আমেরিকার চেয়ে কম। ইউরোপীয়রা সেখানে কেবল অভিব্যক্তির বিন্যাসেই নয়, বিশেষভাবে বিষয়করণ ও ঐক্ষিক রূপায়ণেরও পূর্ণ ধ্বংস সাধনে সফল হয়েছিল। ইউরোপীয়রা যেটা করেছিল, বৈশ্বিক সংস্কৃতির ক্রমে ইউরোপীয় বিন্যাসের আধিপত্যের দ্বারা আফ্রিকাকে বঞ্চিত করেছিল তার উত্তরাধিকার ও স্বীকৃতি থেকে। প্রথমটি [আফ্রিকার সংস্কৃতি] সেখানে 'অদ্ভুত' (exotic) বর্গে সীমায়িত হয়েছিল। যেমনটা, নিঃসন্দেহে, স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, পশ্চিমা বা ইউরোপীয় ঘরানার আফ্রিকার শিল্পীদের শিল্পকর্মে আফ্রিকার উৎপন্নের সুনম্য অভিব্যক্তিকে প্রেষণা, সূচনা-বিন্দু ও প্রেরণার উৎসরূপে ব্যবহারের মধ্যে; তা কিন্তু আফ্রিকার শিল্পের নিজস্ব অভিব্যক্তি, ইউরোপীয় মানদণ্ডেরই সমমর্যাদাপূর্ণ আরেকটি মানদণ্ড হিসেবে গৃহীত হয়নি। এবং এটিই নির্ভুলভাবে ঔপনিবেশিক দৃষ্টিটাকে চিহ্নিত করে দেয়।

ঔপনিবেশিকতা, [সেই] তখন থেকেই, এমনকি আজকের পৃথিবীতেও প্রভাব বিস্তারের সবচেয়ে সাধারণ কায়দা; উপনিবেশবাদ একদা স্পষ্ট রাজনৈতিক বিন্যাস (explicit political order) হিসেবে বিধ্বস্ত হয়েছিল—নিঃসন্দেহে, শোষণের উপায় ও জনগণের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের ধরন হিসেবে নয়; [অর্থাৎ] এর শর্তসমূহ ক্ষয়ে যায়নি। [ফলে] ৫০০ বছর ধরে জারি থাকা তাদের প্রধান নির্মাণ কাঠামোর (framework) কোনো পরিবর্তন হয়নি। [তবে] আগেকার সময়ের ঔপনিবেশিক সম্পর্ক সম্ভবত একই ফলাফল বয়ে আনত না, এবং, সবচেয়ে বড় কথা হলো, সেগুলো কোনো বৈশ্বিক শক্তির ভিত্তিপ্রস্তর স্বরূপ ছিল না।

'জনগোষ্ঠী' (Race)[১১] ও ক্ষমতার ঔপনিবেশিকতা

উপনিবেশক ও উপনিবেশিত এই দুই শ্রেণিতে সমাজকে বিন্যস্ত করার ক্ষেত্রে 'জনগোষ্ঠী'কে মৌল বর্গ (category) রূপে গ্রহণ করা এবং আমেরিকা ও

পশ্চিম ইউরোপে ক্ষমতার ঔপনিবেশিকতার বাস্তবায়ন একইসঙ্গে ঘটেছিল। উপনিবেশবাদের অন্যান্য অতীত অভিজ্ঞতার অননুরূপ, প্রবলের শ্রেষ্ঠত্ব আর দুর্বলের অধস্তনতার পুরনো ধারণা ইউরোপীয় উপনিবেশবাদে জৈবিকভাবে ও গঠনগত উপায়ে শ্রেষ্ঠত্ব ও অধস্তনতার সম্পর্কে পরিবৃত্তি (mutation) লাভ করেছে।*

সংশ্লিষ্ট শতকগুলোতে নয়া পৃথিবীর ক্ষমতার এই ইউরোকেন্দ্রীকরণ-প্রক্রিয়া দুনিয়ার জনসংখ্যা ও তাদের সমাজকে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সূচিত করার ক্ষেত্রে 'বর্ণবাদী' (racial) মানদণ্ড আরোপণের পথ করে দেয়। ফলে, সাধারণ সব ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের (physiognomic) সাপেক্ষে 'জনগোষ্ঠী'গত বাহ্যিক রূপকেই আমলে নিয়ে, গোটা দুনিয়া জুড়ে গড়ে ওঠে মানুষের নতুন নতুন পরিচয় : 'সাদা', 'ভারতীয়', 'নিগ্রো', 'হলদে', 'হলদে-বাদামি'। তারপর এই ফোঁড়েই (basis) গ্রথিত হয় ভূগোলকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক পরিচয় : ইউরোপীয়, আমেরিকান, এশীয়, আফ্রিকান এবং আরও পরে ওশেনীয়। পৃথিবীব্যাপী ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক আধিপত্যের কালে—পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থায়—চাকরিজীবী, স্বাধীন চাষা, স্বয়ংসম্পূর্ণ বণিক, গোলাম ও ভূমিদাসদের কর্মপরিসর এই 'বর্ণবাদী' রেখাতেই চিত্রিত হয়েছে যা বিশ্বব্যাপী সমাজ ও রাষ্ট্রের জাতীয়করণ (nationalization), জাতিরাষ্ট্র-সংগঠন, নাগরিকত্ব, গণতন্ত্র ও অপরাপর বিষয়াবলির গঠন-প্রক্রিয়ার সঙ্গেও সর্বতোভাবে সংসৃষ্ট। ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সংগ্রামগুলো বৈশ্বিক-পুঁজিবাদী-ব্যবস্থায় নির্ধারিত কর্মপরিসরের এই ধরনে ক্রমশ পরিবর্তন আনতে শুরু করেছিল, বিশেষত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে, পুঁজিবাদের নিজস্ব পরিবর্তিত চাহিদাও এক্ষেত্রে দায়ী। কিন্তু কর্মপরিসর নির্ধারণের আদতে সমাপ্তি ঘটেনি—যেহেতু ইউরোকেন্দ্রিক ক্ষমতার ঔপনিবেশিকতা ইতিমধ্যে প্রমাণ করেছে যে ইউরোকেন্দ্রিক উপনিবেশবাদের চেয়েও তা দীর্ঘস্থায়ী। এটা ধরতে না পারলে, লাতিন আমেরিকা ও সংশ্লিষ্ট অপরাপর ভূখণ্ডে পুঁজির ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করা মুশকিল।**

সুতরাং, ইউরোকেন্দ্রিক বিশ্বক্ষমতার ছত্রছায়ায় ক্ষমতার ঔপনিবেশিকতার (coloniality of power) ভিত্তি 'জনগোষ্ঠী'র (racial) মানদণ্ডে গোটা দুনিয়ার জনসংখ্যার বিন্যস্তকরণের ওপরে প্রোথিত। কিন্তু ক্ষমতার

ঔপনিবেশিকতা আদৌ সামাজিক সম্পর্কের 'বর্ণবাদী' (racist) সমস্যা দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য নয়। এটি ক্ষমতার ঔপনিবেশিকতার ভিত্তিমূল হয়ে ওঠার জন্য ইউরোকেন্দ্রিক পুঁজিবাদী ঔপনিবেশিক/ আধুনিক বিশ্বক্ষমতার বুনিয়াদি দৃষ্টান্তগুলোকে পরিব্যাপ্ত (pervade) ও সমন্বিত (modulate) করেছিল।

ইউরোকেন্দ্রিকতা, সাংস্কৃতিক ঔপনিবেশিকতা ও আধুনিকতা/ যৌক্তিকতা

ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক আধিপত্য সুদৃঢ় হওয়ার অনুরূপ কালপর্বেই গড়ে উঠেছিল ইউরোপীয় আধুনিকতা/ যৌক্তিকতার[২২] সাংস্কৃতিক সৌধ। আন্তঃবিষয়ী জগৎ সমগ্র ইউরোকেন্দ্রিক পুঁজিবাদী ঔপনিবেশিক শক্তি দ্বারা নির্মিত যা ইউরোপীয়দের দ্বারাই বিস্তৃত ও সংহত হয়েছে আর তা প্রতিষ্ঠাও পেয়েছে বিশেষ ইউরোপীয় ফসল হিসেবে এবং জ্ঞানের সর্বজনীন চিন্তাকাঠামো রূপে এবং মানবিকতা ও বাদবাকি দুনিয়ার মধ্যকার সম্পর্ক আকারে। আধুনিকতা/যৌক্তিকতার ব্যাখ্যার সঙ্গে ঔপনিবেশিকতার সঙ্গম কোনোভাবেই আকস্মিক ছিল না, যেমনটা যৌক্তিক জ্ঞানের ইউরোপীয় চিন্তাকাঠামো যেখানে আলোচিত হয়েছে সেই ব্যাখ্যার মধ্যে স্পষ্টই দেখানো হয়েছে। এছাড়া, নগরের উত্থান ও সামাজিক সম্পর্কের পুঁজিবাদী বিকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চিন্তাকাঠামো নির্মাণেও ক্ষমতার ঔপনিবেশিকতার চূড়ান্ত হস্তক্ষেপ রয়েছে, উপনিবেশবাদ ও ঔপনিবেশিকতার বাইরে পালাক্রমে যাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করাই সম্ভব হয়নি, বিশেষভাবে তা হয়নি লাতিন আমেরিকা ক্ষেত্রে।

ইউরোপীয় আধুনিকতা/ যৌক্তিকতার চিন্তাকাঠামো নির্মাণে ঔপনিবেশিকতার নিশ্চায়ক ভার (decisive weight) সেই সাংস্কৃতিক সৌধের অন্তর্গত সংকটের মধ্যেই স্পষ্টরূপে ধরা পড়ে। সৌধটির মৌলিক কিছু সমস্যার বিশ্লেষণ তার সংকট বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

জ্ঞানোৎপাদন প্রসঙ্গে

যৌক্তিক জ্ঞানের ইউরোপীয় চিন্তাকাঠামোর চলতি সংকট দিয়েই শুরু হোক, যার মৌলিক পূর্বানুমানটাই প্রশ্নবিদ্ধ : অর্থাৎ, জ্ঞানকে বিষয়ী-বিষয় সম্পর্কের উৎপাদন মনে করা। জ্ঞান যা সূচিত করে তার বৈধকরণের সমস্যা ছাড়াও, সেই পূর্বানুমান আরও কিছু নতুন সংকটের জন্ম দেয় তা বরং এখানে বিশ্লেষণ করাই শ্রেয়।

প্রথমত, সেই পূর্বানুমানে 'বিষয়ী' বর্গটি বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে নির্দেশ করে, কারণ নিজেই তা নিজের মধ্যে ও নিজের জন্য, বয়ানের (discourse) নিজস্ব পরিসীমায় এবং জাহির করার সাধ্যের (capacity of reflection) ভেতর নিজেকে সংগঠিত করে তোলে। কার্তেসীয় 'cogito, ergo sum' (আমি চিন্তা করি, তাই আমি আছি) হুবুহু এই অর্থটিই দেয়। দ্বিতীয়ত, 'বিষয়' কেবল 'বিষয়ী'/ব্যক্তি থেকে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নির্দেশক একটি বর্গই নয়, পরেরটি থেকে বৈশিষ্ট্যগতভাবেও তা পৃথক। তৃতীয়ত, 'বিষয়' ও তার সত্তা অভিন্ন, কেননা তা পরিগঠিত হয়েছে 'সম্পত্তি' (properties) দ্বারা যা তার পরিচয় নির্মাণ করে ও তাকে সংজ্ঞায়িত করে, অর্থাৎ, তারা তাকে সীমায়িত করে এবং একই সময়ে স্থাপন করে অপরাপর 'বিষয়াবলির' সম্পর্কের মধ্যে।

এই চিন্তাকাঠামোর মধ্যে, প্রথমত, যা প্রশ্নের সম্মুখীন, ব্যক্তি ও 'বিষয়ী'র ব্যক্তিতান্ত্রিক চরিত্র, যা আন্তঃবিষয়ীতা (intersubjectivity) ও সামাজিক অখণ্ডতাকে (social totality) সকল প্রকার জ্ঞানের উৎপাদনক্ষেত্র হিসেবে অস্বীকার করার মাধ্যমে যে-কোনো অর্ধসত্যের মতো সমস্যাকে আরও ঘোলাটে করে তোলে। দ্বিতীয়ত, [সেখানকার] 'বিষয়'-এর ধারণা হাল আমলের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানলব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ, যেই মতে 'সম্পত্তি' হলো প্রদত্ত ক্ষেত্রে বিরাজমান কোনো সম্পর্কের উপায় ও সময় নির্দেশক। ফলে, সম্পর্কের এই পরিধির বাইরে সত্তাগতভাবে অহ্রাসযোগ্য মৌলিকতার (ontologically irreducible originality) পরিচয়গত কোনো ধারণা গড়ে নেওয়ার যথেষ্ট সুযোগ নেই। তৃতীয়ত, প্রকৃতিগত পার্থক্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত 'বিষয়ী' ও 'বিষয়'-এর মধ্যকার সম্পর্কের বিশ্লিষ্টতা (externality), পার্থক্যসমূহের কেবল যথেচ্ছা অতিকথনই নয়, আধুনিক অনুসন্ধানগুলো যেহেতু জগতে বিরাজমান আরও গভীরতর কোনো যোগাযোগের কাঠামোকেই বরং নির্দেশ করে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও চূড়ান্ত কথা হলো, এই ধরনের জ্ঞানগত অভিপ্রায়ে প্রোথিত থাকে নতুন এক কট্টর দ্বৈতবাদ : ঐশী হেতু (divine reason) ও প্রকৃতি (nature)। 'বিষয়ী' সেই 'হেতু'র ধারক ও বাহক, যেখানে 'বিষয়' কেবল তা থেকে বিশ্লিষ্টই নয়, বৈশিষ্ট্যগতভাবেও তা স্বতন্ত্র। বাস্তবিকপক্ষে, এটি হলো 'প্রকৃতি'।

'বিষয়ী'র ধারণা দিয়ে অবশ্যই কেউ ইউরোপের চাপিয়ে দেওয়া (adscriptive) সামাজিক কাঠামোয় বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি, রুদ্ধ ব্যক্তির মুক্ত

বিকাশের কোনো উপাদান বা মুহূর্তকে বুঝতেই পারে। দুইয়ের মধ্যে এই পরে উল্লেখিতরা জীবনব্যাপী ব্যক্তির এই একক অধিষ্ঠান ও সামাজিক ভূমিকার নিন্দা করেন, যেমনটা ঘটে থাকে ঠিক সেই ধরনের সমাজে যেখানে কর্তৃত্বক্রম ত্রাস, ভাবাদর্শ ও সাদৃশ্যপূর্ণ প্রতিমাপুঞ্জের (corresponding imagery) দ্বারা কট্টরভাবে প্রতিষ্ঠিত। এটি ছিল প্রাগাধুনিক ইউরোপীয় সমাজ/ সংস্কৃতির ঘটনা। সেই স্বাধীনতা ছিল পুঁজিতান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্ক ও নাগরিক জীবনের আবির্ভাবের সঙ্গে সম্পর্কিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক লড়াই। কিন্তু, আরেক দিক থেকে দেখলে, জ্ঞানচর্চার বর্তমান ক্ষেত্রে সেই প্রস্তাবনা আজ অচল। একক সেই বিশ্লিষ্ট বিষয়ীতা বাস্তব, কিন্তু মোটেও তা স্বতন্ত্র কোনো সত্তা নয়, ফলে এটি নিজ অস্তিত্বের মুখোমুখি বা স্বয়ং অস্তিত্বশীল নয়। এটি অস্তিত্বশীল সামাজিক সম্পর্কের আন্তঃবিষয়ীতা (intersubjectivity) বা আন্তঃবিষয়ী (intersubjective) মাত্রার পৃথক অংশ হিসেবে—বিচ্ছিন্ন রূপে নয়। প্রতিটি একক বয়ান, অথবা অনুচিন্তন (reflection) আন্তঃবিষয়ী কাঠামোকেই নির্দেশ করে (remit)। এটি নিজের মধ্যে নিজেরই মুখোমুখি সংগঠিত হয়। জ্ঞান এই বিবেচনায় কোনো কিছুর উদ্দেশ্যে এক-ধরনের আন্তঃবিষয়ী সম্পর্ক, বিচ্ছিন্ন বিষয়ীর সঙ্গে সেই কিছু একটার সম্পর্ক মাত্র নয়।

সম্ভবত সম্পত্তির অনুরূপ উপায়ে জ্ঞানকে—একক ব্যক্তির সঙ্গে আর কিছুর সম্পর্ক আকারে—বিবেচনা করাটা আকস্মিক নয়। আধুনিক সমাজ বিকাশের মুহূর্তেও অনুরূপ মানসিক নকশা (mechanism) এই দুই ধারণাকে বলবৎ রেখেছিল। ফলে, সম্পত্তিও, জ্ঞানের অনুরূপ, কোনো কিছুর উদ্দেশ্যে তৎপর লোকেদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক [কিংবা] একক ব্যক্তির সঙ্গে আর কিছুর সম্পর্কমাত্র নয়। এইসব প্রপঞ্চ পার্থক্য নির্দেশ করে যে সম্পত্তি-সম্পর্ক জারি থাকে বস্তুগত (material) একইসঙ্গে আন্তঃবিষয়ী কায়দায় (intersubjective manner); অপরপক্ষে, জ্ঞান হাজির থাকে কেবলই আন্তঃবিষয়ী সম্পর্করূপে।

ফলে, যে-কেউ যৌক্তিকতার ইউরোপীয় চিন্তাকাঠামোর বিস্তৃতিকালের সঙ্গে ব্যক্তিবাদ/ দ্বৈতবাদ এবং ইউরোপীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বসমূহের সংশ্লিষ্টতা দেখাতেই পারেন। কিন্তু সেই ব্যক্তিবাদ/ দ্বৈতবাদে আরও একটি অনুষঙ্গ আছে, ইউরোপীয় অভ্যন্তরীণ পরিপ্রেক্ষিতে যা অপ্রাসঙ্গিক নয় :

'অপর' একদম গরহাজির; অথবা হাজির থাকলেও তা কেবলই 'বিষয়কৃত' উপায়ে।

সাধারণত 'অপর'-এর এই কট্টর অনুপস্থিতি, সামাজিক অস্তিত্বের ব্যক্তিবাদী চিত্রকেই (atomistic image) কেবল প্রামাণ্যরূপে পেশ করে না, এর মানে, সামাজিক অখণ্ডতার (social totality) ধারণাকেও তা অস্বীকার করে। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক অনুশীলনে যেমনটা পরিলক্ষিত হয়েছে-যে এই চিন্তাকাঠামোয় ইউরোপীয় পটভূমির বাইরের যে-কোনো অপর 'বিষয়ী'র উল্লেখকে একদম গায়েব করে দেওয়া সম্ভব, অর্থাৎ, সামগ্রিকভাবে ঔপনিবেশিক ক্রমকে অদৃশ্য রাখতে ঠিক একই সময়ে উপনিবেশ কবলিত বাদবাকি দুনিয়ার সাপেক্ষে ইউরোপ গড়ে তুলছিল তার নিজস্ব আত্মপরিচয়। 'পশ্চিম' অথবা 'ইউরোপ' নামক ধারণার আবির্ভাব মূলত অন্যান্য সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতাসমূহের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সম্পর্ক—অপরাপর সংস্কৃতির মধ্যকার জারি থাকা পার্থক্যসমূহের সাপেক্ষে পরিচিতির প্রতিপাদন। কিন্তু, সেই 'ইউরোপীয়' বা 'পশ্চিমা' বোঝাপড়ায়, সর্বোপরি, এই বৈচিত্র্যসমূহ প্রাথমিকভাবে কর্তৃত্বক্রমানুযায়ী পূর্ণমাত্রায় অসমতা হিসেবে প্রতিপাদিত হয়েছে। এবং এই অসমতাগুলোকে জ্ঞান করা হয়েছে প্রকৃতি প্রদত্ত বলে : ইউরোপীয় সংস্কৃতিই কেবল যুক্তিসিদ্ধ (rational), এটি 'বিষয়ী'কে ধারণে সক্ষম—বাদবাকি আর যা আছে সেগুলো যুক্তিসিদ্ধ নয়, 'বিষয়ী' হতে তারা অপারগ বা তা ধারণেও অক্ষম। ফলে শেষমেষ দাঁড়াল এই, অপরাপর সংস্কৃতিগুলো এই কারণেই পৃথক যে তারা অসম, আসলে অধস্তন, এবং তা প্রকৃতিগতভাবেই। তারা কেবল হতে পারে জ্ঞান বা কর্তাগিরি ফলানোর 'বিষয়' মাত্র। সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই নির্ধারিত হয়েছে ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও অপরাপর সংস্কৃতির মধ্যকার সম্পর্ক এবং তা সংরক্ষিতও হয়েছে 'বিষয়ী' ও 'বিষয়'-এর মধ্যকার সম্পর্করূপে। ফলে, যোগাযোগের প্রতিটি সম্পর্ককে, সংস্কৃতিসমূহের মধ্যকার জ্ঞান ও জ্ঞানোৎপাদনের যে উপায়সমূহ রয়েছে তাদের পারস্পরিক বিনিময়কে এটি প্রতিহত করেছে, যেহেতু চিন্তাকাঠামোটিই প্রোথিত করে দেয় 'বিষয়ী' ও 'বিষয়'-এর মধ্যে কেবলই এক বিশ্লিষ্টতার সম্পর্ক। এই ধরনের মানসিকতা চর্চাকারে জারি আছে ৫০০ বছর ধরে, যা কেবল ইউরোপ ও বাদবাকি দুনিয়ার ঔপনিবেশিক সম্পর্কের ফসলরূপেই সম্ভবপর ছিল। অন্যভাবে বললে, যৌক্তিক জ্ঞানের ইউরোপীয় চিন্তাকাঠামো কেবল এই পরিপ্রেক্ষিতেই নয়, বাদবাকি দুনিয়ার ওপর

ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসন-সংশ্লিষ্ট ক্ষমতাকাঠামোর অংশ হিসেবেও বিস্তৃত হয়েছে। প্রতিপাদন করা অর্থে, এই চিন্তাকাঠামোটিই মেলে ধরেছিল সেই ক্ষমতাকাঠামোর ঔপনিবেশিকতা।

ইতিমধ্যেই এসব ব্যাপকভাবে চর্চিত হয়েছে, বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে; নির্দিষ্ট কিছু বিভাগের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ, যেমন নৃতত্ত্ব (Ethnology) ও নৃবিজ্ঞান (Anthropology), 'পশ্চিমা' সংস্কৃতি ও অপরাপর সংস্কৃতির মধ্যে সর্বদা সেই ধরনের 'বিষয়ী-বিষয়' সম্পর্কই নির্দেশ করে আসছে। অপরাপর সংস্কৃতিসমূহ [যেন] সংজ্ঞানুসারেই অধ্যয়নের 'বিষয়'। সশ্লেষ ব্যঙ্গানুকরণ ব্যতীত ('Nacirema-দের আচারানুষ্ঠান'—'American'-এর শব্দখেল—এর আদর্শ নমুনা) 'পশ্চিমা' সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে এই ধরনের অধ্যয়ন কার্যত (virtually) অনস্তিত্বশীল।

জ্ঞানে সমগ্রতার প্রসঙ্গ

কার্তেসীয় চিন্তাকাঠামোয় গরহাজির থাকা সত্ত্বেও, বিশেষ করে সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কের বেলায়, সমগ্রতার ধারণার বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়োজনীয়তা ইউরোপীয় আলোচনায় হাজির ছিল; শুরুর দিকে আইবেরীয় দেশগুলোতে (Victoria, Sua´rez) এবং গির্জা ও রাজশক্তির ক্ষমতা সংরক্ষণ করার প্রচেষ্টায় এবং কিছুটা পরে ফ্রান্সে (আঠারো শতকে), তারও পরে সমাজ পর্যালোচনায় বা বিকল্প সমাজের প্রস্তাবনায় ব্যবহৃত চাবি অনুষঙ্গ হিসেবে। সর্বোপরি, সন্ত সিমোঁর সময় থেকেই, সমাজ-রূপান্তরের বৈপ্লবিক প্রস্তাবগুলোর সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক অখণ্ডতার ধারণাও বিস্তৃতি লাভ করেছিল, সামাজিক অস্তিত্বের ব্যক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির (atomistic perspective) বিপরীতে পরে যা অভিজ্ঞতাবাদী ও বিদ্যমান সমাজ এবং রাজনৈতিক কাঠামোর অনুরক্তদের মধ্যে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। বিশ শতকে, সমগ্রতা একটি দৃষ্টিভঙ্গি ও বৈজ্ঞানিক তদন্তে সচরাচর অবলম্বিত একটি বর্গ (category) হয়ে ওঠে—বিশেষত যেগুলোর কারবার সমাজ নিয়ে।

ইউরোপীয়-পশ্চিমা যৌক্তিকতা/ আধুনিকতা কেবল গির্জা ও ধর্মের সঙ্গে বিবাদমূলক সংলাপ দ্বারাই নয়, গড়ে উঠেছে একদিকে, পুঁজিবাদী এবং নাগরিক সামাজিক সম্পর্ক ও জাতি-রাষ্ট্রসমূহ; অন্যদিকে, বাদবাকি দুনিয়ার উপনিবেশায়ন মারফত ক্ষমতাকে নতুন কাঠামোয় সংস্থাপন করার মধ্য

দিয়ে। এটি সম্ভবত, পরিস্থিতি থেকে বিযুক্ত ছিল না যে সামাজিক সমগ্রতার ধারণাটি বিকশিত হয়েছিল একটি অবয়ববাদী (organicist) মানসচিত্রানুসারে, যা বাস্তবতার একটি সীমিত আদলকে (reductionist vision) গ্রহণে প্ররোচিত করেছিল।

প্রকৃতপক্ষে, সেই দৃষ্টিভঙ্গিটা সামাজিক সমগ্রতা, অর্থাৎ, সমাজ-এর ধারণার উদ্বোধন ও তাকে সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে স্পষ্টত সহায়ক ছিল। কিন্তু আরও দুটি অনুরূপ ধারণা নির্মাণেও এটি সহায়ক ছিল : এক, প্রতিটি সদস্যের সক্রিয় সম্পর্কের কাঠামো হিসেবে সমাজ, এবং যার-ফলে তা [সমাজ] যুক্ত ছিল একক একটি যুক্তিকাঠামোর সক্রিয়তার সঙ্গে, সুতরাং, [দাঁড়াল] এক নিপাট সমগ্রতা (closed totality)। পরবর্তীতে পদ্ধতিগত সমগ্রতার ধারণাটিকে এটি ঠেলে দেয় কাঠামোবদ্ধ-ক্রিয়াবাদে (structural- functionalism)। দ্বিতীয় ধারণাটি ছিল, আঙ্গিক কাঠামোরূপে সমাজ, যেখানে প্রতিটি অঙ্গ আগের নিয়মেই কর্তৃত্বক্রমানুযায়ী পরস্পর সম্পর্কিত, আমাদের মনে প্রতিটি অঙ্গ সম্পর্কে ঠিক যে-ধরনের চিত্র আছে, বিশেষভাবে বলা যায় মানবদেহের কথা। যেখানে একটি অংশ (মস্তিষ্ক) সমগ্র দেহটাকেই নিয়ন্ত্রণ করে—অস্তিত্বের স্বার্থে যদিও এটি বাকিদের বর্জন করায় অপারগ—বাদবাকি (বিশেষত হাত ও পা) অংশ অঙ্গসমূহের নিয়ন্ত্রণকারী অংশের প্রতি আনুগত্য বজায় না-রেখে টিকতেই পারে না।

উদ্যোক্তা-শ্রমিক সম্পর্ক ও শিল্পোদ্যোগের সঙ্গে জড়িত এটি একটি মনগড়া (diffused) চিত্র, রোমান প্রজাতন্ত্রের শুরুর দিককার মেনেনিয়াস আগরিপা (Menenius Agrippa) কিংবদন্তি বক্তৃতাকেই যা প্রলম্বিত করে চলেছে, যা [প্রদান করা হয়েছিল ইতিহাসের প্রথম হরতালকারীদের নিরত করার উদ্দেশ্যে [যে] : মালিকরা হলো মস্তিষ্কস্বরূপ এবং শ্রমিকরা তার সহায়াঙ্গ, যা দেহের মতো বাদবাকি অঙ্গসমূহের সমন্বয়ের মাধ্যমে সমাজ গঠন করে। মস্তিষ্ক ব্যতিরেকে যেমন সহায়াঙ্গসমূহের কোনো সার্থকতা থাকবে না, তেমনি বাদবাকি অঙ্গাদির সহায়তা ছাড়াও মস্তিষ্ক অক্ষম। দেহকে সক্রিয় ও বলবান রাখার জন্য উভয়ই সমানভাবে অপরিহার্য অন্যথায় না-মস্তিষ্ক না-বাদবাকি প্রত্যঙ্গ কোনোটাই কার্যকর থাকবে না। কাউটস্কির যে প্রস্তাবটিকে লেনিন আত্মস্থ করেছিলেন, তা এই চিত্রেরই রকমফের মাত্র, প্রলেতারিয়েতরা যেখানে আপনা থেকে নিজেদের শ্রেণি-চেতনার বিকাশ ঘটানোয় অক্ষম এবং

বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী শ্রেণি বা পেটি বুর্জোয়া শ্রেণিই হলো সেই শ্রেণি যাদেরকে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে তাদেরকে [প্রলেতারিয়েত] তা শেখানোর। [ফলে] রাশিয়ার জনতোষকদের (জনগণের যারা বন্ধু) সঙ্গে বাহাসে ইতিমধ্যে যে মতটি লেনিন স্পষ্টভাবে সমর্থন করেছেন-যে সমাজ সমগ্র এক দেহের মতো—তা কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না। লাতিন আমেরিকায় এই চিত্রকল্প পৌনঃপুনিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। সাম্প্রতিককালে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, হাইমে পাস সামোরা (Jaime Paz Zamora), সাংবাদিককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে, বলিভিয়ায় বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে শ্রমিকদের এবং পার্টির সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নের সম্পর্ক নির্দেশ করলেন [এই বলে] : "পার্টি হলো গিয়ে মাথা, আর ইউনিয়নসমূহ তার পা।" ধারণাটি অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি ও তাদের জনপ্রিয় ভিত্তিগুলোকে প্রতিনিয়তই প্রভাবিত করে চলেছে।

সামাজিক সমগ্রতার এই অবয়ববাদী (organicist) ধারণা, সমাজ সম্পর্কে, বিষয়ী-বিষয় সম্পর্কের হিসেবে জ্ঞানের সাধারণ চিন্তাকাঠামোর এমনকি তার কোনো রূপভেদের সঙ্গেও সামঞ্জস্যহীন নয়। ব্যক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বাস্তব-অবলোকনের ক্ষেত্রে একে তারা অপরের বিকল্প, কিন্তু তারা রয়ে যায় একই চিন্তাকাঠামোতে। যাইহোক, ঊনিশ শতকে ও বিশ শতকের একটা বড় সময় ধরে, সমাজ পর্যালোচনা ও তার রূপান্তরের প্রস্তাবসমূহ এই অবয়বী ভাবনা (organic view) দ্বারা ঠেকনা পেতে পারত, কারণ পরেরটি ক্ষমতার বিদ্যমানতাকে জাহির করে (manifest) সমাজের সমন্বয়ক হিসেবে। এভাবেই এটি সমাজে ক্ষমতার প্রসঙ্গ প্রতিষ্ঠা ও সেই সম্পর্কিত তর্ক জারি রাখতে ভূমিকা পালন করে।

অন্যদিকে, সেইসব অবয়ববাদী ধারণাসমূহ উপনিবেশবাদের দ্বারা সজ্জিত বিন্যাস (order) সমজাতীয় না-হওয়া সত্ত্বেও ঐতিহাসিকভাবে সমজাতীয় সমগ্রতার পূর্বানুমানকে আরোপ করে। সুতরাং, উপনিবেশিত অংশ সেই সমগ্রতার অভ্যন্তরীণ, নিম্নদেশস্থ, কিছু নয়। এটা সুবিদিত-যে, আলোকায়ন (Enlightenment) কালের ইউরোপে 'মানবতা' ও 'সমাজ'-এর মতো বর্গসমূহ (categories) অ-ইউরোপীয় মানুষ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল না, অথবা তা ছিল কেবলই আনুষ্ঠানিকতায়, নির্দিষ্ট অর্থে এই-ধরনের অভিজ্ঞার আদতে কোনো প্রায়োগিক সার্থকতা ছিল না। যে-কোনো ক্ষেত্রেই, বাস্তবতার অবয়বী চিত্রানুসারে (organic image), সমগ্র অবয়বের মস্তিষ্কস্বরূপ ছিল

শাসনকারী কর্তৃপক্ষ—ইউরোপ, আর পৃথিবীর প্রত্যেকটি উপনিবেশিত ভূখণ্ড—ইউরোপীয়রা। অতি পরিচিত ফাচুকি মন্তব্যটি (claptrap)-যে উপনিবেশিত লোকেরা ছিল 'সাদা মানুষদের বোঝা' (Kipling), সেই চিত্রকল্পের সঙ্গে সরাসরিভাবে যুক্ত।

শেষাবধি, সমগ্রতার ধারণাটি, এইভাবে কর্তৃত্বক্রমানুযায়ী সাজানো বিভিন্ন অংশের মধ্যকার ব্যবহারিক (functional) সম্পর্কের এক অন্তরঙ্গ কাঠামো হিসেবে সমাজের চিত্রকল্প নির্মাণ করেছে যা ঐতিহাসিক সমগ্রতার প্রয়োজনে আগেভাগেই অনুমান করে নিয়েছে অদ্বিতীয় এক ঐতিহাসিক যুক্তিবিদ্যা, এবং সমগ্রতার সেই অদ্বিতীয় যুক্তিবিদ্যায় (unique total logic) প্রতিটি অংশেরই বশ্যতার শর্তে সংগঠিত হয়েছে এক-ধরনের যৌক্তিকতাও। সমাজকে এটি ঐতিহাসিক যৌক্তিকতার সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা বৃহত্তর এক ঐতিহাসিক বিষয়ীরূপে (macro-historical subject) বুঝতে উদ্বুদ্ধ করে, যথারীতি সেটি সমগ্র ও তার অংশগুলোর আচরণ, একইসঙ্গে সময়ের সাথে-সাথে তার অভিমুখ ও বিকাশের চূড়ান্ত অবস্থা সম্পর্কিত ভাবীকথনসমূহেরও অনুমোদন দেয়। সমগ্রতার শাসনকারী অংশরূপে, কোনোভাবে, সেই ঐতিহাসিক যুক্তিবিদ্যাই আবির্ভূত হয়, উপনিবেশিত দুনিয়ার সাপেক্ষে—যা মূলত ইউরোপ। অতঃপর এ আর আশ্চর্যজনক নয়, ইতিহাসকে [যে] বোঝা হয়েছিল আদিম থেকে সভ্য, প্রথাবদ্ধতা থেকে আধুনিকতা; বর্বর থেকে যৌক্তিক; প্রাক-পুঁজিবাদ থেকে পুঁজিবাদ—এইসব বিবর্তনমূলক পরম্পরায়। এবং ইউরোপ নিজেকে বিবেচনা করল, গোটা প্রজাতির মধ্যে ইতিহাসের সর্বোচ্চ বিকশিত পর্যায় হিসেবে, অপরাপর সমাজ ও সংস্কৃতির ভবিষ্যতের দর্পণরূপে। যাইহোক, যা [আর] বিস্ময় ঠেকাতে পারল না, তা হলো ইউরোপ উপনিবেশিত সংস্কৃতির প্রায়োগিক সমগ্রতার ওপর সেই 'মরীচিকা' আরোপণে সফল হয়েছিল; এবং, এর চেয়েও বড় কথা, এই অলীক কল্পনাটিই (chimera) অনেকের কাছে এখনো সমান আকর্ষণীয়।

জ্ঞানতাত্ত্বিক পুনর্গঠন : বি-উপনিবেশায়ন

সমগ্রতার ধারণাটি সাধারণত ইউরোপেই এখন প্রত্যাখ্যাত ও প্রশ্নের সম্মুখীন, শুধুমাত্র বারোমাইস্যা (perennial) অভিজ্ঞতাবাদীদের (empiricists) দ্বারাই নয়, গোটা একটি বুদ্ধিবৃত্তিক মহলের কাছেও নিজেদের যারা উত্তরাধুনিক বলে পরিচয় দেয়। ইউরোপে সমগ্রতার ধারণাটি আসলে

ঔপনিবেশিকতা/ আধুনিকতারই ফসল। এবং এটি দেখানোও সম্ভব, যেমনটা আমরা ওপরে দেখেছি যে, সমগ্রতার ইউরোপীয় ধারণাটি [এক-ধরনের] তাত্ত্বিক সংকোচন (theoretical reductionism) এবং বৃহত্তর এক ঐতিহাসিক বিষয়ীর অধিবিদ্যার দিকে ঠেলে দেয়। তার ওপর, এই-সকল ধারণা অনাকাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক চর্চা ও সমাজের সামগ্রিক যৌক্তিকীকরণের অচেতনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

যাইহোক, ইউরোপীয় আধুনিকতার পরিসরে যে-সকল ধারণা ও চিত্রকল্পের দ্বারা সমগ্রতার বর্গটি গড়ে উঠেছে তা থেকে নিজেকে বিযুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে এর প্রতিটি ধারণাটিকেই বর্জন করতে হবে, এমন কোনো কথা নাই। যা করতে হবে, তা বরং বেশ আলাদা রকমের কিছু : জ্ঞানের উৎপাদন, প্রতিফলন (reflection) ও বিনিময়কে ইউরোপীয় আধুনিকতা/ যৌক্তিকতার চোরাটান (pitfalls) থেকে মুক্ত করা।

'পশ্চিম'-এর বাইরে, কার্যত অধিকাংশ পরিচিত সংস্কৃতিরই—প্রতিটি বিশ্ববীক্ষা, প্রতিটি চিত্রকল্প—জ্ঞানের যাবতীয় পদ্ধতিগত উৎপাদন অখণ্ডতার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু সেই সংস্কৃতিসমূহে, জ্ঞানকাণ্ডের অখণ্ডতার দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্ভুক্ত করে নেয় বাস্তবতার সকল ধরনের বিষমজাতীয়তাকে (heterogeneity); পরেরটির [অ-পশ্চিমের] অহ্রাসযোগ্য, বৈপরীত্যমূলক চরিত্রকে; [তার] বৈধতাকে; অর্থাৎ, সব-রকমের বাস্তবতার উপাদানসমূহের বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের কাম্যতাকে (desirability)—ফলে, তাদের সামাজিক স্বীকৃতিকেই। সামাজিক অখণ্ডতার ধারণাটি, ফলে, কেবল যে অস্বীকারই করে না তা নয়, প্রতিটি সমাজের ঐতিহাসিক বৈচিত্র্য ও সমাজের বিষমজাতীয়তার ধারণার ওপর তা নির্ভরশীলও বটে। অন্যভাবে বললে, বিচিত্র, ভিন্ন—'অপর'-এর ধারণাকে তা যে কেবল খারিজই করে না তা নয়—এটি তার জন্য প্রয়োজনীয়ও বটে। সেই ভিন্নতা 'অপর'-এর অসম প্রকৃতিকে এবং তাই সম্পর্কসমূহের পরম বিশ্লিষ্টতাকে অনিবার্যরূপে সূচিত করে না; না সূচিত করে কর্তৃত্বক্রমের অসমতাকে, না অপরের ওপর সামাজিক অধস্তনতাকে। বৈচিত্র্যসমূহই অবশ্যম্ভাবীরূপে আধিপত্যের ভিত্তি নয়। একই সময়ে—এবং সেই কারণেই—ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক বিষমজাতীয়তা সূচিত করে সম-হাজিরা (copresence) এবং তাদের কোনো একটিকে ঘিরে বিচিত্র-রকম ঐতিহাসিক 'যুক্তিবিদ্যা'র সংযোজন যা

নেতৃস্থানীয় (hegemonic) কিন্তু কোনোভাবেই অদ্বিতীয় নয়। [ফলে] এদিক দিয়ে, সরলীকরণের (reductionism) যাবতীয় পথ বন্ধ, একই রকমভাবে বন্ধ আপন যৌক্তিকতা ও ঐতিহাসিক উদ্দেশ্যবাদে (teleology) সমর্থ বৃহত্তর এক ঐতিহাসিক বিষয়ীর অধিবিদ্যার পথ—ব্যক্তিবর্গ বা কোনো নির্দিষ্ট দলপুঞ্জ, উদাহরণস্বরূপ নেওয়া যাক শ্রেণি, যার বাহক বা মিশনারি হতে পারে।

যৌক্তিকতা/ আধুনিকতার ইউরোপীয় চিন্তাকাঠামোর সমালোচনা করাটা অত্যাবশ্যকীয়—এমনকি, আশু কর্তব্যও বটে। কিন্তু সমালোচনাটা যদি হয় এর সমস্ত বর্গসমূহের সরল নেতিকরণ, বয়ান থেকে বাস্তবতার অবসান, বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে (cognition) সমগ্রতার ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির বিশুদ্ধ নেতিকরণ, তাহলে তা মুশকিলের (doubt) ব্যাপার। যৌক্তিকতা/ আধুনিকতা ও ঔপনিবেশিকতার মধ্যকার যে সংযোগ তা থেকে নিজেকে মুক্ত করাটা জরুরি, প্রথমত, এবং সুনির্দিষ্টভাবে যাবতীয় ক্ষমতা থেকে—যা মুক্ত জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সংগঠিত হয়নি। এটি ক্ষমতার উদ্দেশ্যে, সর্বাগ্রেই ঔপনিবেশিক ক্ষমতা, যুক্তিসমূহের (reasons) যান্ত্রিকীকরণ (instrumentalisation) যা গড়ে তুলেছে জ্ঞানের বিকৃত চিন্তাকাঠামো এবং নস্যাৎ করেছে আধুনিকতার মুক্তিদায়ী প্রতিশ্রুতিসমূহকে। সুতরাং, এর বিকল্পটি স্পষ্ট : বৈশ্বিক ক্ষমতার ঔপনিবেশিকতাকে ধ্বংস করা। অভিজ্ঞতা ও ভাব বিনিময়ের পথকে প্রশস্ত করতে, নয়া আন্তঃসাংস্কৃতিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায়, যৌক্তিকতার আরেক ভিত্তিস্বরূপ, বি-উপনিবেশিকতা (decoloniality) হিসেবে, সবার আগে প্রয়োজন জ্ঞানতাত্ত্বিক[১৩] (epistemological) বি-উপনিবেশায়ন[১৪] (decolonization) বৈধভাবেই যা দাবি করবে কতিপয় সর্বজনীনতা। নির্দিষ্ট কোনো নৃগোষ্ঠীর (ethnie) বিশেষ বিশ্ববীক্ষাকে সর্বজনীন (universal) যৌক্তিকতাস্বরূপ দাবি করার চেয়ে, পরিশেষে, অযৌক্তিক আর কিছুই হতে পারে না; এমনকি এই-ধরনের কোনো নৃগোষ্ঠীকে যদি পশ্চিম-ইউরোপ নামেও ডাকা হয়—কেননা, এটি আসলে প্রাদেশিকতাকেই (provincialism) সর্বজনীনতা (universalism) রূপে আরোপণের দাবি করা।

ঔপনিবেশিকতার নাগপাশ থেকে আন্তঃসাংস্কৃতিক (intercultural) সম্পর্কসমূহের মুক্তি সর্বসাধারণের, এককভাবে অথবা সামষ্টিকভাবে, বিভিন্ন

সাংস্কৃতিক উপস্থাপনার মধ্য থেকে, সর্বোপরি, সমাজ ও সংস্কৃতির উৎপাদন, পর্যালোচনা, পরিবর্তন ও বিনিময়ের উপায় বেছে নেওয়ার স্বাধীনতাকে সূচিত করে। এই-ধরনের মুক্তি—অসমতা, বৈষম্য, শোষণ ও আধিপত্য হিসেবে সুবিন্যস্ত যাবতীয় ক্ষমতা থেকে—সামাজিক মুক্তি প্রক্রিয়ারই অংশ।

[ইংরেজি অনুবাদের] টীকা

মূল স্প্যানিশ ভাষা থেকে সোনিয়া থেরবর্ন কর্তৃক অনূদিত। প্রবন্ধটি মূলত প্রকাশিত হয়েছিল: *Globalizations and Modernities. Experiences, Perspectives and Latin America*, Stockholm, FRN-Report, 99: 5, 1.

* কিহানোর 'নরগোষ্ঠী' সম্পর্কিত ভাবনার উৎস ধরে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। দেখুন কিহানো (১৯৯২)।

** লাতিন আমেরিকার জন্য, দেখুন কিহানো (১৯৯৩)।

[ইংরেজি অনুবাদের] তথ্যসূত্র

Quijano, Anibal (1992) 'Raza, Etnia y Nacion: Cuestiones Abiertas', in *JoseCarlosMariateguiyEuropa*, ed. Roland Forgues, La otracaradelDescubrimiento, Liina, Amauta, Peru.

—(1993) 'America Latina en Ia Economia Mundial', in *Problemas dcl Desarrollo, Revista del Instituto de Investigaciones de Ia Facultad de Econornja*, UNAM, vol. XXIV, no. 95, Mexico.

(বাংলা অনুবাদের) তথ্যসূত্র ও টীকা

১. কিহানোর 'Colonialidad y Modernidad/ Racionalidad' প্রবন্ধটির প্রথম প্রকাশ ১৯৯১ সালে। (https://globalsocialtheory.org/thinkers/ quijano-anibal/)। ১৯৯২ সালে এটি প্রকাশিত হয় *Perú Indígena (Lima)* পত্রিকায়। স্প্যানিশ থেকে সোনিয়া থেরবর্ন (Sonia Therborn) ইংরেজিতে এর অনুবাদ করেন—Coloniality and Modernity/ Rationality শিরোনামে। থেরবর্নের অনুবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল ইয়োরান থেরবর্ন (Göran Therborn) সম্পাদিত *Globalizations and Modernities. Experiences, Perspectives and Latin America* গ্রন্থে। যে বইটি আসলে ১৯৯৮ সালের ২৮ জুন থেকে ১ জুলাই অবধি সংঘটিত বুয়েনস আইরেস সম্মেলনের রিপোর্ট। বুয়েনস আইরেস সম্মেলনটি ছিল বুদাপেস্ট, ইস্তাম্বুল, ভিলনিয়াস, বেইজিং ও স্টকহোমে অনুষ্ঠিত সম্মেলনগুলোরই পরম্পরা। যাইহোক, সেই মূল অনুবাদটিকে বর্তমান বাংলা অনুবাদের কাজে ব্যবহার করার সুযোগ হয়নি। এখানে অনুসৃত হয়েছে ২০০৭ সালের *Cultural Studies* পত্রিকার ২১ নম্বর ভলিউমের দ্বিতীয় সংখ্যায়

প্রকাশিত অনুবাদটি। পরে অবশ্য সেই একই অনুবাদ ২০১০ সালে ওয়াল্টার দে মিগনোলো ও আরতুরো এসকোবার সম্পাদিত *Globalizations and the Decolonial Option* গ্রন্থেও ছাপা হয়।

২. https://globalsocialtheory.org/thinkers/quijano-anibal/

৩. তথ্যগুলো উইকিপিডিয়া থেকে নেওয়া। নিচে এর লিঙ্ক দেওয়া হলো: https://en.wikipedia.org/wiki/An%C3%ADbal_Quijano#:~:text=An%C3%ADbal%20Quijano%20(17%20November%201930,decolonial%20studies%20and%20critical%20theory.

৪.https://www.scielo.br/j/cint/a/9BxwGvYxjb6YWswTpddQ9Hm/?format=pdf&lang=en

৫. https://www.lavaca.org/wp-content/uploads/2016/04/quijano.pdf

৬.https://pybarra.weebly.com/uploads/6/8/7/0/687099/__quijano_coloniality_and_modernity_rationality.pdf

৭. 'আমরা অনুভবে যাহা পাই, তাহা বুদ্ধি দ্বারা কতিপয় বিশিষ্ট প্রকারে সম্বদ্ধ হইয়া আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়। যেসব বিশিষ্ট প্রকারে সম্বদ্ধ হইয়া পদার্থ আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়, সেসব প্রকারের দ্বারা বিষয়ের প্রকারভেদ নির্ণীত হয়, একথাও বলিতে পারা যায়। অন্তত বিখ্যাত গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল পদার্থের প্রকারভেদ নির্দেশের জন্য যে শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, সেই শব্দ কান্ট সম্বন্ধাত্মক বৌদ্ধিক প্রকারের জন্য ব্যবহার করিয়াছেন। বুদ্ধিদ্বারা যে সব কতিপয় বিশিষ্ট প্রকারে সম্বদ্ধ হইয়া পদার্থ আমাদের লৌকিক জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহাদিগকে এখানে বৌদ্ধিক প্রকার বলা হইতেছে। এই অর্থে কান্ট ক্যাটিগরি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন (রাসবিহারী, ২০১১ : ৪৩)।' অ্যারিস্টটল যে অর্থে category-শব্দটাকে ব্যবহার করেছেন, কান্ট কিন্তু ঠিক সেই অর্থে শব্দটি প্রয়োগ করেননি—তারপরও দুইয়ের মধ্যে অর্থগত যোগ কিছুটা রয়েছেই (রাসবিহারী, ২০১১ : ৪৩)। ফলে, এই থেকে পশ্চিমা দর্শনশাস্ত্রে ব্যবহৃত category-শব্দটির অর্থ আমরা মোটামুটি অনুমান করে নিতে পারি। রমেন্দ্রনাথ ঘোষ এর অর্থ করেন—'জাতি প্রকার'। ক্যাটিগরি বোঝাতে 'বর্গ' শব্দটি ইদানীং প্রায় প্রচলিত। তাই, ক্যাটিগরি অর্থে 'বর্গ' শব্দের প্রতি আমাদের রায় না-থাকা সত্ত্বেও—পারস্পরিক চিন্তাসূত্রে গিঁট লাগানোর স্বার্থে— 'বর্গ' শব্দটিই এখানে ব্যবহৃত হচ্ছে।

৮. এই বাক্যে *Perú Indígena* (Lima) প্রত্রিকায় ১৯৯২ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধটির মূল স্প্যানিশ সংস্করণের সঙ্গে ২০০৭ সালের *Cultural Studies* পত্রিকায় অনূদিত ইংরেজি প্রবন্ধের অমিল রয়েছে। '…while at the same time the colonizers were expropriating from the colonized their knowledge, specially in mining, agriculture, engineering, as well as their products and work.'—এই অংশটুক মূল প্রবন্ধে নেই। অর্থাৎ, উপনিবেশিতদের নিজস্ব জ্ঞানাভিজ্ঞতা, বিশেষ করে

খনি-শিল্প, কৃষি, প্রকৌশল, উপরন্তু পণ্য ও শ্রম থেকে দখলচ্যুত করার প্রসঙ্গ সেখানে অনুপস্থিত।

৯. *Perú Indígena* সংস্করণে পুরো বাক্যটি এই—Era un modo de participar en el poder colonial pero tambien podia servir para destruirlo y, despues, para alcanzar los mismos beneficios materiales y el mismo poder que los europeos; para conquistar la naturaleza. En fin, para el "desarrollo". থেরবর্ন এর অনুবাদ করেছেন—It was a way of participating and later to reach the same material benefits and the same power as the Europeans: viz, to conquer nature — in short for 'development'. অর্থাৎ, 'pero tambien podia servir para destruirlo' অংশটুকু নেই। ইংরেজিতে যার অর্থ দাঁড়ায়—but it could also be used to destroy it।

১০. বাংলা অনুবাদে বাক্যটাকে যেন জুতমতো ধরা গেল না। থেরবর্নের অনুবাদে ইংরেজিটা এরকম—Henceforth, the survivors would have no other modes of intellectual and plastic or visual formalized and objectivised expressions, but through the cultural patterns of the rulers, even if subverting them in certain cases to transmit other needs of expression.

১১. 'Race'-এর ধারণা মানুষকে আসলে কতগুলো মানদণ্ডে ভাগ করে দেখাকে সূচিত করে। এর নেপথ্যের সিদ্ধান্তসমূহ হলো : এক—জাতিসমূহ কতিপয় জৈবিক ভিতের প্রতিনিধিত্ব করে, এটা হতে পারে অ্যারিস্টটলীয় নির্যাস (essence) বা আধুনিক জিন (gene) অর্থে; দুই—এই জৈবিক ভিত জাতিগত পৃথক দলসমূহ গঠন করে, বিষয়টা এমন-যে কোনো একটা জাতির সবাই এবং কেবল সবাই এমন এক-সেট জৈবিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যা অপরাপর জাতিসমূহের কেউ ধারণ করে না; তিন—প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে এই জৈবিক ভিত বাহিত হয়ে নির্ণয়কারীকে বংশ বা কুলজি ধরে কারও জাতি চিনে ফেলার সুযোগ করে দেয়; চার—বংশগত তদন্তে অবশ্যই জাতিটির ভৌগোলিক উৎসের নাগাল থাকা চাই, যেমন আফ্রিকা, ইউরোপ, এশিয়া, অথবা উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা; পাঁচ—প্রবাহিত এই জাতিগত জৈবিক ভিত প্রথমত গায়ের রং, চোখের গড়ন, চুলের বাহার, হাড়ের গঠন ইত্যাদি শারীরিক ফেনোটাইপগুলোর [পরিবেশের সঙ্গে জেনোটাইপের মিথস্ক্রিয়ার অঙ্গজ রূপ] মাধ্যমে প্রকাশ লাভ করে, বুদ্ধিমত্তা বা দুষ্কৃতির মতো আচরণগত ফেনোটাইপগুলো দ্বারাও তার প্রকাশ সম্ভব (James and Adam : 2022)। বাংলা ভাষায় 'Race'-এর প্রতিশব্দ অনেক। কিন্তু কোনো শব্দ দিয়েই জুত মতো তাকে ধরা যায় না—কেবল পিছলে যায়। বর্তমান অনুবাদেই একে বর্ণ, জাতি, জনগোষ্ঠী ইত্যাদি শব্দে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

১২. বাংলা একাডেমির ইংরেজি-বাংলা অভিধানে 'Rationality' শব্দটির অর্থ দেওয়া আছে—যুক্তিসম্পন্নতা; যৌক্তিকতা। তবে এই অনুবাদে 'Rationality'-র বদলে

'যৌক্তিকতা' বসিয়ে দিলেই কিন্তু কাজ ফুরিয়ে যায় না—কারণ, বাংলা ভাষায় 'যৌক্তিকতা' শব্দটি এখনো উপর্যুক্ত (কিহানো যে অর্থে ব্যবহার করেছেন) জ্ঞানতাত্ত্বিক ব্যঞ্জনা বহন করে না। 'Rationality'—'Reason'-শব্দজাত। 'Reason'-অর্থে 'যুক্তি' শব্দের সঙ্গে আমরা পরিচিত। ফলে, 'যৌক্তিকতা' বলতে এখানে বোঝাচ্ছে—যুক্তির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সত্তার গুণপনা—the quality of being based on or in accordance with reason or logic. কিহানোর চিন্তায় যে যুক্তি গড়নে-গঠনে আগাগোড়া ইউরোকেন্দ্রিক।

১৩. ইংরেজি 'epistemology' শব্দটাকেই আমরা বাংলা করে নিই—জ্ঞানতত্ত্ব। জ্ঞানতত্ত্ব হলো জ্ঞান সম্পর্কিত তত্ত্ব—theory of knowledge। অর্থাৎ, খোদ 'জ্ঞান' জিনিসটাই কী? কী প্রকারে তা অর্জিত হয়? এর সীমাবদ্ধতা আছে কি নেই—এইসব নিয়ে তত্ত্ব। দর্শনের অন্যান্য প্রপঞ্চের মতো তাই জ্ঞানের ক্ষেত্রেও কোনো একক এবং সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত নেই। এই মর্মেই জ্ঞানের প্রশ্নে যুক্তিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদের মতো ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বের বিকাশ (সরদার, ২০১৭ : ১৫৫)। গোবিন্দচন্দ্র দেব একে 'ধী-বিদ্যা' পারিভাষিক নামে পরিচয় করিয়ে দেন। তার ভাষায়, 'ধী-বিদ্যা ইংরেজী এপিস্টেমলোজী শব্দের বাংলা তরজমা।... জ্ঞানের উৎপত্তি কোথা থেকে হয়, সে জ্ঞানের পরিধি কতখানি এবং সে জ্ঞান সত্যই বিশ্বাস্য কিনা, এইসব প্রশ্নের আলোচনা ধী-বিদ্যায় হয়ে থাকে।... তত্ত্ববিদ্যা [মেটাফিজিক্স্] যে দুরূহ কাজে প্রবৃত্ত, সমালোচনী মনোবৃত্তি নিয়ে সে দুরূহ কাজ সমাপনের শক্তি আমাদের বুদ্ধির আছে কিনা, তা' বের করাই ধী-বিদ্যার কাজ (গোবিন্দচন্দ্র, ২০০৪ : ৩৯-৪০)। রমেন্দ্রনাথ ঘোষ এর অনুবাদ করেন—জ্ঞানবিদ্যা (রমেন্দ্রনাথ, ২০১৪ : ১২৯)।

১৪. বি-উপনিবেশায়নকে আমরা যেভাবেই বুঝতে চাই না কেন, এটি-যে উপনিবেশায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত, এই প্রতিজ্ঞা (proposition) আমরা এড়িয়ে যেতে পারব না। এখন কথা হলো—কীভাবে তা সম্পর্কিত। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কেননা, এই প্রশ্নেই বি-উপনিবেশায়নের চিন্তাগত ফারাকগুলো তৈরি হয়। অর্থাৎ, একেক ধরনের বি-উপনিবেশায়ন একেকভাবে উপনিবেশায়নের সঙ্গে তার সম্পর্ক নির্ধারণ করে। যেমন, এক-ধরনের বি-উপনিবেশায়ন নির্দেশ করে ঔপনিবেশিক পর্বের রাজনৈতিক পরিসমাপ্তি। ফলে, এটি নির্দেশ করে কালগত সম্পর্ক। তেমনি, কোনোটি বোঝায় ঔপনিবেশিক ও উত্তর-ঔপনিবেশিক দুই পর্বেরই উপনিবেশ-বিরোধী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক লড়াই। যা দ্বারা উপনিবেশায়নের সঙ্গে বি-উপনিবেশায়নের পাল্টাপাল্টি সম্পর্ক প্রকাশিত হয়। অনুরূপভাবে, উপনিবেশায়নের সঙ্গে আরেক প্রকার বি-উপনিবেশায়ন স্থাপন করে জ্ঞানতাত্ত্বিক সম্পর্ক। সেই প্রকার বি-উপনিবেশায়ন ঔপনিবেশিক জ্ঞানতত্ত্বের পুনর্গঠন নির্দেশ করে। ঔপনিবেশিক জ্ঞানতত্ত্বের জবরদস্তির ফলে চাপা-পড়া অপরাপর সমকক্ষ জ্ঞানতত্ত্বের আবির্ভাবকে তা স্বাগত জানায়—এক-প্রকার সর্বজনীনতার বদলে তা দাবি করে কতিপয় সর্বজনীনতা। অর্থাৎ, বি-উপনিবেশায়ন নানা রকমের। সেই সূত্রে উপনিবেশায়নের সঙ্গে বি-উপনিবেশায়নের নির্ধারিত সম্পর্কও অভিন্ন নয়। বাংলাদেশের বিউপনিবেশায়ন তত্ত্বও কিন্তু উপনিবেশায়নের সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতেই অপরাপর বি-উপনিবেশায়ন চিন্তা থেকে আলাদা হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের বিউপনিবেশায়ন উপনিবেশায়নের সঙ্গে স্থাপন

করেছে সমস্যাকেন্দ্রিক সম্পর্ক। ফলে, উপনিবেশায়ন যেখানে সমস্যা সেখানেই কেবল তা কার্যকর। উপনিবেশায়নের ঢালাও বিরোধিতা তা করে না (মনিরুল, ২০২১ : ১২৬-৭৭)। বাংলাদেশের বিউপনিবেশায়নকে অপরাপর বি-উপনিবেশায়ন থেকে চোখের দেখায় আলাদা করার জন্য হাইফেনের ব্যবহারটাকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ করে তুলছি। আমরা হাইফেন ব্যবহার করি না। এর একাধিক কারণ রয়েছে (মনিরুল, ২০২১)। তাছাড়া, শুরুর দিকে অপরাপর 'ডিকলোনাইজেশন' হাইফেন সহযোগে অনূদিত হয়েছে—বি-উপনিবেশায়ন। তাই হাইফেন সহযোগে বি-উপনিবেশায়ন বলতে আমরাও অপরাপর ডিকলোনাইজেশনকেই নির্দেশ করি।

সহায়কপঞ্জি

গোবিন্দচন্দ্র, ২০০৪ গোবিন্দচন্দ্র দেব, *তত্ত্ববিদ্যা-সার*, ঢাকা, অধুনা প্রকাশন।

মনিরুল, ২০২১ মনিরুল ইসলাম, 'সৈয়দ নিজারের সুলতান পাঠ : প্রসঙ্গ বিউপনিবেশায়ন', *রাষ্ট্রচিন্তা*, ৭ম খণ্ড (বর্ষ ৬, সংখ্যা ৯) (সম্পা.) হাবিবুর রহমান, ঢাকা।

রমেন্দ্রনাথ, ২০১৪ রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, *দার্শনিক প্রবন্ধাবলি*, (সম্পা.) হাসান আজিজুল হক ও মহেন্দ্রনাথ অধিকারী, ঢাকা, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ।

রাসবিহারী, ২০১১ রাসবিহারী দাস, *কান্টের দর্শন*, ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন।

সরদার, ২০১৭ সরদার ফজলুল করিম, *দর্শনকোষ*, ঢাকা, প্যাপিরাস।

Gandarilla, García-Bravo & Benzi, 2021 José Guadalupe Gandarilla Salgado, María Haydeé García-Bravo, Daniele Benz, 'Two Decades of Aníbal Quijano's Coloniality of Power, Eurocentrism and Latin America', *Contexto Internacional*, Vol. 43 (1)

Maldonado-Torres, 2010 Nelson Maldonado-Torres, 'On the Coloniality of Being: Contributions to the Development of a Concept', *Globalization and the Decolonial Option*, Ed. Walter D. Mignolo & Arturo Escobar, London & New York, Routledge.

Mignolo, 2018 Walter D. Mignolo & Catherine E. Walsh, *On Decoloniality*, Durham & London, Duke University Press.

James and Adam, 2022 James, Michael and Adam Burgos, "Race", ***The Stanford Encyclopedia of Philosophy*** (Spring 2022 Edition), Edward N. Zalta (ed.) URL =<https://plato.stanford.edu/archives/spr2022/entries/ race/>.

ঔপনিবেশিক ভারতের ইতিহাস-রচনার কতিপয় দিক প্রসঙ্গে

মূল: রণজিৎ গুহ

অনুবাদ: ইয়ামিন রহমান

সম্পাদকের ভূমিকা

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ রণজিৎ গুহ-র জন্ম তৎকালীন পূর্ববঙ্গের বাকেরগঞ্জের সিদ্ধকাটি গ্রামে (বাকেরগঞ্জ উপজেলা বর্তমান বাংলাদেশের বরিশাল জেলায় এবং সিদ্ধকাটি গ্রাম বর্তমান বাংলাদেশের ঝালকাঠি জেলার অন্তর্গত), ১৯২৩ সালের মে মাসে। তিনি এমন একজন ভারতীয় ইতিহাসবিদ যাঁর কাজের প্রভাব বিশ্বজুড়ে নানা শাস্ত্রে বহুল স্বীকৃত। ভারত এবং আরও বিস্তৃত পরিসরে দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস রচনা ও চর্চার এমন এক পদ্ধতি তিনি শুরু করেছিলেন, যা বিদ্যাজগত ও ক্রিটিক্যাল রাজনৈতিক অঙ্গনে বিপুল আলোচনার জন্ম দিয়েছে। ভারত ও দক্ষিণ এশিয়ার সমাজ-ইতিহাস চর্চার গণ্ডি ছাড়িয়ে গুহ সূচিত সাবলটার্ন স্টাডিজ নিয়ে আলোচনা এখন বিশ্বের প্রায় সমস্ত আঞ্চলিক ইতিহাস-রচনার ক্ষেত্রেই শুনতে পাওয়া যায়। লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ঐতিহাসিক-সমাজবিজ্ঞানীরা অনেকেই স্বতন্ত্রভাবে তাঁদের নিজস্ব সাবলটার্ন স্টাডিজ গোষ্ঠী তৈরি করেছেন।[১]

গত শতাব্দীর আশির দশকে সেই সময়ের বিচারে নিতান্তই অপরিচিত ও তরুণ গবেষকদের নিয়ে 'সাবলটার্ন স্টাডিজ' নামে যে প্রকল্প গুহ শুরু করেছিলেন, বিশ্বজুড়ে আজ তা সমাদৃত এবং আলোচনা-সমালোচনা-বিতর্ক মিলিয়ে ইতিহাস পঠন-পাঠনের প্রতিষ্ঠিত এক পদ্ধতি। ইতিহাসবিদ রণজিৎ গুহকে আলোচিত নিম্নবর্গের ইতিহাস অধ্যয়ন তথা সাবলটার্ন স্টাডিজ গ্রুপের 'গুরু' হিসেবে মান্য করেন খোদ এই গ্রুপে তাঁর সহ-ইতিহাসবিদেরা। সাবলটার্ন স্টাডিজ গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে অনেকেরই লেখাপত্র প্রথম প্রকাশিত হয় সাবলটার্ন স্টাডিজের কালেক্টিভ ভলিউমে।

প্রতিষ্ঠিত ও প্রভাবশালী ইতিহাস ও তাত্ত্বিক-ঘরানার বিরোধিতা করেই সাবলটার্ন

স্টাডিজের যাত্রা শুরু হয়েছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাস-চর্চার বিদ্যমান সমস্ত ঘরানাই উচ্চবর্গের প্রতি পক্ষপাতী—শুরুর দিকের এই দ্যর্থহীন ঘোষণা ছিল এই গ্রুপের অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব ও অভিনবত্ব। আধুনিক দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গ এই দুই ধারায় দ্বিধাবিভক্ত এবং এই দুই ধারার মধ্যকার অস্থির-জটিল-বহুমাত্রিক সম্পর্ক বিদ্যমান সাবলটার্ন স্টাডিজের এই বক্তব্যও আজতক অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে আছে। আধুনিক রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রত্যেক অলিগলি যে নিম্নবর্গের স্বকীয়তা, স্বতন্ত্র চৈতন্য ও নিজস্ব উদ্যোগের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে ইতিহাস-রচনার উচ্চবর্গীয় ঝোঁক তা কখনো স্বীকার করেনি। কাজেই নিম্নবর্গের দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিক ভারতের ইতিহাস রচনা করার গুরুদায়িত্ব ইতিহাসবিদদের নিতে হবে গুহ যেন সেই অনিবার্য সত্যই মনে করিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য সাবলটার্ন স্টাডিজ তিন দশক ধরে গ্রুপ হিসেবে ক্রিয়াশীল থাকার গোটা সময়জুড়ে নানা বাঁকবদল ও নতুন নতুন প্রকল্প হাজির করেছে। নিম্নবর্গের চৈতন্য ও স্বকীয়তার সুলুকসন্ধান থেকে শুরু হলেও এক পর্যায়ে উচ্চবর্গের রাজনীতিতে কীভাবে নিম্নবর্গের উপস্থাপন ও নির্মাণ হয়ে থাকে সেইদিকে এই গ্রুপকে অধিক মনোযোগ দিতে দেখা যায়।

বর্তমান রচনাটি গুহ-র বিখ্যাত প্রবন্ধ "On Some Aspects of the Historiography of Colonial India" শীর্ষক প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ। এই প্রবন্ধকে রণজিৎ গুহ-র অন্যতম সিগনেচার প্রবন্ধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ এই প্রবন্ধেই গুহ সর্বপ্রথম উচ্চবর্গের ইতিহাস-রচনার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন এবং নিম্নবর্গের ইতিহাস-রচনার পদ্ধতির শিথিল রূপরেখা হাজির করেছেন। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালে, সাবলটার্ন স্টাডিজ কালেক্টিভ ভলিউমের প্রথম খণ্ডে।[২] নাতিদীর্ঘ এই রচনাটিকে পরবর্তীতে অনেকেই নিম্নবর্গের ইতিহাস-চর্চার 'মেনিফেস্টো' হিসেবে অভিহিত করেন। অন্তত দুটি কারণে এই প্রবন্ধ ক্লাসিকের মর্যাদা পেয়েছে। একটির কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। আধুনিক ভারতের জাতীয়তাবাদ যে মূলত দুটি বিবদমান – ঔপনিবেশিক ও বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী – উচ্চবর্গীয় গোষ্ঠীর ঝগড়া এই অমোঘ সত্য উচ্চারণের মাধ্যমে শুরু হয়েছে গুহ-র প্রবন্ধ। এ বিষয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> স্মরণ করা যেতে পারে, ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে দুটি বিবদমান গোষ্ঠীর ঝগড়া এই সময়ে তুঙ্গে। একদিকে কিছু ব্রিটিশ ও মার্কিন ঐতিহাসিক দেখাবার চেষ্টা করছিলেন, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ আসলে মুষ্টিমেয় কিছু উচ্চবর্গের নীতিহীন আদর্শহীন ক্ষমতা দখলের কৌশল মাত্র। চিরাচরিত জাতি-ধর্ম-সাম্প্রদায়িক আনুগত্যের বন্ধনকে কাজে লাগিয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে সেখানে শুধু ব্যবহার করা হয়েছিল। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকেরা এর তুমুল প্রতিবাদ করে বলেছিলেন জাতীয়তাবাদী আদর্শের কথা, জাতীয়তাবাদী নেতাদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের কথা, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ব্যাপক

> জনসাধারণের অংশগ্রহণের কথা। রণজিৎ গুহ-র প্রবন্ধে ঘোষণা করা হলো, এই দুটি ইতিহাস আসলে উচ্চবর্গীয় দৃষ্টিভঙ্গি-প্রসূত, কারণ দুটি ইতিহাসই ধরে নিয়েছে যে জাতীয়তাবাদ হলো উচ্চবর্গের ক্রিয়াকলাপের ফসল। বিবাদ শুধু সেই ক্রিয়াকলাপের নৈতিক চরিত্র নিয়ে—তা সংকীর্ণ ব্যক্তি বা শ্রেণিস্বার্থের সাময়িক যোগফল, নাকি আদর্শ আর স্বার্থত্যাগের জাদুকাঠির স্পর্শে ব্যাপক জনসাধারণের চেতনার উন্মেষ। এই দুটি ইতিহাসের কোনোটাতেই জনগণের নিজস্ব রাজনীতির কোনো স্থান নেই।[৩]

সুতরাং, সাম্রাজ্যবাদী আর জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের বিরোধিতার পথ ধরেই যে রণজিৎ গুহ তাঁর নেতৃত্বাধীন গ্রুপের ইতিহাস প্রকল্পের প্রথম কর্মসূচি নির্দিষ্ট করবেন এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। অন্যত্র গুহ বলছেন, সেই সময়ে তাঁর প্রধান নিশানা ছিল দক্ষিণ এশীয় ইতিহাসের উচ্চবর্গীয় দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা :

> The critique of elitism in South Asian historiography was central to my concern at the time.[৪]

উচ্চবর্গীয় ইতিহাস-রচনা পদ্ধতির সমালোচনা, বিরোধিতা ও পর্যালোচনা কেন জরুরি? কারণ দক্ষিণ এশিয়াসহ অপরাপর উপনিবেশিত অঞ্চলের নিজস্ব ইতিহাসকে আত্মসাৎ করা ব্যতীত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা রীতিমতো অসম্ভব ছিল। কাজেই, গুহ-র এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় তাৎপর্য এই যে, দক্ষিণ এশিয়ার ঐতিহাসিক ও গবেষকদের তিনি দক্ষিণ এশিয়ার নিজস্ব ইতিহাস-রচনায় হাত লাগাতে আহবান জানাচ্ছেন, সেই ইতিহাস নিশ্চিতভাবেই ব্যাপক সংখ্যক জনগণকে বিবেচনায় নিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে তাদের অবদান ও ভূমিকাকে প্রাপ্য সম্মান বুঝিয়ে দেবে।

বিখ্যাত দার্শনিক ওয়াল্টার বেঞ্জামিন একদা বলেছিলেন "to brush history against the grain" তথা ইতিহাসের তুলিকে প্রতিষ্ঠিত-প্রভাবশালী স্রোতের বিপরীতে টানা জনগণের পক্ষের ইতিহাসবিদের ওপর অর্পিত ঐতিহাসিক দায়িত্ব।[৫] সচেতন পাঠক মাত্রই এই প্রবন্ধসহ রণজিৎ গুহ-র তামাম ইতিহাস-প্রকল্পে বেঞ্জামিনের সেই অমোঘ বাণীরই প্রতিধ্বনি টের পাবেন।

সাবলটার্ন স্টাডিজের ইতিহাস প্রকল্পে নানা বাঁকবদল লক্ষ করা যায়। তার মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ আদিকল্পগত পরিবর্তন সংঘটিত হয় গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের বিখ্যাত প্রবন্ধ "Can the Subaltern speak?" প্রকাশিত হবার পর। স্পিভাক সাবলটার্ন স্টাডিজের শুরুর দিকের বেশ কিছু অনুমানকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন। পার্থ চট্টোপাধ্যায়, দীপেশ চক্রবর্তী, জ্ঞান প্রকাশসহ প্রায় সকল সাবলটার্ন ইতিহাসবিদ স্বীকার করেন যে স্পিভাকের ইন্টারভেনশনের আগের সাবলটার্ন স্টাডিজ আর পরের সাবলটার্ন স্টাডিজ আর একই রকম থাকেনি। "ক্যান দ্যা সাবলটার্ন স্পিক?" প্রবন্ধটি লেখার আগেই গায়ত্রী স্পিভাক পশ্চিমের বিদ্যাজগতে

রীতিমতো প্রভাবশালী হয়ে উঠেছেন। তাঁর নিজের ভাষায় তিনি ততদিনে 'ইউরোপিয়ানিস্ট' তথা ইউরোপ-বিশারদ। ফরাসি দার্শনিক দেরিদার *Of Grammatology* ইংরেজিতে অনুবাদ করে গোটা বিশ্বে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। সেই সময়ে, অর্থাৎ সত্তর দশকের শেষের দিকে এবং আশির দশকের শুরুর দিকে, ইংল্যান্ডের সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রণজিৎ গুহ বাংলা ও দিল্লি অঞ্চলের কতিপয় তরুণ ইতিহাস গবেষকদের সাথে তাঁর আসন্ন ইতিহাস প্রকল্পের ছক কষছেন; আর অন্যদিকে, 'ইউরোপিয়ানিস্ট' গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক তাঁর নিজের অঞ্চল, নিজের মানুষ, নিজের শ্রেণি, যেখান থেকে তিনি উঠে এসেছেন, সেই মানুষদের কাছে ফিরতে চাইছিলেন। আমরা দাবি করব, এই দুই ঘটনার প্রতিচ্ছেদেই "ক্যান দ্যা সাবলটার্ন স্পিক?" নামক কালজয়ী প্রবন্ধের জন্ম। প্রাথমিক পর্যায়ে ফুকো-দেল্যুজদের মতো প্রভাবশালী পশ্চিমা দার্শনিকদের সাথে নিজের দ্বিমত বিধৃত করার পরিকল্পনা থেকে রচিত "Power and Desire" (১৯৮৩) নামক প্রবন্ধটি যে পরবর্তীতে "ক্যান দ্যা সাবলটার্ন স্পিক?" শিরোনামে প্রকাশিত হলো তার একটি বড় কারণ রণজিৎ গুহ-র বর্তমান প্রবন্ধটি। স্পিভাকের জবানে:

> I mention this because when I gave "Power and Desire", the first version of "Can the subaltern speak?" I had read Gramsci's "Some Aspects of the Southern Question," but I read Ranajit Guha's "On Some Aspects of the Historiography of Colonial India", only a year later. When I read Guha's essay I was so overwhelmed by the work of the Subaltern Studies group, which he headed, that I pulled my piece, I pulled my act of private piety, that I had performed to get myself out of the prison house of just being a mere Europeanist, and pushed it into the subaltern enclave. I recoded the story. I learned to say that "the subaltern is in the space of difference," following a wonderful passage in Guha.[৬]

অর্থাৎ, স্পিভাকের বিখ্যাত প্রবন্ধটি সাবলটার্ন স্টাডিজের আদিকল্পগত বাঁকবদলে প্রভাব রেখেছে এ কথা যেমন সত্যি, পাশাপাশি এটাও সত্যি যে, গুহ-র প্রবন্ধ পাঠের পরে খোদ স্পিভাক তাঁর গল্পটি আর আগের মতো রাখতে পারেননি। তাঁকে 'রিকোড' করতে হয়েছে। অবশ্য এটাও ঠিক যে, সাবলটার্নিটি তথা নিম্নবর্গত্ব ধারণাটি গুহ ও স্পিভাকে দুই ধরনের নির্মাণের মধ্য দিয়ে গেছে। এই পরিসরে সেই আলোচনার সুযোগ নেই।

দুই

এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে রণজিৎ গুহ-র কহতব্য কী? যারা জনগণের পক্ষের রাজনীতি,

বুদ্ধিজীবীতা ও ইতিহাসচর্চা করবেন, রণজিৎ গুহ মূলত তাঁদের জন্য এই প্রবন্ধে বেশ কিছু অন্তর্ভেদী দিকনির্দেশনা হাজির করেছেন। ঔপনিবেশিক ভারতীয় রাষ্ট্র এবং ঔপনিবেশিকতার ভাব-স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যযুক্ত বর্তমান রাষ্ট্র সম্পর্কে সম্যক বোঝাপড়া গড়ে তুলতে বেশ কিছু সূত্র এই প্রবন্ধ থেকে পাওয়া যাচ্ছে। তবে নিম্নবর্গ তথা জনগণের রাজনৈতিক চৈতন্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে-যে কোনো চূড়ান্ত কথা বলা যায় না রণজিৎ গুহ অবশ্যই সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন। এ কারণেই তিনি কোনো অলঙ্ঘনীয় ফতোয়া বা ফর্দ পেশ করেননি। পরিস্থিতি মোতাবেক যে নানা কিছুই বদলাতে পারে এবং সংশ্লিষ্টদের-যে সে অনুযায়ী কৌশল নির্ধারণ করতে হতে পারে, এ ব্যাপারে গুহ নিঃসংশয় ছিলেন। তথাপি, এই প্রবন্ধের গুরুত্ব এই যে, ঔপনিবেশিকতা সৃষ্ট আধুনিক ভারতীয় রাজনীতি ও ইতিহাসের প্রধান প্রধান প্রবণতা সম্পর্কে এখানে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা আছে। যেমন ঔপনিবেশিক ও নব্য-ঔপনিবেশিক সমাজে যে নিছক অর্থনৈতিক সম্পর্ক বলে কিছু নেই, সব সম্পর্কই যে আদতে ক্ষমতাসম্পর্ক এবং আরও বিশদভাবে বললে এমনকি অর্থনীতির অন্তর্গত সম্পর্কও যে রাজনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, মার্কসবাদী ঝোঁক থাকার পরেও গুহ সে সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল। বর্তমান সময়ে যারা জনগণের পক্ষের রাজনীতি ও ইতিহাস-রচনা করবেন, তাদের জন্য এই প্রবন্ধের নানান দূরদৃষ্টি, প্রস্তাব ও পর্যবেক্ষণ বিশেষভাবে কাজে আসবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। 'জনগণ' সম্পর্কে কোনো অহেতুক ভাবালুতা কিংবা বর্ণবাদী ঘৃণা দুই-ই এড়াতে গেলে 'জনগণ' ধারণাটির নিবিড় বিশ্লেষণ প্রয়োজন। জনগণের বিপুল অংশকে তাদের হক সমেত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জায়গা করে দেয় এমন কোনো গণতন্ত্র কায়েম করতে গেলে; জনগণের চৈতন্য, তাদের ধর্মভাব, প্রতিরোধী মনন এবং নানা পারস্পরিক টানাপোড়েন, বৈপরীত্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকার কোনো বিকল্প নেই। গুহ-র বর্তমান প্রবন্ধটি এই অর্থে, গণক্ষমতা কায়েমের লক্ষ্যে জরুরি তাত্ত্বিকতা, তথ্য, পদ্ধতি ও কৌশলের চাহিদা মেটায়।

বাংলা পরিভাষা সংক্রান্ত নোট

প্রবন্ধের শিরোনামের 'India' ও 'Historiography'-র বাংলা পরিভাষা হিসেবে যথাক্রমে 'ভারত' ও 'ইতিহাস-রচনা' শব্দদ্বয় ব্যবহার করা হয়েছে। 'India'-র বাংলা পরিভাষা হিসেবে 'ভারতবর্ষ' ব্যবহার না করে 'ভারত' চয়ন করার কারণ 'ভারতবর্ষ' একটা ক্লাসিকাল সংস্কৃত ধারণা যা ঐতিহ্য বা সভ্যতা অর্থে ব্যবহার করা উচিত। অন্যদিকে, 'হিস্টরিওগ্রাফি'-র বাংলা পরিভাষা 'ইতিহাসবিদ্যা' কিংবা 'ইতিহাস চর্চা' না হয়ে 'ইতিহাস-রচনা' হওয়া উচিত কারণ 'গ্রাফি'-র অর্থ কোনো লিখিত বয়ান। রণজিৎ গুহ-র বিখ্যাত বাংলা প্রবন্ধ 'নিম্নবর্গের ইতিহাস'-এ আমরা বারবার 'ইতিহাসবিদ্যা' শব্দটির ব্যবহার লক্ষ করি। ধারণা করা যায়, তিনি

'হিস্টরিওগ্রাফি' অর্থেই শব্দটির ব্যবহার করেছেন। তথাপি 'ইতিহাসবিদ্যা' ব্যবহার না করার কারণ 'ইতিহাসবিদ্যা' বলতে ইতিহাস ডিসিপ্লিন বোঝানো হয়; 'ইতিহাস চর্চা'ও তাই। কিন্তু এই দুটো শব্দের আওতায় শুধু ইতিহাসের লিখিত বয়ান, অর্থাৎ বই, প্রবন্ধ ইত্যাদি নয়; তার আনুষঙ্গিক প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকাশন সংস্থা, জার্নাল প্রভৃতি অনেক কিছু এসে পড়বে।

এছাড়াও, 'Elite', 'Elitist', 'Elitism' শব্দগুলোর বাংলা পরিভাষা করা হয়েছে পদভেদে 'উচ্চবর্গ', 'উচ্চবর্গীয়' ইত্যাদি। 'অভিজাত', 'অভিজাততন্ত্র' শব্দগুলো ব্যবহার করা যেত, কিন্তু এই প্রবন্ধে এবং অন্যত্রও, রণজিৎ গুহ-র একটা কেন্দ্রীয় তত্ত্বশব্দ হচ্ছে 'নিম্নবর্গ'। রণজিৎ 'জনগণ' ও 'নিম্নবর্গ' বর্গ দুটি প্রায় অদলবদল করে এস্তেমাল করেন এবং এলিট রাজনীতি ও ইতিহাস-রচনা থেকে নিম্নবর্গের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য নিশ্চিত করতে চান। এই অর্থে 'নিম্নবর্গের' বিপরীতে এলিটিজমের বাংলা পরিভাষা হিসেবে 'উচ্চবর্গ' শব্দটিই অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। এখানে রণজিৎ গুহ-র উল্লেখিত বাংলা প্রবন্ধেও 'উচ্চবর্গ' শব্দটির বহুল ব্যবহার আমাদের নজর এড়ায় না। এছাড়া, সাবলটার্ন স্টাডিজ গ্রুপের আরেক প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ গৌতম ভদ্র-র *ইমান ও নিশান* বইতে 'এলিট' ও 'সাবলটার্ন' -এর বাংলা পরিভাষা করা হয়েছে যথাক্রমে 'উচ্চকোটি' ও 'নিম্নকোটি'। তবে এ কথাও উল্লেখ্য, প্রাসঙ্গিক দুই-একটি জায়গায় অভিজাত/অভিজাততন্ত্র শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে।

'Class in itself' আর 'Class for itself' কথা দুটির নানামাত্রিক ব্যবহার দেখা যায় হেগেলীয় ও মার্কসীয় চিন্তায়। এদের কোনো পরিচিত অনুবাদ নেই, তাই করে নিতে হয়। এই প্রবন্ধে রণজিৎ গুহ 'Class for itself' ফ্রেজটি ব্যবহার করেছেন, এর বাংলা পরিভাষা করা হয়েছে 'স্ব-শ্রেণি'। 'Class in itself' বলতে এমন এক ধরনের শ্রেণি অবস্থা এবং এমন একটা সম্পর্কজালের মধ্যে থাকা বোঝায় যা অন্যরা দেখতে পায়, কিন্তু যারা সেই শ্রেণির মধ্যে আছে তারা দেখতে পায় না। এমন একটা সম্পর্ক-সংস্থানের মধ্যে থাকা যেখানে প্রথমে যখন ক্লাস তৈরি হয় তখন যারা তার মধ্যে আছে তারা সেটাকে দেখতে পায় না – এই অর্থে 'Class in itself' কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণির অবচেতন দশা, যেখানে শ্রেণিস্বার্থ ও শ্রেণি সচেতনতা থাকে না।

কিন্তু যখন কোনো ক্লাসের অন্তর্গত সম্পর্ক-সংস্থান এমন অবস্থা বা দশায় পৌঁছায় যে সেই শ্রেণির মানুষেরা নিজেরা সেটা দেখতে পায় তখন তাকে 'Class for itself' বলা যেতে পারে। অর্থাৎ এমনক্ষেত্রে নির্দিষ্ট শ্রেণি তার নিজের সামাজিক সত্তা, স্তর ও অবস্থান সম্পর্কে সচেতন থাকে। একটা শ্রেণি যখন নিজের জন্য নিজে 'শ্রেণি' হয়ে উঠছে, তখনই তা [অন্তত তাত্ত্বিকভাবে] 'Class for itself' —এহেন

শ্রেণি নিজের শ্রেণিস্বার্থ ও চেতনা সম্পর্কে সচেতন থাকে। একইভাবে কোনো শ্রেণি যখন নিজের সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেনি এবং সেই অনুযায়ী তার শ্রেণি-চেতনা গড়ে ওঠেনি; কিন্তু অন্য শ্রেণি ও গোষ্ঠীসমূহ সেই শ্রেণিকে 'শ্রেণি' হিসেবে দেখতে পায়, এবং 'শ্রেণি' হিসেবে বিবেচনা করে, অন্যের কাছে যখন কোনো শ্রেণি মূর্ত হয়ে ওঠে, তখন তাকে 'class for others' বলা যেতে পারে।

মূল অনুবাদ : ঔপনিবেশিক ভারতের ইতিহাস-রচনার কতিপয় দিক প্রসঙ্গে

১. ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ইতিহাস-রচনায় দীর্ঘকাল ধরে ঔপনিবেশিক উচ্চবর্গ আর বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী উচ্চবর্গের আধিপত্য চলে আসছে। দুটোই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভাবাদর্শজাত পণ্য হিসেবে উৎপত্তি লাভ করলেও ক্ষমতার পালাবদলের মাঝে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পেরেছে এবং ব্রিটেনে নয়া-ঔপনিবেশিক ও ভারতে নয়া-জাতীয়তাবাদী ডিসকোর্সের মধ্যে মিশে গিয়েছে। উপনিবেশবাদী অথবা নয়া-উপনিবেশবাদী উচ্চবর্গীয় ইতিহাস-রচনার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন বিভিন্ন ব্রিটিশ লেখক এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ; তাছাড়া ভারত এবং অন্যান্য দেশগুলোতেও তাদের অসংখ্য অনুসারী রয়েছে। জাতীয়তাবাদী অথবা নয়া-জাতীয়তাবাদী উচ্চবর্গীয় ইতিহাস-রচনা মূলত ভারতীয় চর্চা হলেও ব্রিটেন এবং অন্যান্য অঞ্চলের উদারপন্থী ইতিহাসবিদদের বাদ দিয়ে তা কখনো চর্চিত হয়নি।

২. উচ্চবর্গের বিভিন্ন ধারাগুলো এই ধ্যান-ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, ভারত রাষ্ট্র গঠনে এবং তার সার্বিক চেতনা বিকাশে জাতীয়তাবাদের যে ভূমিকা, তা একচেটিয়াভাবে বা প্রধানত উচ্চবর্গের অর্জন। উপনিবেশবাদী ও নয়া-উপনিবেশবাদী ইতিহাস-রচনায় এই অর্জনগুলোর কৃতিত্ব দেওয়া হয়েছে ব্রিটিশ শাসক, প্রশাসক, শাসনপ্রণালী, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্কৃতিকে; আর জাতীয়তাবাদী ও নয়া-জাতীয়তাবাদী লেখায়— ভারতীয় অভিজাত ব্যক্তিত্ব, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, কর্মকাণ্ড ও মতাদর্শকে।

৩. এই দুই ধরনের ইতিহাস-রচনার প্রথমটি ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে প্রাথমিকভাবে প্রেরণামূলক ও প্রতিক্রিয়াশীল প্রণালী হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে। একেবারেই সংকীর্ণ ব্যবহারবাদী ধারণার ওপর ভিত্তি করে এটি জাতীয়তাবাদকে কিছু কর্মকাণ্ড ও ধারণার সমষ্টি হিসেবে উপস্থাপিত করে যেগুলোর প্রতিক্রিয়ায় ভারতীয় উচ্চবর্গ ঔপনিবেশিক শক্তির তৈরি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষাদীক্ষা ইত্যাদির প্রতি সাড়া দিয়েছিল। এই

ধরনের ইতিহাস-রচনার একাধিক সংস্করণ রয়েছে, তবে যে মূলসূত্রটি তাদের মধ্যে বিদ্যমান তা হলো, ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে এক ধরনের 'শিক্ষাপ্রণালী' হিসেবে চিহ্নিত করা যার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং শাসনের স্বার্থে ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রবর্তিত সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের সঙ্গে আপোস করে দেশীয় উচ্চবর্গ রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। এই প্রক্রিয়ায় যেতে উচ্চবর্গকে যা বাধ্য করেছিল, ইতিহাস-রচনার এই ধারামতে তা, রাষ্ট্রের ভালোর জন্য কোনো মহৎ আদর্শ ছিল না; বরং তা ছিল নিতান্তই সম্পত্তি, ক্ষমতা এবং ঔপনিবেশিক শাসকদের তৈরি ও তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মান-সম্মানের ভাগ বাটোয়ারার আকাঙ্ক্ষা; এবং এটি ছিল ওইসব পুরষ্কারের জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস এবং ক্ষমতাসীন ও দেশীয় অভিজাত এবং সেইসাথে তাদের আরও বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যকার প্রতিযোগিতা, আর এগুলোই নাকি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি রচনা করেছিল।

৪. আরেক ধরনের উচ্চবর্গীয় ইতিহাস-রচনার সাধারণ প্রবণতা হলো ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে প্রাথমিকভাবে এক ধরনের নির্ভেজাল আদর্শবাদী প্রয়াস হিসেবে উপস্থাপন করা যার মূলকথা হলো পরাধীনতা থেকে স্বাধীনতার পথে জনগণের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন স্বদেশী উচ্চবর্গের ব্যক্তিগণ। এই ধরনের ইতিহাস-রচনার একাধিক সংস্করণ রয়েছে যেগুলো এই সমস্ত প্রয়াসের প্রেরণাশক্তি হিসেবে বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ অথবা অভিজাত সংঘ বা প্রতিষ্ঠানের ওপর গুরুত্বারোপের ভিত্তি করে পৃথক পৃথক ধারায় আলাদা হয়েছে। তবে, যে মূলসূত্রটি তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই বিদ্যমান তা হলো, সহযোগিতার যতই নজির থাকুক, ঔপনিবেশিক শাসনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ককে গৌণ করে দেখিয়ে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে দেশীয় উচ্চবর্গের ইতিবাচক চাওয়ার অন্যতম প্রকাশ হিসেবে উপস্থাপন করা, রাজশক্তির সঙ্গে তাদের সহযোগিতার বিষয়টির তুলনায় বিরোধিতাকে বড় করে দেখানো, তাদের ভূমিকাকে শোষক ও নিপীড়ক হিসেবে না দেখিয়ে জনগণের ইচ্ছার প্রবর্তক হিসেবে তুলে ধরা। রাজদত্ত যৎসামান্য ক্ষমতা এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা হাসিল করার জন্য তাদের কাড়াকাড়ি-মারামারিকে ছাপিয়ে উচ্চবর্গের পরার্থপরতা ও আত্মত্যাগকে তুলে ধরা। এভাবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের রচিত ইতিহাস হয়ে ওঠে ভারতীয় উচ্চবর্গের আধ্যাত্মিক জীবনবৃত্তান্ত।

৫. উচ্চবর্গের ইতিহাস-রচনা অবশ্যই উপযোগহীন নয়। এটি আমাদের ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের কাঠামো, নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তার বিভিন্ন সংগঠনের কার্যকলাপ বুঝতে সাহায্য করে। যেসব শ্রেণি একে টিকিয়ে রাখে তাদের যোগসাজশের প্রকৃতি; তৎকালীন সময়ের মুখ্য মতাদর্শ হিসেবে উচ্চবর্গের ভাবাদর্শের বিভিন্ন আঙ্গিক; দুই ধরনের উচ্চবর্গের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-বৈপরীত্য এবং উভয়ের মধ্যকার পারস্পরিক সংঘাত ও সমঝোতার জটিল সমীকরণ; বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্রিটিশ ও ভারতীয় ব্যক্তিত্ব এবং উচ্চবর্গের প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে। সবচেয়ে বড় কথা এটি আমাদেরকে খোদ ওই ইতিহাস-রচনার পদ্ধতিটাকেই বুঝতে সাহায্য করে।

৬. তবে, এই ধরনের ইতিহাস-রচনা আমাদের হয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। কারণ ব্যাখ্যা করা তো দূরের কথা, উচ্চবর্গের কোনো প্রকার সহায়তা ছাড়াই সাধারণ জনগণ নিজস্ব উদ্যোগে জাতীয়তাবাদের নির্মাণ ও বিকাশের ক্ষেত্রে যে ভূমিকা রেখেছে সেটিকে এই ইতিহাস-রচনা স্বীকারই করে না। জাতীয়তাবাদের সঙ্গে জনসম্পৃক্তির দিকটার অনুধাবন ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই ইতিহাস-রচনার দৈন্যতার বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে উন্মোচিত হয়। এই ইতিহাস-রচনা পদ্ধতি জাতীয়তাবাদে জনসম্পৃক্তির দিকটাকে কেবল, নেতিবাচকভাবে, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি এবং ইতিবাচকভাবে, বড়জোড়, কতিপয় উচ্চবর্গের নেতার কারিশমায় জনগণের সাড়া দেয়া অথবা হাল ফ্যাশনের ভাষায় বিবিধ গোষ্ঠীর দ্বারা প্রভাবিত খাড়াখাড়ি জনসমাবেশ (vertical mobilization) হিসেবে বুঝে থাকে। সুতরাং, শত শত, হাজার হাজার এমনকি সময়ে সময়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের জাতীয়তাবাদী কর্মকাণ্ড ও মতাদর্শে অংশগ্রহণকে তথাকথিত 'আসল' রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্যুতি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। অর্থাৎ, রাষ্ট্রযন্ত্রের চাকা সচল রাখা এবং উচ্চবর্গের প্রতিষ্ঠানগুলোকে চালিয়ে নেয়ার কৃতিত্ব দেওয়া হয়েছে উচ্চবর্গেরই নিজস্ব মতাদর্শের সফল আত্মস্থকরণের প্রভাব এবং উদ্যোগ হিসেবে। এই ইতিহাস-রচনার দেউলিয়াত্ব রীতিমতো উদাম হয়ে পড়ে, যখন একে উচ্চবর্গের অনুপস্থিতিতে অথবা তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে তৈরি হওয়া অসংখ্য জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন—যেমন ১৯১৯ সালের রাওলাট বিদ্রোহ এবং ১৯৪২ সালের ভারত ছাড় আন্দোলনের মতো

আন্দোলনগুলোকে— ব্যাখ্যা করতে বলা হয়। এই ধরনের একপেশে এবং ঠুলি আঁটা ইতিহাস-রচনা কেমন করেই-বা উচ্চবর্গের রাজনীতির বাইরের আন্দোলন যেগুলো চৌরিচৌরা বা ১৯৪৬-এর নৌবিদ্রোহের সঙ্গে সংহতি জানাতে সংঘটিত হয়েছিল, সেসব সশস্ত্র মহড়ার মতো কর্মকাণ্ডগুলোকে বুঝতে সাহায্য করবে?

৭. উচ্চবর্গের ইতিহাস-রচনার এই অপর্যাপ্ততা এক ধরনের সংকীর্ণ ও পক্ষপাতদুষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সরাসরি শ্রেণিগত প্রতিফলন। এই ধরনের সমস্ত লেখাতেই ভারতীয় রাজনীতির অধিক্ষেত্রগুলোকে অবধারিতভাবে শাসনের প্রয়োজনে ব্রিটিশদের তৈরি এবং তাদের প্রণীত প্রতিষ্ঠানাদির ওপর ভিত্তি করে উদ্ভূত বিভিন্ন আইনকানুন, নীতিমালা, অভিব্যক্তি এবং অন্যান্য উপরকাঠামোর ওপর অবস্থিত বলে ধরে নেওয়া হয়েছে অথবা একচেটিয়াভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। অবধারিতভাবে, এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসূত ইতিহাস-রচনা রাজনীতিকে উচ্চবর্গের কর্মকাণ্ড ও ধ্যানধারণার যোগফল হিসেবে বুঝে থাকে – অর্থাৎ, শাসনের প্রয়োজনে সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানাদির সরাসরি নিয়ন্ত্রক ঔপনিবেশিক প্রভু এবং তাদের আজ্ঞাবহ সহচর দেশীয় সমাজের অধিপতি গোষ্ঠী। উল্লিখিত গোষ্ঠীসমূহের পারস্পরিক লেনদেনের মাধ্যমে যতটুকু নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা গেছে শুধুমাত্র ততটুকুই যেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সারবস্তু, বাকিটা ওই রাজনীতিরই কাকতালীয় ঘটনা। এইরকম উচ্চবর্গীয় কিছু কর্মকাণ্ড এবং ধারণার সমষ্টির বাইরে আলোচ্য ইতিহাস-রচনা রাজনীতিকে চিন্তাই করতে পারে না।

৮. এই অনৈতিহাসিক ইতিহাস-রচনাতে পরিষ্কারভাবে যে বিষয়টি বাদ পড়ে তা হলো জনগণের রাজনীতি। উচ্চবর্গের রাজনীতির সমান্তরালে ভারতীয় রাজনীততে পুরো ঔপনিবেশিক আমল জুড়ে আরও একটি ধারা ছিল যার মুখ্য চরিত্রে দেশীয় সমাজের কোনো প্রভাবশালী গোষ্ঠী বা ঔপনিবেশিক প্রভুরা ছিল না; বরং তাতে ছিল শহর ও গ্রামজুড়ে ছড়িয়ে থাকা নিম্নবর্গের এবং খেটে খাওয়া মানুষের বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণি, অর্থাৎ, জনগণ। এই ধারাটি ছিল স্বায়ত্তশাসিত, কারণ এটি উচ্চবর্গের রাজনীতি থেকে উদ্ভূত কোনো ধারা ছিল না বা সেই ধারার ওপরে কোনোভাবে নির্ভরশীলও ছিল না। এই ধারার মূল উপাদানগুলো প্রাক-ঔপনিবেশিক আমলে প্রোথিত কেবল এই অর্থেই একে সনাতনী

বলা চলে, কিন্তু একে কোনোভাবেই অচল অর্থে সেকেলে ঠাওর করা যাবে না। প্রাক-ব্রিটিশ যুগের উচ্চবর্গীয় রাজনীতির মতো এটি ঔপনিবেশিক অবস্থার চাপে নষ্ট বা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়নি। বরং নতুন অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং তারই মধ্যে চেতনা ও ব্যবহারের নানা দ্বন্দ্বের ফলে আকারে ও গুণে কিছু নতুনত্ব নিয়ে তা ঔপনিবেশিক আমলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিকাশ লাভ করেছে। দেশীয় উচ্চবর্গের রাজনীতির মতোই আধুনিক হলেও, সময় এবং কাঠামোর গভীরতার সাপেক্ষে নিম্নবর্গের রাজনীতির সনাক্তকারী স্বাতন্ত্র্য আলাদা করে চেনা যেত।

৯. উচ্চবর্গীয় ইতিহাস-রচনায় এই রাজনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ এর সমাবেশের কায়দা ও চরিত্রের নানা দিক সম্পর্কে খুব সামান্যই ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। উচ্চবর্গের উদ্যোগজাত সমাবেশ যদি হয় খাড়াখাড়ি, তাহলে নিম্নবর্গের উদ্যোগজাত সমাবেশকে বলতে হয় আড়াআড়ি (horizontal)। ঔপনিবেশিক শাসনের স্বার্থে ইংরেজরা এদেশে যেসব সংসদীয় প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা চালু করেছিল এবং প্রাক-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্ত শাসনের যেসব সংস্থা তখনো অকেজো হয়ে যায়নি, সেগুলোর অভিযোজনের মাধ্যমেই প্রথম কায়দার খাড়াখাড়ি সমাবেশের গোড়াপত্তন ঘটেছিল। অন্যদিকে, দ্বিতীয় কায়দার সমাবেশের—অর্থাৎ আড়াআড়ি সমাবেশ—প্রধান অবলম্বন ছিল নিম্নবর্গের সমাজের চিরায়ত কুটুম্বিতা ও অঞ্চলভিত্তিক প্রতিষ্ঠান কিংবা সংশ্লিষ্ট মানুষদের চেতনার তারতম্যের ওপর নির্ভরশীল শ্রেণিসংস্থা বা এই দুই-এর নানারকম সমন্বয়। উচ্চবর্গের জমায়েতের ঝোঁক ছিল অপেক্ষাকৃত আইনানুগ ও সাংবিধানিক; আর সেই তুলনায় নিম্নবর্গের জমায়েতকে বেশ সহিংসই বলতে হবে। প্রথমটি ছিল মোটের ওপর বেশ সতর্ক ও নিয়ন্ত্রিত এবং পরেরটি স্বতঃস্ফূর্ত। ঔপনিবেশিক আমলে নিম্নবর্গের জমায়েতের সবচাইতে তাৎপর্যপূর্ণ ও ব্যাপকতর চেহারা দেখা যায় সেই সময়কার কৃষক-বিদ্রোহগুলোতে। তবে, এমন অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার নজির আছে যেখানে শহুরে পাতি বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত, শ্রমিক ও অন্যান্য গরিব মেহনতি জনতার সমাবেশ ও জমায়েতেও কৃষক বিদ্রোহের আদিকল্পের (paradigm) লক্ষণগুলোর হুবুহু প্রতিফলন দেখা গেছে।

১০. এই অধিক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল মতবাদটি, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, তার সামাজিক গঠনের বৈচিত্র্যকে তুলে ধরার সাথে সাথে যে-কোনো বিশেষ

সময়ে এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে এর এক বা একাধিক উপাদান অন্য উপাদানগুলোর তুলনায় মুখ্য হয়ে উঠতে পারত। তবে, যত বৈচিত্র্যই থাকুক না কেন, যে বৈশিষ্ট্যটি কখনো পরিবর্তন হয়নি তা হলো উচ্চবর্গের কর্তৃত্ব ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রবণতা। বৈশিষ্ট্যটি এই অধিক্ষেত্রের আওতাভুক্ত যাবতীয় সামাজিক অঞ্চলসমূহের সাধারণ নিম্নবর্গত্ব (subalternity) থেকে উৎসারিত এবং এটাই উচ্চবর্গের রাজনীতির সাথে এর তফাতকে স্পষ্ট করে গড়ে দিত। এই মতাদর্শিক উপাদানগুলো অবশ্যই সকলক্ষেত্রে গুণগতভাবে একাট্টা এবং ঘনত্বের দিক থেকে একই রকমের তীব্র ছিল না। বড়জোড় এটা নিম্নবর্গীয় রাজনৈতিক সক্রিয়তার জমাটবদ্ধতা, মনোযোগ ও উত্তেজনাকে সময় সময় বাড়িয়ে দিত। তবে, এমন ঘটনাও আছে যেখানে গোষ্ঠী স্বার্থের দিকে জোর দেওয়ার প্রবণতাটি জনপ্রিয় আন্দোলনগুলোর ভারসাম্য এমনভাবে নষ্ট করেছে যাতে সংকীর্ণ অর্থনীতিবাদী বিচ্যুতি এবং সাম্প্রদায়িক বিভাজনের পথ সৃষ্টি হয়েছে। ফলাফল হিসেবে আড়াআড়ি ঐক্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

১১. এছাড়া, শোষণের যেসব ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে নিম্নবর্গীয় শ্রেণিগুলো অবস্থান করত সেই পর্যায়, একইসাথে এর প্রধান চরিত্রের অধিকাংশ অর্থাৎ, শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে উৎপাদনশীল শ্রমের সম্পর্ক এবং অনুৎপাদক শহুরে দরিদ্র শ্রেণি এবং পাতি বুর্জোয়াদের নিম্নতর অংশের যথাক্রমে কায়িক ও মানসিক শ্রম থেকেও এই রাজনীতির আরও একটি সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য মূর্ত হয়ে ওঠে। শোষণ ও শ্রমের অভিজ্ঞতা এই রাজনীতিকে বহু নামে, ধাঁচে এবং মূল্যে ভূষিত করেছে যেগুলো একে উচ্চবর্গের রাজনীতি থেকে ভিন্ন ধারায় নিয়ে গেছে।

১২. উপরোক্ত তিনটি অনুচ্ছেদে বর্ণিত নিম্নবর্গের রাজনীতির এইসব বৈশিষ্ট্য ছাড়াও অন্যান্য সুস্পষ্ট যে-সকল বৈশিষ্ট্য রয়েছে কোনো তালিকাতেই তা সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয় এবং সবসময় এগুলোর শুদ্ধরূপে আবির্ভাবও ঘটে না। জীবনযাপনের নানা বৈপরীত্য এগুলোকে ইতিহাসে বাস্তব রূপ লাভে প্রভাবিত করে। তবে, যাপিত জীবনের নানা বৈপরীত্যের দরুন যতই পরিমার্জন ঘটুক না কেন, সেসব নিম্নবর্গের রাজনীতিকে উচ্চবর্গের রাজনীতি থেকে পৃথক করে চিনতে সাহায্য করেছে। এই দুই ধরনের অধিক্ষেত্র বা স্রোতের সহাবস্থান—যা ষষ্ঠ ইন্দ্রীয় দিয়েও অনুমান করা

যায় এবং বাহ্যিকভাবেও প্রমাণ করা যায়—এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক সত্য উন্মোচন করে, সেটা হলো, জাতির স্বর হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে ভারতীয় বুর্জোয়াদের ব্যর্থতা। নিম্নবর্গের জীবনযাত্রা ও চৈতন্যের বিপুল অংশে কখনোই উচ্চবর্গের সর্বেশ্বরতা কায়েম হয়নি। এই কাঠামো থেকে উদ্ভূত কাঠামোগত দ্বিধাবিভক্তিই ঔপনিবেশিক আমলের ভারতের ইতিহাসের মর্মবস্তু; যিনিই এই ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে যাবেন, এই দ্বিবিভাজনের ইতিহাসকে অস্বীকার করে ভুলের ফাঁদ এড়াতে পারবেন না।

১৩. তবে, এই দ্বিবিভাজন আবার এটা বোঝায় না যে, এই দুটি ধারা একেবারে অভেদ্যভাবে পরস্পর থেকে এমনভাবে আলাদা হয়ে গিয়েছিল যে তাদের মধ্যে কোনো যোগাযোগ ছিল না। বরং , দেশীয় উচ্চবর্গের অগ্রসর অংশের কোনো কোনো ধারা এই দুই ধরনের রাজনীতিকে উচ্চবর্গের উদ্যোগ ও নেতৃত্বে উভয়বর্গের একত্রিত সমাবেশে মেলাতে চেষ্টা করেছে। এই ধরনের প্রচেষ্টা যখন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী উদ্দেশ্যের সঙ্গে কম-বেশি জড়িয়ে গিয়েছিল এবং ধারাবাহিকভাবে চলেছিল তখন কিছুক্ষেত্রে দারুণ ফলাফল দেখা গিয়েছিল। তবে, সবক্ষেত্রেই যে উচ্চবর্গের এমন নিয়ত ছিল তা বলা যাবে না। বরং, উচ্চবর্গ তথা বুর্জোয়াদের আপোসকামী মনোভাব, গণ-আন্দোলনের তেজ সম্পর্কে উচ্চবর্গের চিরাচরিত ভীতি এবং নিম্নবর্গের চৈতন্যের নানা দুর্বলতা এসব আন্দোলনকে সাম্রাজ্যবাদ বা উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হতে দেয়নি কিংবা হলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এমনক্ষেত্রে, উচ্চবর্গেরই নেতৃত্ব ও কারসাজিতে এমন যৌথ আন্দোলন কখনো কখনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং কুৎসিত গোষ্ঠীগত বিবাদের জন্ম দিয়েছিল। কাজেই ঔপনিবেশিক সরকারের সঙ্গে আইনগত, প্রাতিষ্ঠানিক বা অন্য কোনো ধরনের সমঝোতার মাধ্যমে পিছু হটা ও বিভাজনের রাজনীতির এই ইতিহাসকেও স্মরণে রাখতে হবে। তবে উভয় পরিণতির ক্ষেত্রেই যে বিষয়টি লক্ষ করার মতো তা হলো, যৌথ সমাবেশের উদ্দেশ্য প্রগতি কিংবা প্রতিক্রিয়া যার অনুকূলেই যাক না কেন, এই দুটি ধারা বা ক্ষেত্রের বেণীবন্ধন ব্যতিক্রমহীনভাবে বারবার বিস্ফোরণের জন্ম দিয়েছে। এমনকি উচ্চবর্গের স্বার্থে একত্রিত হওয়া নিম্নবর্গও উচ্চবর্গের নিয়ন্ত্রণের জিঞ্জির ছিন্ন করতে সক্ষম হয়েছে এবং উচ্চবর্গের উদ্যোগজাত আন্দোলনের মধ্যেও নিম্নবর্গের রাজনীতি তার নানা খাসলত খোদাই করে দিয়েছে।

১৪. তবে, নিম্নবর্গের রাজনীতির তরফ থেকে যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল সেগুলো জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে পূর্ণাঙ্গ জাতীয় মুক্তির আন্দোলনে রূপান্তরের জন্য যথেষ্ট ছিল না। শ্রমিক শ্রেণি তখনো তার সামাজিক সত্তার অভীষ্ট কর্তব্য পালনে যথেষ্ট পরিণত ছিল না এবং স্ব-শ্রেণি হিসেবে (class for itself) তাদের চৈতন্যে ঘাটতি ছিল। উপরন্তু, তারা কৃষক শ্রেণির সঙ্গেও শক্তভাবে একাত্ম হতে পারেনি। পরিণামে, বুর্জোয়ারা যেসব লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছিল শ্রমিক শ্রেণি সেগুলোকেই করায়ত্ত করা এবং লক্ষ্য অর্জন করার ক্ষেত্রে কিছুই করতে পারেনি। এই সবকিছুর ফলাফল হলো এই, সেই সময়ের অসংখ্য কৃষকবিদ্রোহ—যার কোনো কোনোটি আকারে অতিকায় এবং উপনিবেশ-বিরোধী চেতনায় সমৃদ্ধ—নিজেদেরকে আঞ্চলিকতার ঊর্ধে ওঠানোর নিমিত্তে খামোখা নেতৃত্বের অপেক্ষায় ছিল এবং নিজেদের স্বাতন্ত্র্যকে সর্ব-ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের সাথে গুলিয়ে ফেলেছিল। কালক্রমে, কৃষক, শ্রমিক এবং শহুরে পাতি-বুর্জোয়াদের শাখাবিভক্ত সংগ্রাম নিছক অর্থনীতিবাদের ঘেরাটোপে বা, যেসব ক্ষেত্রে এসব উদ্যোগে রাজনীতিকরণ ঘটেছিল সেসব ক্ষেত্রে, বৈপ্লবিক নেতৃত্বের অভাবে, অতিরিক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে ভাগ হয়ে থাকায় জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মতো কার্যকর কোনো কিছুতে পরিণত হতে পারেনি।

১৫. এ হলো কোনো রাষ্ট্রের নিজ পায়ে দাঁড়াতে না পারার ঐতিহাসিক ব্যর্থতার পাঠ—বুর্জোয়া এবং শ্রমিক উভয় শ্রেণির ব্যর্থতা ও অপারগতার দরুন উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সুনিশ্চিত বিজয় অর্জনের মাধ্যমে বুর্জোয়া সর্বেশ্বরতার অধীনস্ত ঊনিশ-শতকীয় ধ্রুপদি কিসিমের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব অথবা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কিসিমের কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণির সর্বেশ্বরতার অধীনস্ত কোনো "নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব" সংঘটনের ব্যর্থতার ঐতিহাসিক পাঠ। এ হলো সেই ব্যর্থতার পাঠ যা ঔপনিবেশিক ভারতের ইতিহাস-রচনার কেন্দ্রীয় সমস্যাটিকে মূর্ত করে। এই সমস্যা খতিয়ে দেখার কোনো একক যথাপ্রদত্ত রাস্তা নাই। কাজেই শত ফুল ফুটুক, এমনকি আগাছাতেও আমাদের আপত্তি নাই। এমনকি আমরা মনে করি যে ইতিহাস-রচনার এই চর্চায় নেতিবাচক উদাহরণের শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে উচ্চবর্গেরও একটা ভূমিকা আছে। কিন্তু আমরা এটাও নিশ্চিত যে বিকল্প ডিসকোর্স নির্মাণ করে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ নিয়ে উচ্চবর্গের কৃত্রিম ও অনৈতিহাসিক অদ্বৈতবাদী (monism) ধারণা তৈরি

করা ইতিহাস-রচনাকে নাকচ করতে হবে এবং শক্তভাবে মোকাবিলা করতে হবে। উচ্চবর্গীয় ও নিম্নবর্গীয় রাজনীতির সহাবস্থান এবং মিথস্ক্রিয়ার ইতিহাসের স্বীকৃতি আদায়ে কাজ করতে হবে।

১৬. আমরা নিশ্চিত যে ঔপনিবেশিক ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস-রচনার বর্তমান দশা এবং তা থেকে পরিত্রাণের রাস্তা সন্ধানের ক্ষেত্রে আমরা একা নই। আধুনিক ভারতীয় ইতিহাস-রচনা যে উচ্চবর্গের প্রতি পক্ষপাতে জর্জরিত এই তিক্ত বাস্তবতায় আমাদের মতো অনেক শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও লেখকেরা ক্ষুব্ধ। তাদের প্রত্যেকেই যে ওপরে যেসব কথা যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে সেসবের সঙ্গে হুবুহু একমত তা নয়। তবে, আমাদের কোনো সন্দেহ নাই যে ইতাহাস-রচনার আর আর দৃষ্টিভঙ্গি ও চর্চার ধনুকও সেইদিকেই তাক করা যেদিকে আমাদেরও অভিমুখ। নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণের উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির এ ধরনের মিলনকে আরও বেগবান করা। আমরা একটা ঝোঁক তৈরি করা এবং বাস্তবেও যে এটা চর্চা করা সম্ভব সেই আশা সঞ্চার করা ছাড়া আর কোনো দাবি রাখি না। অন্য যে আলাপই উঠুক না কেন, যারা আমাদের মতো করে চিন্তা করেন তাদের সাথে আমাদের ঐক্যমত্যের কাছ থেকে তো বটেই; এমনকি যারা আমাদের সাথে একমত নন, তাদের সমালোচনা, এই সবকিছু থেকেই আমরা বিপুল পরিমাণে শেখার প্রত্যাশা রাখি।

উপরে ব্যবহৃত 'উচ্চবর্গ', 'জনগণ' 'নিম্নবর্গ' ইত্যাদি পরিভাষা সংক্রান্ত টীকা:

এই প্রবন্ধে 'উচ্চবর্গ' শব্দটি—দেশি ও বিদেশি—ইংরেজ শাসিত ভারতে প্রভুশক্তির অধিকারী সকল সম্প্রদায়কে বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রভুস্থানীয় বিদেশি সম্প্রদায়ের মধ্যে রয়েছেন সকল অ-ভারতীয়, অর্থাৎ, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের প্রধানত ব্রিটিশ কর্মচারীগণ এবং বেসরকারি হিসেবে গণ্য বিদেশি শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী, খনির মালিক, ভূস্বামী, নীলকুঠী চা-বাগান, কফিক্ষেত বা ওই জাতীয় যে সব সম্পত্তি প্লানটেশন প্রণালীতে চাষ করা হয় তার মালিক ও কর্মচারী, খ্রিস্টান মিশনারি, যাজক, পরিব্রাজক ইত্যাদি।

অন্যদিকে, প্রভুগোষ্ঠীর দেশীয় অংশে শ্রেণি ও স্বার্থ হাসিলের পার্থক্য অনুযায়ী দুটি স্তর রয়েছে। সর্ব-ভারতীয় পর্যায়ে রয়েছেন বৃহত্তম সামন্ত প্রভুরা, শিল্পে ও বাণিজ্যে লিপ্ত সবচেয়ে শক্তিমান বুর্জোয়ারা এবং আমলাতন্ত্রে বা শাসনযন্ত্রের অন্যত্র যারা ছিল উচ্চপদের অধিকারী।

দেশি প্রভুগোষ্ঠীর আঞ্চলিক বা স্থানীয় প্রতিনিধিরাও আবার দু-রকমের। এক রকম হচ্ছে তারাই যারা আসলে সর্বভারতীয় প্রভুগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ক্ষমতা বিন্যাসের আঞ্চলিক বা স্থানীয় উপাদান হিসেবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। আর এক রকম হচ্ছে তারা যাদের প্রভুত্ব ষোল আনাই আঞ্চলিক বা স্থানীয়, কিংবা যারা অন্য সব অর্থে প্রভুগোষ্ঠীর মধ্যে গণ্য না হলেও আঞ্চলিক বা স্থানীয় অবস্থায় প্রভুগোষ্ঠীর স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী কাজ করে, নিজেদের সামাজিক সত্তার ধর্ম অনুযায়ী কাজ করে না।

মোটের ওপর এবং বিমূর্তভাবে ধরতে গেলে দেশীয় প্রভুগোষ্ঠীর এই সর্বশেষ শ্রেণিটি বিভিন্ন উপাদানে গঠিত এবং এর আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বিকাশ ও সামাজিক গড়নের সাংকর্যের চরিত্র স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। উপরোক্ত সংজ্ঞানুযায়ী, এই দ্বিবিধ অসমতার ফলেই যে-শ্রেণি বা সমূহ এক অঞ্চলে প্রভুস্থানীয় বলে গণ্য, তারাই আবার অন্যত্র আর এক প্রভুগোষ্ঠীর অধীন। একাধারে প্রভুত্ব ও অধীনতার প্রতীক বলেই তাদের মানসিকতা, রাজনৈতিক আদর্শ ও আচরণ, সখ্য ও শত্রুতার ঝোঁক বা তাৎপর্য সবক্ষেত্রেই এক নয়; বরং অর্থ ও উদ্দেশ্যের নানারকম স্ববিরোধিতায় তা প্রায়শই অস্পষ্ট ও জটিল হয়ে দেখা দেয়। ঔপনিবেশিক যুগে ভূস্বামীদের মধ্যে যারা নিঃস্ব হয়ে পড়ে, গ্রামভদ্রদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত ওপরের দিকে এবং ধনী কৃষকশ্রেণি— এরা সকলেই আমার সংজ্ঞার শুদ্ধ অর্থে নিম্নবর্গ তথা জনগণের অন্তর্গত হলেও বহুক্ষেত্রেই অবস্থার চাপে ও চৈতন্যের অন্তর্দ্বন্দ্বে উচ্চবর্গের সপক্ষে কাজ করে। আদর্শের বিশুদ্ধতা থেকে বাস্তবের এই বিচ্যুতি ও তারই পরিণামে যে ঐতিহাসিক জটিলতার সৃষ্টি হয় তার সন্ধান, বিশ্লেষণ ও বর্ণনাই গবেষণার দায়িত্ব।

'জনগণ' ও 'নিম্নবর্গ' শব্দ দুটিকে এই রচনায় সবসময় সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই সামাজিক গোষ্ঠী এবং উপাদানসমূহ ভারতীয় জনগণ এবং যাদের আমরা 'উচ্চবর্গ' বলে পরিচয় দিয়েছি তাদের মধ্যকার জনতাত্ত্বিক পার্থক্যকে তুলে ধরে। ঔপনিবেশিক ভারতে যারা উপরোক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী উচ্চবর্গের অন্তর্গত, সমগ্র জনসংখ্যা থেকে তাদের বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তারাই 'নিম্নবর্গ'। এর মধ্যে রয়েছে শহরের শ্রমিক ও গরিব, সর্বোচ্চ পদের আমলাদের বাদ দিয়ে মধ্যবিত্তের বাকি অংশ, ক্ষেতমজুর, গরিব চাষী ও প্রায়-গরিব মাঝারি নিম্নবর্গের মধ্যে গণ্য। তা ছাড়াও, নিঃস্ব হয়ে যাওয়া জমিদার, অপেক্ষাকৃত হীনবল গ্রামভদ্র, ধনী কৃষক এবং অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন মাঝারি কৃষক যারা, এই সংজ্ঞার একেবারে শুদ্ধ

অর্থে 'স্বাভাবিকভাবেই' 'জনগণ' ও 'নিম্নবর্গের' কাতারে পড়ে, কিছুক্ষেত্রে তারা 'উচ্চবর্গের' পক্ষেও কাজ করতে পারে, এবং সেই কারণে কিছু কিছু স্থানীয় ও আঞ্চলিক ক্ষেত্রে তাদের সেভাবেই শ্রেণিকরণ করা যায়—প্রাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণকে নিবিড় ও বিচক্ষণ পর্যালোচনা করে এই অস্পষ্টতা সমাধানের ভার ঐতিহাসিকদের কাঁধে সমর্পিত হলো।

[ঋণ স্বীকার: এই প্রবন্ধের অনুবাদ করার ক্ষেত্রে রণজিৎ গুহ-র বিখ্যাত বাংলা প্রবন্ধ 'নিম্নবর্গের ইতিহাস' থেকে বিপুল সহায়তা নেয়া হয়েছে।— সম্পাদক]

বাংলা অনুবাদের টীকানির্দেশ:

১. ১৯৯২ সালে যাত্রা শুরু করা লাতিন আমেরিকান সাবলটার্ন স্টাডিজ গ্রুপ তাদের ফাউন্ডিং স্টেটমেন্ট শুরু করেছে এভাবে: "The work of the Subaltern Studies Group, an interdisciplinary organization of South Asian scholars led by Ranajit Guha, has inspired us to found a similar project dedicated to studying the Subaltern in Latin America."

২. Ranajit Guha, "On Some Aspects of the Historiography of Colonial India", in Ranajit Guha, ed., *Subaltern Studies I*, Delhi: Oxford University Press, 1982), pp. 1-7। এছাড়াও প্রবন্ধটি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত রণজিৎ গুহ-র *The Small Voice of History* বইতেও সংকলিত আছে।

৩. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, "নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস", *প্রজা ও তন্ত্র*, ২০০৫, অনুষ্টুপ, কলকাতা

৪. Ranajit Guha, "Introduction", *History at the Limit of World-History*, 2002, Columbia University Press, New York

৫. Michael Lowy, *Fire Alarm: Reading Walter Banjamin's "On the Concept of History"*, translated by Chris Turner, 2005, Verso, Londonl বেঞ্জামিনের বিখ্যাত প্রবন্ধ "On the Concept of History"-র একটি চিত্তাকর্ষক তর্জমা করেছেন পারভেজ আলম—"ইতিহাসের ধারণা প্রসঙ্গে" এই শিরোনামে। প্রকাশিত হয়েছে *রাষ্ট্রচিন্তা* জার্নালের অষ্টম সংখ্যায় (বর্ষ ৬, সংখ্যা ২)

৬. Gayatri Chakravorty Spivak, "In Response: Looking Back, Looking Forward", in ***Can the Subaltern Speak? Reflections on the History of an Idea***, ed. Rosalind C. Morris (New York: Columbia University Press, 2010)

লেখক পরিচিতি

হাসনাত কাইয়ূম: রাজনৈতিক সংগঠন *রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন*-এর প্রধান সমন্বয়ক। পেশায় আইনজীবী। সংবিধান বিশেষজ্ঞ। বাংলাদেশ লেখক শিবির-এর অন্যতম সংগঠক ছিলেন। জেলে আন্দোলনসহ বিভিন্ন গণ-আন্দোলন সংগঠনে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন ও আছেন।

মোহাম্মদ আজম: জন্ম ২৩ আগস্ট, ১৯৭৫, নোয়াখালীর হাতিয়ায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে এমএ ও পিএইচডি। সাংস্কৃতিক রাজনীতি তাঁর প্রধান আগ্রহের এলাকা। প্রকাশিত বই: *বাংলা ভাষার উপনিবেশায়ন ও রবীন্দ্রনাথ* (২০১৪); *বাংলা ও প্রমিত বাংলা সমাচার* (২০১৯); *কবি ও কবিতার সন্ধানে* (২০২০); *হুমায়ূন আহমেদ: পাঠপদ্ধতি ও তাৎপর্য* (২০২০); *বিষয় সিনেমা: তিনটি অনূদিত প্রবন্ধ* (২০২০); *সাংস্কৃতিক রাজনীতি ও বাংলাদেশ* (২০২২)

আলতাফ পারভেজ: জন্ম ১৯৬৬ সালে। দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস তাঁর গবেষণা ও লেখালেখির প্রধান বিষয়। লেনিনের *রাষ্ট্র ও বিপ্লব* কিতাবের দীর্ঘ এক পর্যালোচনা লিখেছেন তিনি। দুই বিখ্যাত মার্কসবাদী তাত্ত্বিক লুই আলথুসার ও আন্তোনিও গ্রামসির রাষ্ট্রচিন্তা বিষয়ে তাঁর রচিত *রাষ্ট্র ও ভাবাদর্শ* এবং *গ্রামসি ও তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা* নামে বই দুটি পাঠক মহলে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে। এছড়া লিখেছেন: *যোগেন মণ্ডলের বহুজনবাদ এবং দেশভাগ*; *মিয়া অসমিয়া এনআরসি: আসামে জাতিবাদী বিদ্বেষ ও বাংলাদেশ*। প্রকাশের অপেক্ষায় আছে: *জুলফিকার আলী ভুট্টো: দক্ষিণ এশিয়ার কুলীন রাজনীতির এক অধ্যায়*।

সহুল আহমদ: লেখক, অনুবাদক ও অ্যাক্টিভিস্ট। গবেষণার পাশাপাশি সমকালীন বিষয়াবলীর বিশ্লেষক। *রাষ্ট্রচিন্তা* জার্নাল ও *অরাজ* এর সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত। প্রকাশিত বই: *মুক্তিযুদ্ধে ধর্মের অপব্যবহার*; *জহির রায়হান: মুক্তিযুদ্ধ ও রাজনৈতিক ভাবনা*; *সময়ের ব্যবচ্ছেদ* (সহ-লেখক সারোয়ার তুষার)। অনুবাদ: *ইবনে খালদুন: জীবন চিন্তা ও সৃজন*। প্রকাশিতব্য গ্রন্থ : *শ্বাস নেয়ার লড়াই : রাষ্ট্র, স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার*; *সাম্প্রদায়িকতা* (সহ-লেখক সারোয়ার তুষার)।

আবীর আহমেদ: পড়াশোনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। একাডেমিক পর্যায়ে বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও আগ্রহের বিষয় রাজনীতি, ইতিহাস, দর্শন ও সাহিত্য। বর্তমান প্রবন্ধটি তাঁর তিন পর্বের ধারাবাহিক প্রবন্ধ সিরিজের প্রথম পর্ব। দ্বিতীয় কিস্তি 'রুহানি

রাজনীতি' এবং তৃতীয় কিস্তি 'প্রেমের ইশতেহার' প্রকাশিত হয়েছে মোহাম্মদ আজম সম্পাদিত ত্রৈমাসিক চিন্তামূলক কাগজ *তত্ত্বতালাশ*-এর দ্বিতীয় ও চতুর্থ সংখ্যায়।

মুহাম্মদ তানিম নওশাদ: জন্ম ঢাকায়, ১৯৭৮ সালে। পড়াশোনা ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্মান ভাষা পড়ান। প্রকাশিত বই: *ধর্মের অন্তরালে: বিশ্বাসভিত্তিক চেতনায় শ্রেণি সংগ্রামের আভাস* (২০২০); মূল জার্মান থেকে অনুবাদ করেছেন *সিদ্ধার্থ* (হেরমান কার্ল হেসে রচিত); *জার্মান দেশের কৃষকযুদ্ধ* (ফ্রিদরিখ এঙ্গেলস রচিত)। প্রকাশিতব্য বই: *শিখ ধর্মের উত্থান এবং তার ঐতিহাসিক পথচলা: ভক্তি আন্দোলন থেকে শিখ আন্দোলন এবং তারপর*; *আর্থ-দার্শনিক পাণ্ডুলিপি ১৮৪৪* (কার্ল মার্কস রচিত, মূল জার্মান থেকে অনূদিত)।

রাখাল রাহা: কথাসাহিত্যিক। পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা ও নির্ঘণ্ট প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান "সম্পাদনা"র প্রধান সম্পাদক। শিক্ষা ও শিশু রক্ষা আন্দোলন (শিশির)-এর আহ্বায়ক। প্রকাশিত বই: উপন্যাস *অমাবতী* এবং গল্পগ্রন্থ *চাষাঢ়ে গল্প*।

আদিত্য নিগম: প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক তাত্ত্বিক। দিল্লির সেন্টার ফর দ্যা স্টাডি অব ডেভেলপিং সোসাইটিজ (CSDS)-এর একজন অধ্যাপক। সামাজিক ও রাজনৈতিক তত্ত্বের বিউপনিবেশায়ন তাঁর অন্যতম প্রধান গবেষণার বিষয়বস্তু। মার্কসবাদ ও গ্লোবাল দক্ষিণ বিষয়ে বই লিখছেন। প্রকাশিত বই: ***The Insurrection of Little Selves: The Crisis of Secular Nationalism in India*** (2006), ***Power and Contestation: India Since 1989***, with Nivedita Menon (2007), ***After Utopia: Modernity, Socialism and the Postcolony*** (2010), ***Desire Named Development*** (2011) and ***Decolonizing Theory: Thinking Across Traditions*** (2020).

সারোয়ার তুষার: লেখক। জন্ম ও বেড়ে ওঠা ঢাকায়। বুদ্ধিবৃত্তিক নানা তৎপরতার সাথে যুক্ত। প্রকাশিত বই: *সময়ের ব্যবচ্ছেদ* (সহ লেখক: সহুল আহমদ)। প্রকাশিতব্য বই: *কোয়ারেন্টাইন স্টেট*; *চিন্তার অর্কেস্ট্রা*; *সাম্প্রদায়িকতা* (সহ লেখক: সহুল আহমদ)। বিভিন্ন জার্নাল, পত্রিকা, ব্লগ ও অনলাইন ম্যাগাজিনে নিয়মিত লিখছেন। *রাষ্ট্রচিন্তা* জার্নালের সম্পাদক পর্ষদের সদস্য।

মনিরুল ইসলাম: শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

ইয়ামিন রহমান: সহকারী অধ্যাপক, আইন ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়।